অন্য মাটি
অন্য রং

আশাপূর্ণা দেবী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

করে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে মোটর ড্রাইভারিটা শিখে নিয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছিল।

আজই কি বুঝতে পারবার কথা?

জানলার রহস্য কি বিশ্বাস সাহেবের জানা? আর তাতে বিশ্বাস সাহেবের প্রশ্রয় আছে? তাই কি সম্ভব? কিন্তু তবে ওকথা কেন বলেছিলেন বিশ্বাস সাহেব? 'আর তাছাড়া—'

'মেমসাহেবের দরকার' এই কথাটার পিঠোপিঠি ওই 'তা ছাড়া' কেন?

না কি ওটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা?

সুধীর নিজেই গুলিয়ে ফেলেছে তুটো কথা। যাক, বেশী চিন্তার লাভ নেই, ভেবেছিল সুধীর। চিন্তা করা তারই সাজে ঘরে যার তু'দিনেরও ভাত আছে।

'হাত ভাল?'

সুধীর অস্পষ্ট গলায় বলেছিলো, 'দেখবেন!'

'ইয়ে-স্! তাহ'লে কাল সকাল থেকেই আসছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মনে আছে তো? সাতটায় বেরোতে হয় আমায়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে।'

'কোথায় যেন থাকো বল্'লে?'

'মনোহর পুকুরে—'

'ঠিক আছে।'

চলে যাচ্ছিল সুধীর, আবার ফিরে ডেকেছিলেন বিশ্বাস সাহেব, 'বিয়ে থা করেছ?'

'আজ্ঞে না'।

ঘাড় নীচু করে জবাব দিয়েছিল সুধীর।

ভাবেনি এর পরেও আবার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন বিশ্বাস সাহেব। বলেছিলেন, 'কেন হে? বিয়ে

করনি কেন? এমন বয়েস, এমন চেহারা, হেল্‌থ্‌ও নেহাত খারাপ না—'

সুধীর এ কথার উত্তর দেয়নি, মাথা নীচু করেই ছিল।

বিশ্বাস সাহেব মুখের মধ্যে গোঁজার আগে পাইপটা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলেছিলেন, 'তাহলে বাড়ীতে তোমার আছে কে?'

কথার সুরে এমন ভাব ফুটেছিল, যেন স্ত্রীই নেই যদি, তবে কেই বা আছে।

সুধীরের মুখে আসছিল বলে, 'স্ত্রী ছাড়া সবই আছে'। বলল না।

বলল, 'মা আছেন, দুই ভাই আছে, অবিবাহিতা বোন আছে—'

'অ-বি বাহিতা! ওরে ব্যস! তুমি তো বেশ ভাল বাংলা বলতে পার হে! লেখাপড়া কতদূর?'

'সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিলাম, পরীক্ষা দেওয়া হয়নি—'

'কেন, পরীক্ষা দেওয়া হয়নি কেন?' বিশ্বাস সাহেব ভুরু কুঁচকেছিলেন, 'ড্রাইভারি কাজটা বেশী পছন্দসই মনে হয়ে গেল বুঝি?'

সুধীরের পা থেকে মাথা অবধি হঠাৎ কি যেন একটা উত্তপ্ত তরল পদার্থ ছুটোছুটি করে উঠল। কিন্তু সে উত্তাপ মাথা থেকে জিভে আনতে দিল না সুধীর। সামলে নিল। আস্তে বিনীত কণ্ঠে বলল, 'বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, পরীক্ষার ফীজ্‌ জমা দিতে পারলাম না—'

'থাক থাক, আর বলার দরকার নেই—' বিশ্বাস সাহেব হাত নাড়লেন 'বুঝতে পেরেছি। সেম্‌ প্রবলেম! একই ইতিহাস! ভাই দুটো বোধহয় অগা-বগা? বোনটা কালো কুৎসিত? মা চিররুগ্ন?'

সুধীর বুঝতে পারছিল না লোকটা পাগল কিনা।

কিন্তু গতকাল সকালে যখন ও চাকরীর চেষ্টায় কাগজের কাটিংটুকু হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তো এমন মনে হয়নি?

এইসব প্রশ্নে কি অপমানিত বোধ করবে সুধীর? বলবে, ওসব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার স্যার, ওসব প্রশ্নের দরকার কি?

বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, বলা হয়নি।

সাহস হয়নি।

ঘরে একদিনেরও চাল নেই জেনে এসেছে মার কাছ থেকে। চাকরীটা হলে হয়তো সেই দেখিয়ে আবার কিছু ধার পেতে পারা যেতে পারে।

চাকরীটা চাই।

চাকরীটার আশা খোয়ালে চলবে না।

এর আগের কাজটা ছেড়ে দিয়েছিলো ওই মান-মর্যাদার প্রশ্নে। মা বলেছিলো, 'সংসারের কথা একবার ভাবলি না তুই? নিজের মানটাই বড় হল?'

বোন বলেছিল, 'কিন্তু মা, অতখানি অপমান সয়ে ভদ্রলোকের ছেলে থাকতে পারে? 'রাস্কেল' বলবে, অসভ্য বলবে—'

মা বলেছিল, 'থাম্ থাম্, আর ভদ্দরলোকের বড়াই করিস না। যাদের ভাত নেই তারা আবার ভদ্দরলোক! বলেছে তো গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে? মারেনি তো? মুখে দুটো কথাই বলেছে—'

সুধীর ঠিক করেছে এবার মারা পর্যন্তই দেখবে।

তাই বিশ্বাস সাহেবের ওই তিন দফা প্রশ্নের উত্তর একটাতেই দিয়েছিল, 'গরীবের সংসারের একই ইতিহাস, স্যার!'

'হুঁ! বোলচাল তো ভালই। বামপন্থী-টন্থী নও তো হে? আমার আবার তাতে অসুবিধে আছে।'

সুধীর এর উত্তর দেয়নি।

বিশ্বাস সাহেব পাইপটা মুখে গুঁজে জড়ানো গলায় বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল এসো। জাষ্ট সেভেন্ ও ক্লক্!'

সুধীর সম্মতি জানিয়ে চলে এসেছিল।

তখন ওই জানলার নীচে দিয়েই এসেছিল। ছন্দাংশেও আশঙ্কা করেনি ওই জানলার ওপারে ভয়ঙ্কর একটা ভয় দাঁত খিঁচিয়ে থাকবে সুধীরের অন্নের উপর। প্রতি মুহূর্তে অন্নকে বিষাক্ত করে তুলবে।

॥ ২ ॥

বোন অমিতা বলেছিলো, 'যাই হোক দাদা, মাথাটা ঠাণ্ডা করে থেকো। মা যা করে বলে!'

'মার আর দোষ কি বল?' ম্লান হাসি হেসেছিল সুধীর, 'এ যাবৎ আমার ওপরই আশা রেখে এসেছিল মা, আমি যে মার সে আশায় ছাই দিচ্ছি—'

'আশা রাখলেই হল না!' অমিতা বিরক্ত স্বরে বলেছিল, 'পৃথিবীটা কেমন সেটাও দেখতে হবে। তা ছাড়া অবস্থা যখন এত খারাপ ছিল না, তখনও তো দেখেছি। বাবাকে অবিরতই বাক্যজ্বালা সইতে হয়েছে।'

'সে সব অনেক কারণ, অমি, তুই বুঝবি না।' বলে সুধীর মায়ের কাছে বার্তাটা জানায়।

মা একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠেন, 'ভাল, শুনে আহ্লাদ হল, আবার মেজাজ দেখিয়ে ভাতের হাঁড়িটা ঘুচিও না।'

সুধীর চুপ করে থাকল।

দেখল 'ভাতে'র মত ভয়ঙ্কর সত্যের কাছে আর সবই মিথ্যা। সে যে ভদ্রলোকের ছেলে, তার যে মান-সম্ভ্রম থাকতে পারে, এর চাইতে হাস্যকর অসত্য আর কি আছে? তার ভাত নেই এইটাই শেষ কথা।

আগের মনিবের ছেলে বলেছিল, 'রাস্কেল'! বলেছিল, 'এই সব অসভ্য লোক নিয়ে বাবা চালাতে পারেন, আমার দ্বারা সহ্য করা অসম্ভব।'

সেই 'অসহ্যকর' ঘটনাটাও মনে আছে সুধীরের। ছোট ভাইয়ের জ্বর হয়েছিল, সন্ধ্যাবেলা ছুটি চেয়েছিল সুধীর দু'ঘণ্টার জন্য। কর্তার ছেলে বলেছিলেন, 'অসম্ভব! আজ আমাদের একটা নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যেতে হবে।—

সুধীর বলেছিল, 'বেশ, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি, ফেরার সময় না হয় আপনি ট্যাক্সীতে—'

'ট্যাক্সীতে ?' বৌ মিহিগলায় বলেছিল, 'কত রাত হবে ঠিক নেই, তখন 'ট্যাক্সী—ট্যাক্সী' করে ছুটোছুটি করতে হবে আমাদের। আপনার নিজের দরকারটাই বড় হল ? সেই সুবিধেটি দিতে হবে আপনাকে।'

সুধীর একটু মুখ তুলে কথা বলেছিল সেদিন। বলেছিল, 'এক-আধ সময় সেটুকু দিতে হবে বৈকি। চাকরী করতে এসেছি বলে তো সব কিছু বিসর্জন দিতে পারি না ?'

'কী বললেন ?'

ছেলে চীৎকার করে উঠেছিলেন, 'এই সব অসভ্য লোক নিয়ে বাবার কারবার ! আমার কাছে ওসব চলবে না। ছুটি পাবেন না, আপনি।'

সুধীর বলেছিল, 'ছুটি আমাকে পেতেই হবে। ডাক্তারের কাছে না গেলে—'

'ডাক্তার ! ভারী একেবারে রাজপুত্তুর এসেছেন, তাই মাথা ধরলেই ডাক্তার ! ওসব লম্বা কথা অন্য জায়গায় কইতে যাবেন, এখানে নয়। রাস্কেল।'

সুধীর বলেছিল, 'ঠিক আছে ! আমারও তাহলে আর এখানে নয়।'

গাড়ীর চাবিটা ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল তক্ষুণি।

বুড়ো মনিব অবিশ্যি ডেকেছিলেন পরে। তবে খোসামোদ করতে নয়, দুনিয়াটাকে বোঝাতে। বলেছিলেন, 'এখনো রক্ত গরম আছে, তাই এত নির্বোধের মত কাজ করে বসতে পারলে, তবে আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী হয়েই বলছি—যেখানেই কাজ কর, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রেখে চলতে চেষ্টা কোরো ! তুমি ভদ্রলোকের ছেলে বলে, তোমাকে কেউ বিশেষ সম্মান দেবে, এ আশা যদি করে থাকো তো ভুল আশা করছো। তোমার পেশার উপযুক্ত ব্যবহারই পেতে হবে তোমাকে। এই হচ্ছে পৃথিবী !'

সুধীর বলেছিল, 'বিশেষ সম্মান কেউ চাইছে না, স্যার। তবে মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান বলে একটা বস্তু থাকবে, এ আশা করাটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়?')

'ওটারও শ্রেণীবিভাগ থাকবে, সুধীর; থাকতে বাধ্য। পা মাথা ।ান হয় না।'

তবু একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন মনিব, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই দি...ছিলেন। বলেছিলেন, 'রেখে দিতে পার, কাজে লাগবে।'

তারপর কিছুদিন ধরে অন্য কাজের চেষ্টা করেছিল সুধীর, ভেবেছিল, এ কাজ আর নয়। কিন্তু সংকল্প রক্ষা হল না। সমস্ত ছাপিয়ে উঠল ভাত। এখানে ওখানে কাজের চেষ্টা করল, মাইনেয় পোষায় না।

অবশেষে বিশ্বাস সাহেবের কাছে। তবু পুরো একশো।

প্রথম দেখা করতে এসেছিল সকালবেলা। গম্ভীর আর রাশভারী বিশ্বাস সাহেব কাগজগুলোর উপর চোখ বুলি... বলেছিলেন, 'মাঝখানে এই পাঁচমাস কি করছিলে?'

'কিছুই করিনি।'

'কিছুই করনি? বল কি? আমাদের তো কিছু না করলে পাঁচটা দিনও চলে ...'

'...ষ্ট করে চ...ছিল! শরীর ভাল ছিল না।'

অন্য কাজ খুঁজছিলাম, না বলে শরীর খারাপের অজুহাত কেন দিল সুধীর জানে না।

বিশ্বাস সাহেব কিন্তু শুনে ভুরু কুঁচকেছিলেন। বলেছিলেন, 'পাঁচ মাস ধরে শরীর খারাপ? টিবি-ফিবি নয়তো?'

'আজ্ঞে?'

'আহা, তা সন্দেহ কিছু করছি না, দেখে তো হেলথ্ বেশ ভালই মনে হচ্ছে। তবু জিজ্ঞেস করা ভাল। অসুখ-বিসুখ নেই তো কিছু?'

'আজ্ঞে না!'

'না থাকলেই মঙ্গল। কিন্তু এখন আর সময় নেই আমার, তা ছাড়া আরও তু'চারজনকে দেখব আজ, সন্ধ্যেয় এসো আর একবার, ফাইন্যাল খবর পাবে।'

সেই খবরটা পাওয়া হয়েছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুধীর কি ভাবল সুধীরই জানে। হয়ত নিশ্চিত অন্নের প্রতিশ্রুতির নিশ্চিন্ততায় ঘুমিয়ে পড়ল সহজেই। কিন্তু অমিতা ভাবল, ছেলেবেলায় দাদা কবিতা লিখত! সে খাতাটা এখনো আমার কাছে আছে! ভাবল, দাদা যখন প্রথম মোটর ড্রাইভিং শিখতে গেল, বিশ্বাস করিনি সত্যিই—দাদা গাড়ী চালাবে। প্রথম যখন সেই কাজটা করতো, ভাবতাম ওটা বুঝি দাদার শাপ ভোগের কাল। একদিন শাপমুক্তি হবে, দাদা তার সত্য পরিচয়ের জীবন পাবে। হল না। দাদার এই পরিচয়ই পাকা হতে চলল।

দাদা ড্রাইভার, আমি ড্রাইভারের বোন। তারপর মনকে শক্ত করল। ভাবল, এটা একটা মিথ্যা ভাবালুতা। আমি যে সেলাই স্কুলের ওই কাজটা করি, সেটাই বা এমন কি! কাজ হচ্ছে কাজ! ছোট কাজ, বড় কাজ, কাজের এই সব শ্রেণীবিভাগই আমাদের দেশকে তুর্দশায় ফেলে রেখেছে।

সত্যিকার 'ছোট কাজ' না করলেই হল।

অথচ অহরহ বড় বড় ব্যক্তিরা তো তাই-ই করছেন!

তারপর ভাবল, দাদার আগের কাজটায় নব্বুই টাকা পাওয়া যেত। তখন আমার পঁয়ষট্টি ছিল, এখন আমার বাহাত্তর হয়েছে, দাদার একশো টাকা হল। সতেরো টাকা আয় বাড়লো সংসারের। ঈশ্বরের আশীর্বাদ!

বস্তি নয়, পাকা বাড়ী।

ভালই বাড়ী।

সুধীরের ঠাকুর্দার আমলের ভাড়াটে বাড়ী! টিনের ঘরের দামে

পাকা বাড়ীর আস্ত একটা তলা পাচ্ছে। বাড়ীওয়ালারা সুবিধে পেলেই শোনায়, 'মাটির ঘরের বদলে পাকা বাড়ী ভোগ করছেন।'

সেকালের সুদিন থাকলে নোটিশ দিতেন নিশ্চয়ই, এখন বাড়ীভাড়া আইনের খেসারৎ দিচ্ছেন।

॥ ৩ ॥

ভোর পাঁচটার সময় ঘুম ভেঙে গেল সুধীরের, মায়ের ডাকে। চায়ের পেয়ালা হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছেন মা।

'একী!' চমকে ওঠে সুধীর।

মা বলেন, 'দিলাম! তোমার তো সকালবেলাই যাবার কথা!'

সুধীরের অবশ্য চা-টা খারাপ লাগে না। তবু হেসে ফেলে। হেসে বলে, 'সে তো সাতটায়!'

'নড়তে-চড়তেই সাতটা বাজবে। প্রথম দিন একটু আগে আগেই যাওয়া ভাল।'

মায়ের মুখটা কী শীর্ণ।

মায়ের মুখে কী একরকম হতাশ অবসন্নতা। তবু মা হাল ধরতে এসেছেন। প্রথম দিনেই যেন দেরী করে ফেলে মনিবের অপ্রিয় হয়ে চাকরীটা না ঘোচাই। মায়ের জন্য মমতায় মনটা কেমন করে উঠল। বলল, 'তুমিও এক পেয়ালা খেয়ে নিলে না কেন?'

মা হঠাৎ হেসে ফেললেন।

যে হাসিটা দুর্লভ হয়ে গেছে এ সংসারে। বললেন, আমি খেয়ে নেব? এই বাসি কাপড়ে?'

'তাতে কি?' জেনে বুঝেও অবোধ সাজতে ভাল লাগছে সুধীরের, চা তো! চায়ে দোষ নেই।'

'তোকে বলেছে দোষ নেই। নিজে খা তো, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

সুধীর ভাবল, হোক ঠাণ্ডা!

শুধু যদি সংসারের আবহাওয়া এমনি ঠাণ্ডা থাকতো!

কিন্তু ক'দিন?

কতটুকু সময়?

এ আলো মুছে যায়, এ বাতাস গুমোট হয়ে ওঠে।

সুধীরের যদি অনেক টাকা রোজগারের ক্ষমতা থাকতো! তাহলে এই আলো চিরস্থায়ী হতো! এই বাতাস অনাবিল বইতো!

অন্তত সুধীর তাই ভাবল।

ছুনিয়াটাকে বুঝতে যার এখনো অনেক দেরী আছে।

॥ ৪ ॥

না, গত সন্ধ্যার সেই অকারণ স্ফূর্তির হাসি হেসে ওঠা লাল লাল মুখ বিশ্বাস সাহেব নয়, ইনি হচ্ছেন সকালের সেই রাশভারী বাঘা বাঘা বিশ্বাস সাহেব।

গম্ভীর গলায় বললেন, 'বেশ, খুশি হলাম তোমার কাজের আগ্রহ দেখে। এটা দরকার। প্রথম দিন একটু আগে এসেছ, এটা ভাল। আমাদের যেতে হবে হাওড়ার ওদিকে, মিনিট পনেরো পরেই বেরোচ্ছি।'

কথা শেষ করেই হঠাৎ হাতের কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গেলেন বিশ্বাস সাহেব।

সুধীরকে না বললেন বসতে, না বললেন ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে। অতএব সুধীর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়েই রইল, ঘরে অনেকগুলো বসবার জায়গা থাকতেও।

তার পুরনো মনিবের জ্ঞানদায়ক কথাটা মনে পড়িয়ে সহজ রাখতে চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে।

'তুমি ভদ্রলোকের ছেলে বলে তোমাকে কেউ বিশেষ সম্মান দেবে এ আশা রেখো না।'

এটাই দীক্ষামন্ত্র হোক সুধীরের।

এই মন্ত্রই জপ করবে সুধীর শ্বাসে প্রশ্বাসে।

বিশ্বাস সাহেব কাজের মধ্যে নিমগ্ন। সুধীর তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরটাকেই দেখে। না, খুব একটা সাজানো গোছানো কিছু না, মোটামুটি একটা 'অফিস ঘরের' চেহারা দেওয়া হয়েছে বাড়ীরই নীচের তলার এই ঘরটাকে।

টেবল চেয়ার আছে, স্টীলের আলমারি আছে, স্টীলের র‍্যাক্ আছে গোটাকতক। বাহুল্যের মধ্যে কর্তার হাতের সামনে একটি, এবং কোণে ছোট্ট টিপয়ের উপর একটি, দু'দুটি টেলিফোন। দেয়ালে দেয়ালে ছবি। গান্ধী, সুভাষ বোস, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথের বেশ বড় সাইজের ছবি, আর দুখানি ছোট ছবি, বেশী উঁচুতে অবস্থিত, বোধকরি বিশ্বাস সাহেবের মা বাবার।

অন্ততঃ সুধীরের তাই মনে হল।

ছবিগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ কিছু নেই। সাধারণ ছাপা ছবি, ক্যালেণ্ডার থেকে সংগ্রহ করার মত। ফ্রেম বাঁধাই আরো সাধারণ।

সুধীর ভাবে, এই সব ছবি বোধহয় বিশ্বাস সাহেবের 'আমার মত হীনাবস্থা' কালের। হয়তো বা ফেলে দেবার খেয়ালই হয়নি।

অফিস ঘরের এই সাজ-সরঞ্জাম বিশ্বাস সাহেবের প্রথম দিককার বলেই মনে হয়। অনেকে আবার আয় উন্নতি হলেও প্রথম দিককার অর্থাৎ লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সূচনাকালের আসবাবপত্র ঘরটর বদলায় না, পয়মন্ত বলে যথাযথ রেখে দেয়।

দায়ে দৈবে পড়লে পাড়ার যে ডাক্তারটির কাছে যায় সুধীর, তাঁর ব্যাপারটিও এই রকম। শুনতে পায় মাসে নাকি দু'পাঁচ হাজার টাকা আয় হয় তাঁর, কিন্তু অবস্থা করে রেখেছেন সেই আদি ও অকৃত্রিম।

সেই একটা চটা ওঠা টেবিল, দুটো নড়বড়ে চেয়ার, রোগীদের 'অপেক্ষা কক্ষে' একখানি জরাজীর্ণ অয়েলক্লথ আঁটা মান্ধাতার আমলের বেঞ্চ। এসব কিছু নড়ান না ডাক্তার, পাছে লক্ষ্মী নড়ে ওঠেন।

এঁরও তেমনি একটা কিছু হবে, ভাবল সুধীর।

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে কেমন যেন ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই ঘরের জিনিসগুলোই এত খুঁটিয়ে দেখছিল সুধীর। টেবিলের নীচের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটাও যে বেশ পুরনো কালের তা দেখা হয়ে গেল।

কিন্তু মনিবের মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে না কেন সুধীরের? চোখোচোখি হবার ভয় তো নেই। তিনি তো নত-নেত্র।

তবে?

সাহসের অভাব?

না বিতৃষ্ণা?

হয়তো তাই। অথচ বিতৃষ্ণার কোনো কারণ খুঁজে পেল না সুধীর। ভদ্রলোক তো একবারও তার সঙ্গে কটু ব্যবহার করেননি।

ইণ্টারভিউর সময় থেকে অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট পাওয়া পর্যন্ত এবং আজ সকালেরটা নিয়ে বার-চারেক তো দেখা হল, খারাপ কোনো ভাব দেখাননি।

তবু সুধীরের মনটা এমন বিরস লাগছে কেন? বিশ্বাস সাহেব যদি শুধু একবার মাথা তুলে বলতেন, 'দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ, বোসোনা', তা'হলেই কি সুধীরের এই মন সরসতায় ভরে উঠতো?

বুঝতে পারল না।

হঠাৎ মনে হল চৌকো গড়নের মুখ তার বিরক্তিকর। কিন্তু নিটোল ডিমের মত মুখ যাতে তাজাফলের লাবণ্য? যে মুখ তখনো দেখেনি সুধীর। কখনোই দেখেনি যেমন মুখ। সেই মুখ কি—

হঠাৎ ঘরটাকে সচকিত করে ঘড়ির ঘণ্টা পেটা সুরু হয়ে গেল।

পুরনো আমলের মোটাসোটা দেয়াল ঘড়িটাকে এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিল সুধীর, সেটা যে এমন হাতুড়ি পেটে তা ভাবেনি।

মনে হল শব্দটা কী রূঢ়!

শব্দটা শেষ হওয়া পর্যন্ত হাতের কাগজপত্র সামলালেন বিশ্বাস সাহেব, ড্রয়ারের মধ্যে কিছু চালান দিলেন, চাবিটা লাগানর পর বার দুই টেনে টেনে দেখলেন, তারপর যেন এইমাত্র দেখলেন সুধীরকে, এইভাবে বললেন, 'ওঃ, তুমি এখানেই রয়েছ? গাড়ীটা বার করলে পারতে এতক্ষণ।'

সুধীরের নিজেকে বড় বোকা মনে হল।

গতকালই তো সাহেব গ্যারেজের চাবিটা তার জিম্মায় দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহেবের বিনা আদেশে প্রথম দিনই গাড়ী বার করে ফেলাটাই কি প্রীতিকর হতো সাহেবের?

॥ ৫ ॥

গাড়ীর স্টিয়ারিং বিশ্বাস সাহেবের হাতেই রইল। সুধীর বসে রইল সাজানো পুতুলের মত। মোটা মোটা শিরা ওঠা দুটি দৃঢ় মুষ্টির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সুধীর, এ মুঠো যেন কোনদিনই শিথিল হবার নয়। এ মুঠোর মধ্যে থেকে কোনও কিছুই নিয়ে নেওয়া যাবে না।

অতএব সুধীরের ভূমিকাটা হয়তো এই সাজানো পুতুলের মতই থাকবে।

নিস্‌পিস্ করা হাত দুটি নিয়ে অকারণ মুঠো খোলা মুঠো বন্ধ করা খেলা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপচাপের পর বিশ্বাস সাহেব হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সকালে কি খেয়ে বেরিয়েছ, ইয়ে—কি যেন নাম বলেছিলে?'

'সুধীর।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।'

সাহেবের তার নাম ভুলে যাওয়ার গোলমালে ওই অস্বস্তিকর প্রশ্নটার উত্তর দিতে হল না ভেবে ভারী স্বস্তিবোধ করছিল সুধীর, স্বস্তিটা স্থায়ী হল না। সাহেব কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করলেন 'কই, বললে না?'

'আজ্ঞে, কী বলছেন?'

'সকালে কি খেয়ে বেরিয়েছ?'

নিতান্ত অনিচ্ছাতেও উত্তর দিতেই হল সুধীরকে।

'এই চা টা—'

'হুঁ! তা তুমি তো পাঁচ মাস বেকার বসেছিলে, ওই 'টা'টা কতদূর কি জুটেছে বল দেখি?'

সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এই দণ্ডে পকেট থেকে গ্যারেজের চাবিটা বার করে ওঁর নাকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে যেতে ইচ্ছে করল সুধীরের। দীক্ষামন্ত্র বুঝি আর শক্তি জোগাতে পারছে না।

তবু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে, 'আজ্ঞে, গল্প করবার মত কিছু নয়।'

'গল্প!'

বিশ্বাস সাহেবের চোয়ালটা যেন একটু কঠিন দেখাল। তারপর আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এল। একটু ব্যঙ্গ হাসির মত করে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে বসছি, হঠাৎ এমন অদ্ভুত কথা মনে এল কেন বল তো?'

সুধীর অবশ্য এ কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করল না।

বিশ্বাস সাহেব আর একটু পরে শান্তভাবে বললেন, 'গল্প নয়, তুমি আমার কাছে কাজ করবে, তোমার হেল্‌থ্‌টা আমার দেখা দরকার—'

'আমার হেল্‌থ্‌ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে, স্যার?'

'না না, সন্দেহ নয়, হেল্‌থ্‌ ভালই মনে হয়েছে। তবে ভাবছি খাওয়া-দাওয়ার দিকে যাতে নজর দিতে পার—'

'বাড়ীতে আমার মা আছেন, বোন আছেন, তাঁরা আমাকে যতটা সম্ভব—'

'মা বোন! ওঃ!'

বিশ্বাস সাহেব যেন অপমানিত বোধ করেন, তাই কথার আর উত্তর দেন না। নতুন কোনও প্রশ্নও না।

নীরবে আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করে হঠাৎ এক সময় বলেন, 'আচ্ছা—' বলার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা থেমে যায়। বিশ্বাস সাহেব নেমে পড়েন।

এ রকম একটা সরু গলির মোড়ে যে উনি হঠাৎ নেমে পড়বেন এমন ধারণা ছিল না সুধীরের। কী আছে এখানে? অন্তত বিশ্বাস সাহেবের নেমে পড়ার মত?

নেমে অবশ্য সেও পড়েছিল, সাহেব থামালেন। বললেন, 'না না, তোমায় নামতে হবে না, তুমি গাড়ী নিয়ে ফিরে যাও—'

'গাড়ী নিয়ে ফিরে যাব?' বিমূঢ় প্রশ্নটা অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিরে যাবে। এখানে আমার চার ঘণ্টা কাজ আছে। ঠিক বারোটার সময় আবার এসে যাবে।'

সুধীর এমন অদ্ভুত আদেশের অর্থ খুঁজে পায় না। চার ঘণ্টা কাজ থাকে, ড্রাইভারকে বসেই থাকতে হবে চার ঘণ্টা, এটাই তো স্বাভাবিক।

'ফিরে যাব, বলছেন? মানে বাড়ীতে?'

'কী আশ্চর্য, এই সহজ কথাটা বুঝতে তোমার এত দেরী হচ্ছে কেন বল তো? সোজা ফিরে যাও, আবার টাইম্‌লি ঠিক এইখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

সুধীর অতএব গাড়ীতে উঠে বসল, বিশ্বাস সাহেবকে কাছাকাছি কোনও দরজায় ঢুকতে দেখল না। দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

সরু গলির কোণ থেকে পিছিয়ে পিছিয়ে গাড়ী বার করে আনল। চার ঘণ্টা পরে আবার আসতে হবে এই রাস্তায়। এই

অনর্থক পেট্রল খরচার মানেটাকে বড়লোকের খেয়াল বলে ধরে নিয়ে রাস্তাটা চিনতে চিনতে আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে ফেরে।···মোড়টা না ভুল হয়ে যায়। যা রাস্তা! গলি আর বাঁক।···এই যে প্রথম বাঁকটার মুখেই একটা মিষ্টির দোকান, কি নামটা? 'সুমিষ্টি'! যাঃ বাবা, খুব নতুনত্ব দেখিয়েছিস।···মিষ্টির দোকানের পর? পান সিগারেট সোডা লেমনেডের দোকান একটা···এদিকে? সাইন বোর্ডের গায়ে একটি অঙ্গুলি নির্দেশকারী প্রসারিত হাত। কী নির্দেশ করতে চায় এই কাটা হাত?

'ডানদিকের গলি দেখুন! আদি ও অকৃত্রিম জ্ঞানের বাড়ী: আপনার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অবস্থা জানুন। তিনশত বৎসরের প্রসিদ্ধ—'

রাস্তাটা ছাড়িয়ে গেছে ততক্ষণে গাড়ী।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান!

ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে হয়েও সহসা একটা অভদ্র শব্দ উচ্চারণ করে বসে সুধীর।

॥ ৬ ॥

গাড়ী ধোওয়ার চাকর অনাদি মুচকে হেসে বলে, 'সাহেব খাওয়ার কথা বলল না?'

'খাওয়া?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল সুধীর।

অনাদির বয়স হয়েছে, তবে নিতান্তই চাকর চাকর। ওর এই হেসে গায়ে পড়তে আসাটায় গা জ্বলে গেল সুধীরের। এদের সকলের কথার মধ্যেই কি অপমানের দাহ?

কি করে তবে সুধীর তার মায়ের মুখের হাসিটাকে খুঁজে পাবে? আর খুঁজে পেয়ে বজায় রাখবে!

অনাদি তেমনিভাবে বলে, 'সাহেবের দয়ার শরীর, ভাল-ঘরের ছেলে অভাবে পড়ে ড্রাইভারি করতে এসেছে দেখলেই বাড়ীর মধ্যে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এই আপনার মত তিন-চারজন তো এল গেল।'

অনাদির ওই বিশ্রী মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল সুধীরের। মনে হল, লোকটা যেমন নেহাৎ চাকর চাকর দেখতে, আসলে যেন তা নয়। যেন এটা ওর ছদ্মবেশ।

'তিন-চারজন এল গেল!'

এর মানে কি?

তবে কি বিশ্বাস সাহেবের মাথায় কোন দোষ আছে?

কোনো কথা না কয়ে অকারণেই রুমাল বার করে ঘাড়টা মুছতে লাগল সুধীর।

অনাদিও হাত মুছছিল, কে জানে কি করছিল। বলল, 'থাক্, রইলেন যখন, তখন সাহেবের দয়া-মায়ার পরিচয় পাবেন। বারোটার সময় আবার যেতে হবে তো?'

সুধীরের ইচ্ছে হচ্ছিল না ওই বিশ্রী লোকটার সঙ্গে কথা বলে, তবু কৌতূহল দমন করতে পারল না। বলল, 'তাই তো বললেন। যান বুঝি মাঝে মাঝে?'

'মাঝে মাঝে? প্রত্যহ।'

'তাই বুঝি! ওখানে কোনো—'

'হ্যাঁ, ওখানে আর একটা কারখানা আছে সাহেবের।'

সুধীরের রুচিতে বাধল বলেই আর কথা বাড়াল না, শুধু এই কথাটাই তোলপাড় করতে লাগল, প্রত্যহ ওই সাঁতরাগাছির কাছাকাছি দু'বার যেতে আর দু'বার আসতে হবে এবং মাঝখানের এই সময়টায় কোনো কাজ নেই ড্রাইভারের। অথচ গাড়ী নিয়ে ব'সে থাকাও চলবে না।

এতো আচ্ছা অদ্ভুত!

সুধীরের পোড়া কপালে এ চাকরীটাও টিঁকবে বলে মনে হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা ভয় ওৎ পেতে বসে আছে এর পিছনে। যেন অন্ধকার কোণ থেকে আচমকা কখন বেরিয়ে আসবে সেই ভয়ের হাত। টুঁটি চেপে ধরবে সুধীরের।

কিন্তু কেন?

ওই অনাদিটার কথায় এত গুরুত্ব দেবার দরকার কি?

ভাবল। তবু বারে বারে মনে পড়তে লাগল খাওয়া আর স্বাস্থ্যরক্ষার কথা নিয়ে প্রশ্ন বিশ্বাস সাহেব তুলেছিলেন।

গাড়ী আর তুলল না।

সেই জানলাটার নীচে দিয়েই দু'তিনবার যাওয়া-আসা করল। যে জানলাটা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না তখনো সুধীরের।

অনায়াসে এই সময়টায় বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসতে পারতো সুধীর, কিন্তু অনুমতি না পেলেও তো যেতে পারে না। প্রতিদিন যদি এই পদ্ধতিতে চলতে হয় সেই ব্যবস্থাই করে নেবে। বারোটার সময় সেলাই ইস্কুলে যায় অমিতা, তার আগে গিয়ে পড়তে পারলে একসঙ্গে খাওয়া যায়।

দাদার সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে বসতে পারলে কী খুশিই হয় অমিতা! অথচ সেই খুশিটুকু তাকে দিতে পারে না সুধীর। অন্ততঃ এই পাঁচ মাস তো নয়ই। বেলা দেড়টা দুটো পর্যন্ত পথে ঘুরেছে।

বাড়ীর কথা মনে পড়তেই মনটা টনটন করে এল। পুরো একটা মাস কাজ করলে তবে মাইনে। শ্যামল আর বীরেশের ইস্কুলের মাইনে দেওয়া হয়নি কত মাস কে জানে। জিজ্ঞেস করতে ভয় পায় সুধীর। যদি কোনো কারণে ভাইয়েরা ইস্কুলে না যায়, সুধীর ভাবে, নিশ্চয় নাম কেটে দিয়েছে। যেতে দেখলেও প্রাণটা অস্থির হয়ে ওঠে, মাইনে কোথা থেকে আসছে ওদের!

সারা মাসের শেষে একশোটি টাকা!

কী তুচ্ছ, কী তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর জীবন সুধীরের!

মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক কত রকমই তো আছে জগতে, সেগুলো কি সত্যই সুধীর যা ভাবে তাই? স্রেফ্ ভূয়ো? নাকি আছে কিছু?

সুধীর কি ওই জানের বাড়ী গিয়ে জেনে আসবে তার ভবিষ্যৎ কি? হ্যাঁ, শুধু ভবিষ্যৎ! ভূত আর বর্তমান, এর জন্য কি জ্যোতিষীর কাছে যেতে হয়?

॥ ৭ ॥

এসব সেই প্রথম দিনের কথা।

যেদিন প্রথম কাজে লেগেছিল সুধীর। যখন সে জানতো না কিসের কারখানা আছে বিশ্বাস সাহেবের সাঁতরাগাছির কাছ-বরাবর।

সেদিন বিশ্বাস সাহেবের নির্দেশিত সময়ে আবার যখন গাড়ী নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুধীর, সেই কোনদিকের যেন একটা গলি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বিশ্বাস সাহেব, দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়ীতে উঠে বসেছিলেন, শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করেছিলেন, আর দৃঢ় মুষ্টিতে ষ্টিয়ারিং চেপে ধরেছিলেন।

বিশ্বাস সাহেবের মুঠোর ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আবার সেই কথাটাই মনে এসেছিল সুধীরের, ওঁকে চালিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবাও অন্যের পক্ষে ধৃষ্টতা। যেন উনিই ওঁর চালক, ওঁর প্রভু।

সেই প্রভুর ভঙ্গীতে অনেকক্ষণ গাড়ী চালাতে লাগলেন বিশ্বাস সাহেব নিঃশব্দে, তারপর এক সময় হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই সময়টা কি করলে? এই এতক্ষণ?'

সুধীর চকিত হল।

চমকে বলে ফেলল, 'আমাকে বলছেন?'

বলে ফেলেই নিজেকে ভারী বোকা মনে হল সুধীরের, আর ভীষণ

রাগ হল। নিজের উপর যতটা রাগ হল, বিশ্বাস সাহেবের উপর তার চাইতে বেশী।

কেন এই লোকটির সামনে এলেই সুধীরের কথাগুলো ভোঁতা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে! যে সুধীর বন্ধুমহলে স্মার্ট কথাবার্তার জন্য বিশিষ্ট ছিল একদা! অবশ্য এখন আর নেই। মানে বন্ধুমহলই নেই তার আর। যাদের সঙ্গে ইস্কুলে-কলেজে পড়েছে তাদের সামনে এই নতুন পরিচয় গায়ে এঁটে নিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে।

দাঁড়ালেই তো প্রথম প্রশ্ন তুলবে তারা, 'কি করছো এখন?'

হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে প্রশ্নের প্রথম ধাপ। ও থেকে বুঝে নেওয়া যাবে তোমার পদমর্যাদাটা কী!

সেই বুঝেই তো তারপরের আলাপ।

উঁচু পোস্টের পরিচয় দিতে পারলে সসম্ভ্রম সমীহে গদগদ হয়ে উঠবে পুরনো বন্ধুরা। প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠবে না, প্রশ্নে বিগলিত হবে। বলবে, 'জানতাম! ক্লাশের মধ্যে তুমিই তো সেরা ছাত্র ছিলে ভাই! আমরা তো কেবল ক্লাশ পালিয়েছি, আর টুকে মেরেছি। তোমার মেধার সিকিও যদি থাকতো, তাহলে কি আর—তারপর ভাই গাড়ীটাড়ী করেছ তো? বাড়ী করলে কোথায়?'

কিন্তু সুধীর উঁচু পোস্টের খবর শোনাতে পারবে না। সুধীরকে বলতে হবে, 'কি আর করা যায়, কোনদিকেই তো কোন সুবিধে করতে পারলাম না। অগত্যা—'

শুনে ওদের মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যাবে, শরীরের স্নায়ু শিরাগুলো যেন শিটিয়ে উঠবে, সুধীর যে ওদের সঙ্গে একাসনে বসেছে এতেই ওরা ভয়ানক একটা অস্বস্তি অনুভব করবে। হয়তো সুধীরকে যে চা দিয়ে আপ্যায়িত করবে ভেবেছিল, সেই ভাবনার ইচ্ছাটাকে চট করে সামলে নেবে, আর নয়তো, যদি ইতিপূর্বে চায়ের অর্ডার হয়ে গিয়ে থাকে, এক ছলে উঠে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে বলে আসবে, 'থাক্ থাক্, আর ভাল ভাল কাপ-ডিশ বার করতে হবে না। সামনে যা আছে, তাই দাও।

ডিস্‌টা কানা ভাঙা ? কাপটা ফাটা ? ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাজা আসেনি বাড়ীতে !'

স্ত্রী যদি অবাক হয়ে বলে, 'সে কি গো, এই যে বলে গেলে ছেলেবেলাকার বন্ধু এসেছে—'

উত্তরে বন্ধু মুখ বাঁকিয়ে বলবে, 'বন্ধু মানে, একসময় ইস্কুলে পড়েছিল একসঙ্গে, এই পর্যন্ত।'

সুধীরের পদমর্যাদাহীনতা সুধীরকে অস্পৃশ্য করে তুলবে, বন্ধু অশুচি হয়ে যাবার ভয়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসবে। আর যদি ভাগ্যমন্ত বন্ধু হয়, সাজানো-গোছানো ড্রইংরুম থাকে তার, সে মনে মনে ভাববে, নাঃ, আজেবাজে লোকদের জন্য কাঠের চেয়ার রাখতে হবে একটা। যে আসবে, সে-ই সোফা-সেটিতে বসবে, এ নিয়মটা ঠিক নয়।

হ্যাঁ, এই রকমই হবে এখন সুধীরের ভাগ্যে। যে হতভাগা ভাগ্যের মার খেয়ে মরছে, তাকে বাঁচাতে পারে তেমনি অমৃত কার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে ?

সুধীরের তাই তীক্ষ্ণতা চলে যাচ্ছে, ভাগ্যের মারে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে সুধীর। অথচ এই সেদিনও এমন ছিল না, এখানের ঠিক আগেই যে কাজটা ছেড়েছিল, সেখানে সুধীরের চোস্ত চোটপাট কথার জন্যই কর্তার ছেলে-বৌ অত বিমুখ ছিল সুধীরের উপর।

ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে।

সুধীরের মা সুধীরের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। মা তো এমনিতেই শ্রেষ্ঠ গুরু, তার উপর আরও এককাঠি বাড়ল। জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা চক্ষুরুন্মীলনের কাজ করে দিয়েছেন তিনি। জগতের চরম সত্য বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'যার ভাত নেই, তার আবার জাত কিসের ?' বলেছেন, 'যার হাঁড়ি শূন্য, তার ভদ্রলোক হবার বিলাসিতাটা হাস্যকর !'

অতএব ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে সুধীর।

বোকার মত প্রশ্ন করছে, 'আমাকে বলছেন ?'

বসন্ত বিশ্বাস হেসে ওঠেন না, হাসির মত করে বলেন, 'তাছাড়া? আর কে আছে এখানে?'

সুধীর চেষ্টা করে সহজ হয়, 'একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। কি বলছিলেন?'

'কি বলছিলাম? না, খুব একটা দরকারী কিছু নয়। এই এতটা সময় কী করলে তাই বলছিলাম!'

সুধীর আস্তে বলে, 'করবার কিছু তো ছিল না।'

'এই তো, এইখানেই ধরা পড়ে দুরবস্থা, কিছু মনে কোরো না, দুরবস্থাই বলছি, দুরবস্থার মূল সূত্রটা কোথায়! করবার কিছু নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? কাজ খুঁজে বার করতে হয়—বুঝলে ইয়ংম্যান, কাজ কখনো নিজে এসে ধরা দেয় না। ইচ্ছে করলে মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে পারতে তুমি! হয়তো কাজ জুটে যেত কিছু।'

সুধীর কি অপমানে লাল হবে?

সুধীর কি বলে উঠবে, মিসেস বিশ্বাসের ফাই-ফরমাস খাটা আমার দ্বারা হবে না, মাপ করবেন। তাঁর কোথাও যাবার প্রয়োজন থাকলে নিজেই তলব করবেন।

না, বলে উঠল না, মনে মনে বলল। মুখে শুধু বলল, 'সেটা কি করে সম্ভব?'

'ওঃ, সম্ভব নয় বুঝি? তা' বটে! ইনট্রোডিউস করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

সহসা চুপ করে গেলেন বিশ্বাস সাহেব।

অগত্যা সুধীরও চুপ।

হয়তো বা মিসেস বিশ্বাসের চেহারাটা অনুমান করার চেষ্টা করছিল। কর্তার মতই জাঁদরেল চেহারা? না কি রোগা খ্যাংরা কাঠির মত? বড়লোকের বৌদের তো দু'রকম আকৃতি হয়। এক হচ্ছে মেদের ভারে কুৎসিত হার্টের রোগী, আর হচ্ছে একেবারে রক্তশূন্য

রসশূন্য অম্বলের রোগী! এও এক বিধাতার পরিহাস বৈকি, চতুর্দিকে ভোগের উপকরণ, ভোগ করবার উপায় নেই।

মিসেস বিশ্বাস কোন্ শ্রেণীর রোগী?

হার্টের? না অম্বলের?

অনেকক্ষণ পরে মনে হয়েছিল সুধীরের, নিজে থেকে সে একটাও কথা বলেনি বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে। ভারি ভীরু মনে হচ্ছিল নিজেকে, তাই হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠেছিল, 'আপনার কারখানাটা কোথায়?'

কারখানাটা কিসের না বলে, 'কোথায়' সেটাই জিজ্ঞেস করল।

'কারখানা!'

বিশ্বাস সাহেব ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'কেন, দেখনি? গ্যারাজের পাশেই তো—'

সুধীর ভেবেছিল, প্রসঙ্গ না তুললেই হতো, কি লাভ আমার জেনে? কিন্তু তুলেইছে যখন, তখন বলতে হল, 'আজ্ঞে না, আপনার সাঁতরাগাছির কারখানার কথা বলছি।'

'সাঁতরাগাছির—কারখানা!'

হঠাৎ চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছিল বিশ্বাস সাহেবের। আর বেশ শক্ত স্বরেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওখানেও আমার একটা কারখানা আছে, এ ধারণাটা তোমার হল কেন হঠাৎ?'

সুধীর আস্তে আস্তে সাহস সংগ্রহ করছিল। বোধহয় সুধীর হিসাব করছিল, 'ভাত' না থাকলেও কতটা দূর পর্যন্ত এগোনো যায়। তাই বলেছিল, 'না, এমনি; ধারণা হবে কেন। অনাদিবাবু বলছিলেন, তাই—'

বাবু বলার ইচ্ছে ছিল না, তবু অনাদিবাবুই বলেছিল সুধীর। কে জানে, একেবারে চাকর কি না লোকটা। বিশ্বাস সাহেব কিন্তু অনাদিবাবু শব্দটায় যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেছিলেন, 'অনাদি বাবু! অনাদিবাবুটি কে? ও হো হো, অনাদি! মানে আমার ওই চাকর অনাদির কথা বলছ?'

বিশ্বাস সাহেবের এই সামান্য কথাটুকুর মধ্যেই ব্যঙ্গ ছিল, বিদ্রূপ ছিল, আর সুধীরের প্রতি তীক্ষ্ণ একটা অবজ্ঞাও ছিল যেন। চাকর অনাদির সঙ্গে যেন খুব ভাব জমিয়েছে সুধীর। অনাদির কথায় নাচছে।

নিজের এই বৃথা কৌতূহলের জন্য নিজেকে মারতে ইচ্ছে করেছিল সুধীরের। প্রতিজ্ঞা করেছিল, উত্তর দেওয়া ছাড়া প্রশ্ন আর করবে না কোনদিন।

বিশ্বাস সাহেব কিন্তু আর কোন কথা বলেননি। কারখানা যদি নেই তো কী আছে ওখানে—উত্তর দেননি।

পরে, ক'দিন পরে বিনা প্রশ্নেই হঠাৎ খাপছাড়াভাবে বলেছিলেন, 'ওখানে আমার একটা আশ্রম আছে। দুঃস্থদের জন্যে। মানে আশ্রয়হীনের আশ্রয় আর কি, আশ্রমই তো বলে তাকে, তাই না?'

আর তার পরের দিনই, হ্যাঁ—তার পরের দিনই বাড়ী ফিরে বলেছিলেন, 'চল হে, আজ তোমাকে বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই গে। তোমায় দেখলে খুশি হবেন, মিসেস বিশ্বাস।'

সুধীর অস্বস্তি অনুভব করেছিল, তবু পায়ে পায়ে এগিয়েও গিয়েছিল বৈকি। অনুসরণ করেছিল বিশ্বাস সাহেবের। আর বিশ্বাস সাহেব যখন নীচতলারই একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এই যে, তোমাদের প্রভু-পত্নী', তখন যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল সুধীর।

॥ ৮ ॥

পাথর হয়ে গিয়েছিল সুধীরের বোন অমিতাও। সেদিন নয়, আর এক দিন। যেদিন সুধীর এসে বসন্ত বিশ্বাসের আলতার কারখানার গল্প করেছিল। অনেকক্ষণ পর বলেছিল, 'দাদা, তোমার চাকরীটাই কি আর রাখা চলবে?'

সুধীর ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিল, 'চালাতেই হবে।'

'কিন্তু যদি বিপদ আসে?'

'আসবে !'

'দাদা, মার ওপর অভিমান করে নিজেকে এতটা শাস্তি দেবে ?'

'ভুল করছিস অমি, মার ওপর অভিমান নয়, ভগবানের ওপরও নয়। বরং বলতে পারিস ভাগ্যের ওপর আক্রোশে নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছে। দেখি না, কী আছে পেছনে।'

'আশ্চর্য !'

অমিতা নিশ্বাস ফেলেছিল, 'এত লোক কাজকর্ম করছে, সংসার চালাচ্ছে, তোমার মত জীবনে এমন জটিলতা আসছে না কারো —'

'আমিও আগে তাই ভেবেছিলাম অমি, এখন আর ভাবি না। এখন ভাবি, জটিলতা হয়তো সকলেরই আছে, শুধু তার রং আলাদা, গড়ন আলাদা।'

'তোমার কিন্তু পুলিশে খবর দিয়ে দেওয়া উচিত, দাদা !'

'পুলিশে খবর ?'

সুধীর হেসে উঠেছিল, 'পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে ? পুলিশে ? বিশ্বাস সাহেবকে বেইজ্জত করবে পুলিশে ? তাই কি সম্ভব ? বিশ্বাস সাহেবরাই তো ওদের পৃষ্ঠবল, বুকের বল। বিশ্বাস সাহেবদের বিবেচনার ওপরই তো আছে ওরা। আমি যদি পুলিশে খবর দিতে যাই, হয়তো পুলিশ অফিসার স্বয়ং সে খবর তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবেন বিশ্বাস সাহেবকে টেলিফোনে ডেকে। হাসাহাসি করবেন আমার অর্বাচীনতায়, তারপর আমাকে নিপাত করতে জাল ফেলবেন, পুলিশ সাহেব আর বিশ্বাস সাহেব দুজনে মিলে !'

অমিতা প্রতিবাদ করেছিল।

অমিতা বলেছিল, 'এটা তোমার একটু বেশী বলা হচ্ছে, দাদা ! একটু বেশী অবিচার করা হচ্ছে ওদের ওপর। সবাই সমান নয়।'

'হয়তো নয়।' সুধীর বলেছিল, 'হয়তো সততাও আছে। কিন্তু জল গভীর নাও হতে পারে ভেবে তো আর মাঝগঙ্গায় নেমে পড়া যায় না, সাহস করে ?'

অমিতা রেগে উঠেছিল, 'তাহলে এইটাই স্থির হচ্ছে—অন্যায়, অনাচার, বে-আইনি অপরাধ, সব কিছু দেখেও চোখ বুজে থাকব আমরা ! প্রতিকার হবে না ধরে নিয়ে প্রতিবাদটাও বন্ধ করব !'

'গরীবরা তাই করবে। তাই করাই উচিত গরীবদের। গরীব কথাটার মানে জানিস ? অবশ্য অভিধানে 'গরীবে'র কী অর্থ করেছে আমার জানা নেই, আমি আমার নিজের ব্যাখ্যায় এইটাই ধরেছি—গরীব মানে বোবা, কালা, স্থবির, অন্ধ। যে নিজের এই সীমারেখার বাইরে পদার্পণ করবে, তাকে মরতে হবে।'

'তাহলে সে মরণ মরাই ভাল' রেগে বলেছিল অমিতা।

সুধীর বলেছিল, 'ঠিক বলেছিস। কিন্তু মরণের যে আবার সঙ্গী জোটে ! সেই জ্বালায় মরাও হয় না। কেবলমাত্র যদি একার মরণ হতো, শালার ভগবান—'

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সুধীর। অমিতার বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে সামলে নিয়েছিল নিজেকে। জানে, অমিতা মুখে কিছু বলবে না, শুধু দু'চোখে ভৎ‍্সনার আগুন জ্বেলে উঠে যাবে এখান থেকে। সে ভৎ‍্সনা বলবে—ছি ছি, দাদা ! ছোটলোকের পেশা ধরে সেই তুমি ছোটলোক হয়ে গেলে ? শালা বলছ ?

অমিতার ওই আহত অভিমানের দৃষ্টিকে বড় ভয় করে সুধীর। কোথায় যেন একটা ধারণা আছে ওর, অমিতা অনেক উঁচু জগতের। দাদার থেকে, মার থেকে, অনেক উঁচুতে। যেন ওর ওই সেলাই ইস্কুলের চাকরীর খোলসটা খুলে পড়বে একদিন, নিজের মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠবে ও। তাই ওকে মান্য করে সুধীর। ওর রুচিকে সমীহ করে, ওর পছন্দকে মূল্য দেয়। আবার মমতা করতে, বন্ধুত্ব করতে, সর্ববিধ গল্প করতে ওই অমিতা।

তাই "শালার ভগবান" বলেই সামলে নিতে হল সুধীরকে।

তবু অমিতার কান কি এড়াতে পারল ? যদি পারতো, তাহলে

কি অমিতা বলে উঠতে পারতো, 'নেশাই শুধু মানুষকে নষ্ট করে না দাদা, পেশাও নষ্ট করে।'

কিন্তু নষ্ট হলেই বা উপায় কি? সুধীর ভেবেছিল, আমি কী! আমি কে! আমি যদি নষ্ট হয়ে যাই, যদি গোল্লায় যাই, যদি ইতর হই, ছোটলোক হই—পৃথিবীর কোথাও কোনো ক্ষতি হবে? পৃথিবী কি বড় একটা লোকসানের দুঃখে নিশ্বাস ফেলবে?

না, ফেলবে না।

আমার মা পর্যন্ত ফেলবে না। মা তার কোলের ছেলে দুটির গায়ে নতুন জামা দেখলে খুশি হবে, তাদের মনের মত করে খাওয়াতে পেলে খুশি হবে। ভাতের ভাবনা না থাকলে, খুশি হবে মা। এই সব পাওয়ার বদলে সুধীর নামক সাধারণ, একেবারে সাধারণ, ছেলেটি যদি পচে যায়, যদি পোকায় খাওয়া হয়ে যায়, দুঃখে বিগলিত হবে না মা।

হয়তো বা এও বলবে, 'জানি, ও এই রকমই হবে শেষ পর্যন্ত।'

'মা' শব্দটার উপর অনেক কাব্য, অনেক সঙ্গীত, অনেক নাটক রচিত হয়েছে জগতে, অনেক পড়েছে সুধীর, অনেক শুনেছে। কিন্তু জীবনমঞ্চে তার আবৃত্তি নেই, অভিনয় নেই।

না কি শুধু সুধীরের ভাগ্যেই কিছু নেই?

অমিতা বলেছিল মায়ের উপর অভিমানে। না, অভিমানে নয়, মায়ের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জিতবে বলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না ভাবতে বসেছিল সুধীর।

কী অপূর্ব প্রতিশোধ নেওয়া হয় যদি সুধীর হাজারে হাজারে টাকা, বস্তা বস্তা টাকা, রাশি রাশি টাকা এনে মার সামনে ঢেলে দিতে পারে!

বলবে না যে, গুনে রাখো, তুলে রাখো। বলবে, 'নাও, যত পারো খরচ কর। ফুরিয়ে যাবে? যাক না। আরো কত চাই, বল?

না, তাকিয়ে দেখবে না সুধীর টাকার দিকে। অবহেলায় বলতে

পারবে, টাকা তো হাতের ময়লা। হয়তো এ সবই হতে পারে যদি সুধীর বসন্ত বিশ্বাসের আলতার কারখানার বিশ্বাসী ম্যানেজার হতে পারে।

ড্রাইভার থেকে এই পোস্টে?

আশ্চর্য বৈকি!

কিন্তু এ আশ্চর্য ঘটেছিল।

সুধীরকে অফার করেছিলেন বিশ্বাস সাহেব।

কিন্তু সেটা পরে।

প্রথম দিকে নয়।

প্রথম দিকে চমৎকৃত করে তুলেছিলেন মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে।

বলেছিলেন, 'এই যে তোমাদের প্রভু-পত্নী! সঙ্গীর অভাবে এনার বড় কষ্ট! আমার তো দেখছ অবস্থা! নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। তাছাড়া হেসেছিলেন বিশ্বাস সাহেব। হেসেছিলেন, কারণ তখন রঙে ছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'তাছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, আমার সঙ্গটা তো খুব একটা উপাদেয়ও নয় ওঁর কাছে। হবার কথাও নয়। তুমি যদি কষ্ট করে—মানে জোর কিছু নেই, তোমার মহানুভবতার বশেই যদি ভদ্রমহিলাকে একটু সঙ্গ দাও।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল সুধীর। একবার বিশ্বাস সাহেব আর একবার মিসেস বিশ্বাসের দিকে।···আর তীব্র একটা সন্দেহ যেন কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মত মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠেছিল।

মনে হয়েছিল, কী এ?

তামাসা?

ব্যঙ্গ?

নিষ্ঠুরতা?

না কি কোনো ফাঁদে ফেলবার চক্রান্ত? ওই রকম নিটোল নিখুঁত গড়নে আর অনবদ্য মুখশ্রীতে অনুপম যৌবনবতী সুন্দরী স্ত্রীটিকে যুক্ত

সজ্ঞানে কেউ বন্ধু জুটিয়ে দেয়? বলে, এস হে একটু কাছে বসো, ভালবাসো, মহিলাটি বড় একা!

'এইটি আমার নতুন ড্রাইভার'—পরিচয় করিয়ে দেন বসন্ত বিশ্বাস স্ত্রীর সঙ্গে, 'এর খাওয়া দাওয়া বাড়ীতে তেমন হয় কি না হয়, ওর সকালের জলখাবারটা তো তুমি অনায়াসেই এখানে ব্যবস্থা করে দিতে পারো—'

সুধীর একটু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু টেঁকেনি।

বিশ্বাস সাহেব হেসে উঠেছিলেন, 'আরে কথাতেই আছে—যাচা কন্যা, কাচা কাপড়! হাতে এলে হাতছাড়া করতে নেই! তবে? 'যাচা কন্যা' তো বটেই, যাচা খাদ্যই কি হাতছাড়া করতে আছে?··· কি গো, তুমি এমন লজ্জায় অধোবদন হয়ে আছ কেন? তোমার শরীরে তো কই কখনো লজ্জা দেখিনি?'

'না, লজ্জা কিসের?' বলে মিসেস বিশ্বাস, যাঁর নাম পরে জেনেছিল সুধীর, কুসুম, তিনি এগিয়ে এসে সুধীরের কাছে অমায়িক হাস্যে বলেছিলেন, 'এসো ভাই! উনি সত্যিই বলেছিলেন, মানে উনি ঠিকই বলেছেন, আমি বড় একা একা থাকি, তবু যদি তুমি—'

মাথার উপর বিদ্যুৎ শিখার আলো জ্বলছিল, এই চড়া পাওয়ারের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকা এই যুবতীকে এক ডিটেকটিভ গল্পের রহস্যময়ী নায়িকা বলে মনে হচ্ছিল!

ঠোঁটে রং লাগানো মেয়ে বা মহিলা পথেঘাটে তো কম দেখেনি সুধীর! তবু মিসেস বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না সে, তাঁর উগ্র তীব্র প্রখর রংলেপা ঠোঁটটির জন্য।

সুধীরের মনে হল, 'এইমাত্র রক্তপান করে এলাম' এমন একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে রেখে দেওয়ার মধ্যে সৌন্দর্য কোথায়? কী মনস্তত্ত্ব নিহিত আছে ওর মধ্যে?

কিন্তু শুধুই কি ঠোঁটের রং?

মিসেস বিশ্বাসের গায়ের রংও তো কম চড়া নয়, আর কম

প্রত্যক্ষগোচর নয়! অদ্ভুত সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা একখানি শাড়ী গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন মিসেস বিশ্বাস, হিসাবমত বেশ ভাল করেই জড়িয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য তাঁর সৌন্দর্য প্রস্ফুটনে কোনো বাধা হচ্ছিল না।

এই বোধকরি 'জল নাইলন' ?

নামটা জানত না সুধীর। তার আগের মনিববাড়ীর দাদাবাবু-বৌদির কথোপকথনের মধ্যে ঐ নামটি দু-একবার শুনেছিল সে।

সুধীর জানে না পিছনের সিটে বসা আরোহীদের এ ধারণা কেন হয়—গাড়ীর চালক বেচারী বদ্ধকালা। কেন হয় তা' জানে না, তবে দেখেছে, সে ধারণা প্রায় সকলেরই হয়। তাই কথোপকথনের বল্‌গাবিহীন ঘোড়াটিকে ছুটতে দেয় ইচ্ছামত।

সুধীর অবশ্য বদ্ধকালা নয়। সেই ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে মনকে এবং কানকে না ছুটিয়েও সুধীরের কানে এসেছিল একটি বিখ্যাত চিত্রতারকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা তারকার 'জল নাইলন' শাড়ীর কথা তুলে 'ছি ছি' করে ধিক্কার দিচ্ছেন।

সেদিন সুধীরের মনে হয়েছিল ওই জল-শাড়ী কি মাত্র এমন সংখ্যায় উৎপাদন হয় যে, তারকারাই সব ফুরিয়ে ফেলে ?

আজ সেই কথাই মনে পড়ল সুধীরের। অতএব মিসেস বিশ্বাসের দিকে তাকাতে পারছিল না সুধীর। আর ওর সেই অপ্রস্তুত অবস্থাকে কৌতুকের কাজে লাগাতেই বোধকরি বিশ্বাস সাহেব একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েও ফের ফিরে এসে বলেন, তাহলে তোমরা পরিচিত হয়ে গেলে ? দেখছ তো কুসুম, তোমার জন্যে কত ভাবি আমি! নিজের প্রেষ্টিজ সম্পর্কে চিন্তা না করেও—অবশ্য একে, ইয়ে—কী যেন নাম তোমার ? সুধীর না ? হ্যাঁ, সুধীর। তা তোমাকে আমি চাকরবাকরের দলে ফেলিনি।···বুঝলে কুসুম, ভদ্রলোকের ছেলে, জাতে ভাল, বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল, কেবলমাত্র অবস্থার চাপে পড়ে বি. এ. একজামিনটা দিতে পারেনি।

এই ছোট কাজ ধরেছে। কিন্তু তার জন্যে আমরা ওকে ছোটলোক ভাববো কেন ?—বল, সেটা ভাবা কি মনুষ্যত্ব ? জানি, গরীব হওয়া অপরাধ, অক্ষমতার অপরাধ, কিন্তু কি করবে—সবাই তো সমান হতে পারে না ? কাজেই গরীব মানুষরা থাকবেই—'

সুধীরের জিভ মনে মনে উচ্চারণ করে, 'থাকবে, আর তোমাদের জুতো ঝাড়বে। কাজেই কিছু পরিমাণ লক্ষ্মীছাড়া গরীব হতভাগ্য থাকা দরকার বৈকি।'

মনে মনে উচ্চারণ করে, মুখে নয়। মুখে কী করে করবে ? বিশ্বাস সাহেব যে তার দুঃখে সহানুভূতি জানাচ্ছেন। যদিও অক্ষমতাকে তিনি রীতিমত অপরাধ বলেই গণ্য করে থাকেন, তত্রাচ সুধীরের ব্যাপারে করছেন না। করুণা করছেন। মহানুভবতার পরিচয় দিচ্ছেন।

কাজেই উত্তরটা মনে মনে দেওয়া ছাড়া উপায় কী ?

কথা বলে না সুধীর, চুপ করে তাকিয়ে থাকে ঘরের দেওয়ালে আঁটা ইলেক্‌ট্রিক ঘড়িটির দিকে।

'আচ্ছা, ও···কে।'

চলে গেলেন বিশ্বাস সাহেব।

আর ততক্ষণে শ্রীমতী বিশ্বাস সহাস্য বদনে এগিয়ে এসে বললেন, 'সাহেব তো দেখলাম 'আপনি' 'মশাই'এর ধার ধারলেন না, আমার কিংকর্তব্য ?'

এ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ একটিই। সে হচ্ছে শ্রীমতীও 'আপনি' 'মশাই'এর ধার ধারতে চান না, 'তুমি' চালাতে চান।

কিন্তু কোন্ অধিকার বলে ?

বয়সের অধিকার নিশ্চয়ই নয় !

অতএব পদমর্যাদার অধিকারে। প্রভু-ভৃত্যের উচ্চ-নীচ ভেদের নীতিতে। সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সুধীরের। কিন্তু চুপ করে থাকা চলে না, কথা বলতে হয়। ভদ্র কথা, ভব্য কথা, সৌজন্যের কথা। তাই সেই কথাই বলে সুধীর, 'সাহেব যা বলেন, তাই বলবেন।'

'বাঁচালে।' শ্রীমতী একটু মধুর মোহন হাসি হাসেন, 'আমার আবার ওই "আপনি আজ্ঞেগুলো' কেমন আসে না। 'তুমি'ই বলব, আশা করি কিছু মনে করবে না ?'

সুধীর সেই রক্তাক্ত ঠোঁটের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রেখে নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'মনে করবার কী আছে !'

'না থাকলেই ভাল। যাক্ তোমার জন্যে একটু কফি তৈরী করি, বসো।'

সুধীর চঞ্চল হয়। কণ্ঠে আপত্তির সুর আনে, 'না না, ওসব কিছু দরকার নেই। আমি যাই।'

শ্রীমতী বিশ্বাস সহসা ঝরণাধারার ভঙ্গীতে হেসে ওঠেন। ঝঙ্কার দিয়ে দিয়ে হাসেন। তারপর বলেন, 'ওমা, সে কী! এক্ষুণি উঠবে কী? বিশ্বাস সাহেব বলে কত আশা করে নিয়ে এলেন তোমাকে, তাঁর বিরহিণী স্ত্রীর নিঃসঙ্গতার দাওয়াইস্বরূপ, আর তুমি কিনা রোগীর নাড়িটা পর্যন্ত না দেখে—'

সুধীর আরক্তমুখে বলে ওঠে, 'দেখুন, আমায় মাপ করবেন; আমি ঠিক এ ধরনের কথাবার্তায় অভ্যস্ত নই।'

'আহা নও, হবে। আমিই কি অভ্যস্ত ছিলাম? ছিলাম না!' সহসা শ্রীমতী বিশ্বাসের কথায় যেন একটা জড়তা দেখা দেয়, সেই ঈষৎ জড়িত স্বরেই কথা শেষ করেন শ্রীমতী বিশ্বাস,—'পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, মা-ঠাকুমার চালে চলতে, আর তাঁদের চোখরাঙানি খেতে অভ্যস্ত ছিলাম, অভ্যস্ত ছিলাম সকালবেলা শিবপুজো করতে, আর সন্ধ্যেয় তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে। কেমন করে সব কিছু গুলিয়ে গেল, নতুন নতুন মজায় অভ্যস্ত হলাম। বুঝলে, অভ্যাসটা কিছুই নয়, ওকে আকাশ-পাতাল বদলে ফেলা যায়।'

সুধীর তীব্র দৃষ্টিকে কোমল করতে পারছে না, পারছে না বিরক্তিকে দমন করতে, সন্দেহ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। সন্ধ্যাকালে একা বিশ্বাস সাহেবই যে রঙে থাকেন, তা' বোধকরি নয়।

কিন্তু চুলোয় যাক।

যা খুশি করুন ওঁরা নিজেরা, সুধীরকে কেন এই জটিলতার মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা? যেন জেনে বুঝে স্রেফ মজা দেখতে একটা রেশমী দড়ির ফাঁস তৈরি করে সুধীরের গলায় পরাতে উদ্যত হয়েছেন বসন্ত বিশ্বাস। এ সব কী! কালই কাজ ছেড়ে দেবে সুধীর!

'কী হল? চুপ করে গেলে যে?' শ্রীমতী বিশ্বাস যেন জড়তা কাটিয়ে ঝলসে ওঠেন, 'কই, একটু সহানুভূতি দেখালে না, কৌতূহল প্রকাশ করলে না, আমার জীবনকাহিনী শোনবার জন্যে উদগ্রীব হলে না—'

'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার এসব ভাল লাগছে না,' —সুধীর ভাবল, বলব না কেন? চাকরী তো ছেড়েই দেব, ভয় কিসের তবে? অতএব আবার বলে, 'আমায় যেতে দিন।'

শ্রীমতী বিশ্বাসের মুখে কি একটা কালো ছায়া পড়ল? অপমানের জ্বালার? বোঝা গেল না।

বরং আবারও হেসেই উঠলেন তিনি। 'কী মুস্কিল, আমি কি ধরে রেখেছি? যাবে, খুশি হলেই যাবে, তবে আবা-র আসতে হবে।'

সুধীরের রোখ চাপছে। মহিলাটিকে ডাউন করবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠছে, তাই বলে ওঠে, 'কেন বলুন দিকি? আবার আসতেই হবে, এমন ধারণা কেন হ'ল আপনার?'

'কেন? বাঃ সব কথা কি খুলে বলা যায়? তবে হবে!'

'না হবে না।' সুধীর গম্ভীরভাবে বলে, 'আর আসবো না আমি'

'আসবে না?'

শ্রীমতী বিশ্বাস হতাশার অভিনয় করেন, 'ভাবলাম তবু একজন ভদ্র শিক্ষিত লোক জুটল দুটো কথা বলতে, তাও দেখছি সইল না!'

সুধীর এতক্ষণে সেই রক্ত রঙের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, 'আমি আপনাদের ড্রাইভার, আমার সঙ্গে সেইভাবেই কথা বলবেন।'

'এই দেখ, তুমি অকারণ চটে যাচ্ছ। ড্রাইভার তা কি! ড্রাইভার কি মানুষ নয়? অদৃষ্টের পরিহাসে কেউ গাড়ী চাপে, কেউ গাড়ী চাপা পড়ে, ওটা কিছু না। আমার এই সন্ধ্যাবেলাটা একা বসে নিশ্বাস ফেলে ফেলে কাটে, কারো সঙ্গে সহজ হয়ে দুটো কথা কইতে পেলে—'

সুধীর তো মনে মনে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, অতএব সুধীর আর মনিবগিন্নীর সঙ্গে কথা বলছে না। তাই বলতে পারে, 'আপনার সঙ্গীর অভাব এটা আশ্চর্যের, আপনাদের হাই সোসাইটিতে—'

'আরে দূর দূর, হাই সোসাইটি! মানুষ নেই মানুষ নেই, সব রং করা পুতুল, স্প্রীঙের পুতুল, সুতোর টানে ওঠে বসে, চলে ফেরে, হাসে, কথা বলে।'

সুধীর মনে মনে বলে, তুমিই বা তা' ছাড়া কী?

মনে মনেই সব কথা। মুখে বলার কথা নয় এসব।

শ্রীমতী বিশ্বাস মুখের সামনে কোমল একটু মুঠি পাকিয়ে মুখ আড়াল করে ছোট্ট একটি হাই তুলে বলেন, 'তোমার নামটা যেন কী?'

'সুধীর সেন।'

'তা' আমি নামই করছি কি বল?'

'বলার কি আছে?' সুধীর প্রতিশোধ নেয়, 'বিশ্বাস সাহেব অনুগ্রহ করে চাকর-বাকর ভাবেন না বলেই তো আর—তা'ছাড়া অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছি না? নাম ধরেই ডাকবেন।'

শ্রীমতী বিশ্বাস একটু যেন চমকে ওঠেন। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন, অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই উদ্ধত ছোকরার দিকে। পরনের প্যান্টের তো পায়ের আগায় সুতো ঝুলছে, শার্টের কলারে সেলাই, তবু তেজটি বিলক্ষণ! চমকে ওঠেন, কিন্তু রেগে ওঠেন না। বলেন, 'তোমার মেজাজটা দেখছি একটু চড়া। আরও যারা এসেছে, তারা আমার ঘরে এসে দাঁড়াতে পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে, কথা কইলে হাত কচলেছে, আর—'

সুধীর শ্রীমতীকে কথা শেষ করতে দেয় না। হঠাৎ তার মনে হয় ভদ্রমহিলার বোধহয় মাথার গোলমাল আছে, এবং বিশ্বাস সাহেব সেই গোলমেলে মাথাকে ঠাণ্ডা রাখতে, সে মাথা যা চায় তাই জোগান দিতে চেষ্টা করছেন। তা নইলে গাড়ীর ড্রাইভারকে এভাবে বাড়ীর মধ্যে এনে গৃহিনীর সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার সত্যিই কি কোনো মানে আছে? সুধীর মনে মনে একটু হাসে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার এরকম মাথার গোলমাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যে গোলমাল নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার সঙ্গী জুটিয়ে দিলে একটু কমে।

টাকা টাকা!

সুধীর লম্বা লম্বা চুলসুদ্ধ মাথাটাকে একবার ঝাঁকিয়ে নিল। ভাবল এই টাকার অভাবে সুধীরের অথবা সুধীরের মত হতভাগ্যদের জীবন বৃথা হয়ে যাচ্ছে, আবার এই টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে টাকার কুমীররা জীবন মিথ্যা করে তুলছে। হ্যাঁ 'মিথ্যা' বললে মিথ্যা বলা হয় না।

এই সব স্বর্ণনেশায় উদ্‌ভ্রান্ত ছুটন্ত মানুষগুলোর জীবনের লক্ষ্য কি? মানসিক সুখ শান্তি, না দৈহিক আরাম আয়েশ? দৈহিক আরাম আয়েশ বললে, কোথায় সে বস্তু? আরাম আয়েশ, সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য, বাহার বিলাসিতার উপকরণপ্রাচুর্যে ঠাসাই হচ্ছে জীবন, বস্তুর উপকরণে বোঝাই হচ্ছে ঘরবাড়ী, কিন্তু সময় কোথায় সেই যত্নলব্ধ উপকরণগুলিকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবার?

নেই! ...চিনির বলদের সময় নেই চিনি খাবার। উদয় থেকে অস্ত তার কাটছে পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, অফিসে, হোটেলে। কাটছে স্বর্ণ-দেবতার পায়ে পায়ে ঘুরতে। কত জটিল, কত সর্পিল, কত নীচ নোংরা জঘন্য পথে সেই স্বর্ণদেবতার আনাগোনা! স্বর্ণ উপাসকদের অতএব সেই পথেই গতিবিধি। সেই নেশার পথে একবার এগিয়ে গেলে আর রক্ষা নেই, নিবৃত্ত হবার মন্ত্র যাবে ভুলে। 'আরো চাই'য়ের

নেশায় উন্মাদ হয়ে ছুটতে ছুটতে, যতক্ষণ না মুখ থুবড়ে পড়বে, ততক্ষণ নিবৃত্তি নেই।

আর মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য? সে জিনিসটা আদৌ জগতে আছে কিনা, এখনো তর্কসাপেক্ষ। বড়লোকের ঘরে তো আরোই দুর্লভ! উপকরণের ভারে ভারাক্রান্ত তার সেই সংসারের কেউই কি সুখী সন্তুষ্ট? বিরক্ত স্ত্রী, দুর্বিনীত পুত্র, বেয়াড়া মেয়ে, অসন্তুষ্ট আত্মীয়, ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশী, আর 'বাবু' চাকর, এ যুগের পয়সাওলা লোকের এইতো সম্বল! তবু অন্ধবেগে পয়সার পিছনে ছোটার বিরাম নেই সেই পয়সা-ওলাদের। নইলে বিশ্বাস সাহেবের কী দরকার শহরের দু'প্রান্তে দুটো কারখানা ফেঁদে নিত্য দু'বেলা তাঁতীর মাকুর মত টানা পোড়েনে?

ওঁর এই এখানকার আলতার কারখানাই তো যথেষ্ট ছিল। যে প্রচুরকে আহরণ করে জড় করেছেন, তাকে ধীরে সুস্থে উপভোগ করতে পারতেন, পারতেন অসুস্থ-চিত্ত স্ত্রীর নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা মমতাময় সঙ্গের স্পর্শে ভরিয়ে তুলতে। তাকে ভরাট করতে এমন একটা বিকৃত পথ ধরতে হত না। কিন্তু তা করবে না এরা। এ নেশা থেকে নিবৃত্ত হবার উপায় নেই এদের।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে ওঠে সুধীর। বলে ওঠে, 'নমস্কার! আসছি।'

শ্রীমতী বিশ্বাস বলে ওঠেন, 'সে কি! এক্ষুণি? বিশ্বাস সাহেব [illegible] গেলেন তোমাকে একটু যত্ন-আত্তি করতে, শুনলে তো? অথচ তুমি এক পেয়ালা কফি পর্যন্ত খেলে না! কী অন্যায় বল তো? নিদেন একটু চকোলেট[illegible]।'

সুধীর ঘুরে দাঁড়ায়। তিক্তস্বরে বলে, 'যারা আপনাদের এতটুকু প্রসাদকণিকা পেলে ধন্য হয়, এসব দয়া তাদের বিলোবেন, আমার এসব সহ্য হয় না, মাপ করবেন। কিন্তু সাহেবের গাড়ী চালাবার দায়িত্ব ছাড়াও যে চাকরীতে এত স[illegible]

দায়িত্ব থাকবে, এ জানা ছিল না আমার। জানা থাকলে নিশ্চয়ই চাকরী নেবার সময় চিন্তা করতাম। মনে হচ্ছে এ চাকরী রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কালকেই জানিয়ে দেব সাহেবকে।'

শ্রীমতী বিশ্বাস সহসা সোফায় এলিয়ে পড়েন। হতাশ কণ্ঠে বলেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি এরকম কেন বলতো? এমন তো দেখিনি। বেশ, আমার ব্যবহারে যদি তোমার বিরক্তি এসে থাকে তো না হয় ক্ষমাই চাইছি, হল তো?'

এ তো আচ্ছা মুস্কিল, সুধীর ভাবে, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বোঝাই যাচ্ছে। এর পাল্লা থেকে পালানোও তো শক্ত হচ্ছে দেখছি। এ কী! চাকরীর পিছনে এ ধরনের বিপদ আসতে পারে তা তো স্বপ্নের অতীত! মহিলাটির মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু প্রতিকার তো আমার হাতে নয়? তবে কেন—

আর আমিই বা এমন অদ্ভুত চাকরী করবো কেন? কেন? সুধীরের চোখের সামনে নিজের বাড়ীর চেহারাটা ভেসে উঠল। ভেসে উঠল মায়ের শীর্ণ কাঠ কাঠ মুখের কাট, আর তাঁর সদা বিরক্ত মুখভঙ্গী। ভেসে উঠল ভাইদের জরাজীর্ণ ধূলি-ধূসর পোশাক, অমিতার ক্লান্ত পাণ্ডুর মুখ।

কাজ ছেড়ে দিলে আরও প্রখর হয়ে উঠবে ওই চিহ্নগুলো। অমিতা বলবে, এখনো তোমার তেমনি ছেলেমানুষী দাদা? দেখতে পাচ্ছ না বাড়ীর অবস্থা?

ভাইয়েরা বলবে, আবার ইস্কুলে মাইনে বাকী পড়বে দাদা? আর মা নতুন করে মনে করিয়ে দেবেন, তাদের ভাত নেই। তবু কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি যাচ্ছি।'

মিসেস বিশ্বাস আর একবার ভুরু কোঁচকান। বলেন, 'খারাপ লাগছে? বিশ্বাস সাহেব বুঝি এখনো খারাপ মন ভাল করবার ওষুধ প্রয়োগ করেননি? তা' করবেন, করবেন, ধৈর্য ধরো। দেখবে সেই

স্বর্ণসিন্ধু মকরধ্বজের গুণে এই সব মনখারাপি রোগ বিলকুল সেরে যাবে।

সুধীর এবার আস্তে বলে, 'দেখুন আমি কেবলমাত্র গাড়ী চালানোর কাজ নিয়ে এসেছি, জানি না আপনাদের এখানের ভিতরের রহস্যটা কি? কিন্তু মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু বিপজ্জনক আছে। আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু এটা মনে রাখবেন, লোভী নই।'

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'নও, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমার কী হয় বল তো? একটা ছেলে নেই মেয়ে নেই—বাড়ীতে কেউ নেই। পাথর কারাগারে বন্দিনী! কেউ একটু দয়াও করে না—'

মুখটা ভারী করুণ দেখাল শ্রীমতী বিশ্বাসের। মনে হল ঠোঁটের সেই কড়া রংটা কালচে মেরে যাচ্ছে।

॥ ১০ ॥

'আলতা' শব্দটা কানে এলে, অনাধুনিকা মহিলাদের চরণপ্রান্তের একটি রক্তিম রেখাই স্মরণে এনে দেয়। শিশির গায়ে লেবেল আঁটা 'সতীশোভা' 'গৃহলক্ষ্মী' 'পতি সোহাগিনী' 'চরণ কমল'। এ ছাড়া আর কি? সেই বস্তুটা যে 'টন' 'টন' তৈরি হয়ে পিপে বোঝাই হয়ে চালান যেতে পারে, এবং তার উপযুক্ত বাজার থাকতে পারে, এটা সুধীরের ধারণার বাইরে ছিল। আলতা বেচে লাখোপতি হওয়া যায় এ কথা কেউ ভাবতে পারে নাকি?

অনাদির সঙ্গে ডেকে কথা কইবে না প্রতিজ্ঞা করেও প্রশ্নটা সেদিন না করে পারে না সুধীর। প্রশ্ন মানে বিস্ময় প্রকাশ।

বিস্ময় দেখে অনাদি হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'শুধু মেয়েদের পায়ে পরার জন্যে? আপনি যে হাসালেন ড্রাইভার বাবু! কত জিনিসে আলতা লাগে তা' জানেন আপনি? রঙে [illegible] ওষুধে লাগে, আরও কত কিসে লাগে। তাছাড়া—[illegible]

এখানে একটু বিরতি দিয়ে, একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'বিশ্বাস সাহেবের 'আলতা' তো আরো দামী চীজ্, সে তো খেতেও লাগে।'

এই রকমই হাসে অনাদি। অনাদির এই হাসিটা বড় বিশ্রী। আরো বিশ্রী সম্বোধনটা। বলে কিনা 'ড্রাইভার বাবু'।

শুনে প্রথমটায় মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সুধীরের। বলেছিল, 'মা বাপের দেওয়া একটা নাম আমার আছে অনাদিবাবু!'

অনাদিকে 'বাবু'ই বলে সুধীর। ইচ্ছে করেই বলে। বিশ্বাস সাহেব অনাদি সম্পর্কে বাবু শুনে হেসে উঠলেও বলে। যে লোকটা সুধীরের সঙ্গে অমন মাইডিয়ারি সুরে কথা বলতে আসে, সে যে নিতান্তই চাকর মাত্র, এটা যেন নিজের কাছেও স্বীকার করতে রাজী নয় সুধীর। যেন তার তুচ্ছতা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকতে পারলে নিজের সম্ভ্রমটা কিছু বজায় থাকে।

অনাদির সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করে না। ওর ওই বিশ্রী হাসি যেন অপমানকর। তাছাড়া বিশ্বাস সাহেবদের কোনো ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ না করবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুধীর, তবু বিস্ময় রোধ করা গেল না। অজ্ঞাতসারে অস্ফুট উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সে বিস্ময় প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

আর সেই অস্ফুট স্বগতোক্তিটা অনাদির কান এড়াল না।

অনাদির চোখ কান দুইই বড় বেশী তীক্ষ্ণ। কোনো কিছুই এড়ায় না ওদের কাছে। বিশ্বাস সাহেব তাই মাঝে মাঝে বলেন, 'শুনেছি কানে গরম সীসে ঢেলে দিলে শ্রবণশক্তিটা নষ্ট হয়ে যায়, ওটায় আইনের দায়ে পড়তে হয় অনাদি?'

বলেন, 'শুনেছি আজকাল কথায় কথায় লোকে একটা বাল্‌ব্ ছুঁড়ে বজ্জাত লোকদের শায়েস্তা করে, সে বাল্‌ব্ কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি?'

শুনে অনাদি দাঁত বার করে হাসে। বলে, 'তা' হলে তো

আবার ভাঁড়ার পাহারা দিতে আলাদা চোখ কান নিয়োগ করতে হবে সাহেব, নইলে যে পিপের আলতা ছড়িয়ে পড়ে অবস্থা বেপোটের করে তুলবে।'

বিশ্বাস সাহেব বলেন, 'হারামজাদা তুমি বড় ঘুঘু!'

অনাদি বিগলিত হাস্যে বলে, 'নইলে আজ্ঞে আপনার কাছে টিঁকে আছি!'

তা' সুধীরের অস্ফুট স্বগতোক্তি শুনেও তেমনি দাঁত বার করে হাসে অনাদি, 'খেতে লাগে শুনে অবাক হচ্ছেন বুঝি ড্রাইভার বাবু? লাগে, খেতেও লাগে। আলতারও যে রকমফের আছে গো মশাই, ড্রামেরও রকমফের। যার যা মাল সে তা ঠিক চিনে নেয়।'

অনাদির এই ব্যাখ্যায় সুধীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত হঠাৎ একটা বিদ্যুত প্রবাহ বহে যায়। ভয়াবহ এক সন্দেহের বিদ্যুৎ। কিসের ইঙ্গিত করতে চায় অনাদি? তবে কি বিশ্বাস সাহেবের এই আলতার কারখানাটা মুখোশ মাত্র? মুখোশের নীচে আলাদা মুখ? এ কোন সর্বনাশের অতল গহ্বরে পা ফেলতে এল সুধীর? কারখানার সঙ্গে সুধীরের কোনো সম্পর্ক নেই বললেই কি ভয় এড়ানো যাবে? মনকে চোখ ঠেরে কি আতঙ্ককে রোধ করা যায়? সম্পর্ক নেই, কিন্তু এর সঙ্গে সুধীরকে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে জাল পাতার আয়োজন তো চলছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

কে জানে ওই 'মিসেস বিশ্বাস' রূপিণী নায়িকাটি সত্যিই বিশ্বাস সাহেবের বিবাহিতা স্ত্রী কি না? বয়সে তো অনেক ব্যবধান। আর বিবাহিতা স্ত্রী হলে কি কোনো ভদ্রপুরুষ তার মনোরঞ্জনের জন্য এমন একটা কুটিল পথ অবলম্বন করতে পারে?

মহিলাটির কথায় মনে হল এর আগেও এ চেষ্টা চলছিল। আর এও অদ্ভুত আশ্চর্য, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের পক্ষে উপযুক্ত বলে নির্বাচন করার সময়ে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে নজর পড়ে বিশ্বাস সাহেবের!

অনাদিকে প্রশ্ন করলেই কি সহজ সরল পরিষ্কার উত্তর পা

যাবে ? ও[illegible]র নিজস্ব বিশ্রী ভঙ্গিতে কিছু রেখে কিছু ঢেকে অথচ কৌতূহল জাগি[illegible] দিয়ে কথা বলবে। আর তার সঙ্গে কুশ্রী হাসি হাসবে। অথচ সব জানতে না পারলে—

হঠাৎ মনে মনে হেসে ওঠে সুধীর। কী দরকার তার সব জানবার ?

এই মুহূর্তেই তো বিশ্বাস সাহেব, তাঁর আলতার কারখানা, আরও কোথায় যেন কিসের কারখানা, এবং রহস্যময়ী মিসেসটি সহ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেতে পারেন সুধীরের মন থেকে।

সম্পর্ক যেখানে কেবলমাত্র চাকর মনিবের, তখন আর সমস্যাটা কোথায় ? চাকরী ছাড়লেই তো পুরনো মনিব রাস্তার লোক। তখন তো তার মুখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যাওয়া যায়। হ্যাঁ, স্রেফ্ !

মনোরম সেই অবস্থাটা কল্পনা করে সংকল্প স্থির করে ফেলে সুধীর। কাল বলবে। কাল যখন সকালবেলা বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে গাড়ী নিয়ে বেরোবে, তখন জানিয়ে দেবে। বেশী কিছু তো নয়, শুধু বলে দেওয়া—ঘণ্টা কয়েক পর থেকে আমি আর আপনার চাকর নই। থাকতে রাজী নই। অতএব চুপচাপ বসে থাকে সুধীর অলসভাবে ষ্টিয়ারিঙে হাতটা আলগা করে রেখে।

কিন্তু শ্রোতা কৌতূহলশূন্যের ভঙ্গী নিলেও বক্তার যে মুখ চুলকোচ্ছে। তাই নিজে থেকেই সেধে বলে অনাদি, 'বিশ্বাস সাহেবের এখন হাতের থেকে আম বড় হয়ে গেছে, বুঝলেন ড্রাইভারবাবু ? কাজেকাজেই সেই আম সামলাতে আরো হাত ব[illegible] বিশ্বাসী হা[illegible]। যে হাত সাহেবের টাকার তোড়া নিয়ে নিজের পকেটে চালান করবে না। তা জিনিসটে বড় দুর্লভ। মনিবকে বিপদে ফেল[illegible] না, ফাঁদে ধরবে না, ঠকাবে না, এমন একটা বিশ্বাসী লোক কো[illegible]য় ? নেই। তবু সেই নিধি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সাহেব। মনের [illegible]টি [illegible]তে পারলে, আখের গুছিয়ে নিতে পারবেন দাদা !'

দাদা !

আবার সেই মাইডিয়ারি ভঙ্গী !

সুধীর বিরক্ত স্বরে বলে বসে, 'আমার আখের গুছিয়ে কাজ নেই, কাজটা ছাড়তে পারলেই ভালো। কালই ছেড়ে দেব চাকরী !'

'আহা-হা-হা, 'চুক্ চুক্ !' অনাদি বড় আক্ষেপের সুরে বলে, 'ছেড়ে দেবেন কী বলুন ? এত সুখের চাকরী ! বর্তমানে সুখ সুবিধের শেষ নেই, ভবিষ্যতের পথে রোশনাই জ্বালা ! এ চাকরী ছাড়তে আছে দাদা ?'

দাদা !

আবার সেই দাদা। সুধীর বিরক্ত চিত্তে কথায় যবনিকাপাত করে সরে আসে।

॥ ১১ ॥

মা বোনের সঙ্গে গল্প করবার সময় হয় সেই রাত্রে খেতে বসে। দিনের বেলায় তো কোনদিনই বারোটার আগে এসে পৌঁছতে পারে না সুধীর, ততক্ষণে অমিতা চলে যায়, ভাইরা স্কুলে, অতএব দিনের বেলা খাবার সময় শুধু মা।

কিন্তু মার সঙ্গে গল্প জ'ম কই ? মার সমস্ত কথার মধ্যেই যে অভিযোগের সুর। সংসারে যে অনটনের শেষ নেই, প্রতিটি কাজেই যে মাকে কষ্ট পেতে হয়, সে কি জানে না সুধীর ? জানে, তার [illegible] মরমে মরে থাকে, তবু উমাশশী তাঁর তূণ থেকে বাছা বাছা অস্ত্র [illegible] করেন। [illegible]আর করেন ঠিক ওই দুপুরবেলা খাবার সময়।

হয়তো ভা[illegible]তের পাশে ডালের বাটিটা বসিয়ে দিয়েই বলে ওঠেন, 'আজ তো সেরেফ এই ডাল আর আলু সেদ্ধ। বাজার হয়নি কাল থেকে।'

সুধীর সচকিত হয়।

সত্যিই যে গত সন্ধ্যায় বাজার করে রাখা হয়নি।

কী যে হল কাল! মাথাটা ধরেছে বলে রাত দশটা পর্যন্ত পার্কের ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ে থাকল। আর শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণ ভাবল, তবু ভাল, আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য রকমের ভাল যে, এই সব জায়গাগুলোয় শ্রেণী বিচার নেই। বড় রাস্তায় হাঁটতে, কি সাজানো সুন্দর পার্কে বসতে, কোনো ছাড়পত্র লাগে না, অধমরাও মাথা ধরলে পড়ে থাকতে পায়।

এই কথাই ভেবেছে। বাজার করা হয়নি, সে কথা মনে পড়েনি। মনে পড়লে নির্ঘাৎ-ই উঠে পড়ত, আর গিঁঠবাঁধা চটের থলিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তো একগাছা শুকনো কুমড়ো ডাঁটা, গোটা কতক হাজা পটল, পোয়াটাক গুলিগুলি আলু, আর হয়তো বা কানাপড়া দুটো বেগুন সংগ্রহ করতে।

কিন্তু ওই জিনিসগুলোই কি নিতান্ত সস্তা? সস্তা নয়, ওই তুচ্ছাতিতুচ্ছ রসদটুকু জোগাড় করতেই বারবার পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করে নিতে হয় সুধীরকে, শেষ রক্ষে হবে কি না।

মাছের প্রশ্ন ওঠে না।

সুধীরের মায়ের বৈধব্যের সূত্রে নয়, নিতান্তই অর্থনৈতিক কারণে। মাছ পর্যন্ত দৌড় দেবার জোর সে ঘোড়াটার নেই, যে ঘোড়াটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সুধীর। বেতো আর বুড়ো ঘোড়াটা।

মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে পিঁয়াজ। তা' সেই আমিষ পদবাচ্য আনাজটাও সব দিন হয়ে ওঠে না। উমাশশী তেল নুনের খরচের বা[illegible] প্রশ্ন তোলেন। সেই স্বপ্নময় স্বর্গীয় বস্তুটা যেদিন রান্না হয়, সে দিনটা শ্যামল আর বীরেশের উৎসবের দিন।

আর সত্যি বলতে, সুধীর আর অমিতাও সেদিন খেতে বসতে আলাদা উৎসাহ অনুভব করে। তবে ছোট দুটোর মত ব্যক্ত করে বসে না এই যা। সাধারণতঃ একাদশী বা উমাশশীর কোনো বার

ব্রতের দিন রান্নাঘরে এই সমারোহ। অমিতা রাঁধে সেদিন। শ্যামল বলে, 'বেশ গন্ধটা বেরোচ্ছে, না রে বীরে?'

বীরেশ বলে, 'একাদশীটা এত দেরী করে করে না এসে তাড়াতাড়ি করে এলে বেশ হয়, না রে ছোড়দা?'

শ্যামল তাড়া দিয়ে ওঠে, 'এই, কী বলছিস? মার কত কষ্ট আজ তা জানিস? ভাত টাত কিচ্ছু খেতে পান না।'

বীরেশ অপ্রতিভ মুখে বলে, 'না, এমনি বলছিলাম।'

এই আলোচনা উমাশশীর আড়ালে হয় বলেই কি রক্ষে? কানে গেলে কি উমাশশী ঘেন্নায় ধিক্কারে নিত্য একাদশীর বরাদ্দ করতেন?

নাঃ। তা নয়। তা হয় না।

অন্ন যেখানে সুলভ সেখানেই সম্ভব তার উপর অভিমান। দুর্লভ বস্তুর উপর অভিমান করতে হলে অনেক শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি অভাবে অভাবে ক্ষয়ে শেষ হয়ে আসা পরাজিত চিত্তের কাছে আশা করা যায় না। ছেলেদের এই আলোচনা উমাশশীর কানে এলে হয়তো উমাশশী তীব্র হয়ে তেড়ে আসতেন, কটু কথার বন্যা বহাতেন, কপালে করাঘাত করতেন, জীবনে আর ওই পিণ্ডি মুখে দেবেন না বলে দিব্যি গালতেন, আর সেই একাদশীর রাত ভোর হবার আগে থেকে জ্বালা জ্বালা করা হাত পাগুলো ভিজে গামছায় চাপতে চাপতে ভাবতে বসতেন, কী উপকরণ আছে আজ ভাতের? তুচ্ছাতিতম দীনাতিদীন সেই উপকরণটুকু থেকে 'মুখরুচিকর' কী একটু তৈরি করে নেওয়া সম্ভব? একখানা পোড়াপোড়া ডালচাপড়ি, অথবা একখানা শুকনো শুকনো পোস্তর বড়া জুটলে আর কিছুই লাগে না, তাই বা হয়ে ওঠে কই? সেটুকুও থাকে না সব দিন।

জুটলেও দেখিয়ে খাবার জো নেই, খেলে লুকিয়ে।

উপায় কি!

সব ক'টা পাতে দেবার মত থাকলে তো! অথচ দ্বাদশীর

দিনে জিভটা যে কী শত্রুতা সাধে! পেট আর জিভ এদের বাড়া শত্রু আর কে আছে?

কিন্তু বলার সময় উমাশশী শ্যামল বীরেশের নামই করেন। বলেন, 'শুধু ডাল আর আলুসেদ্ধ দিয়ে খেতে হাত পা ছুঁড়ে কেঁদে অস্থির হল ছেলে দুটো। অবুঝ অজ্ঞান, জানে না অবস্থাটা ওদের কী! বোঝে না এ সব বায়না ওদের সাজে না।'

সুধীরের ভূমিকা তো শুধু অপ্রতিভের।

সে ভূমিকা যথাযথ পালন করে সে। কুণ্ঠিত মুখে বলে, 'আহা ও কথা বলছ কেন? ওরা ছেলেমানুষ, ওরা কী বোঝে? আমারই হঠাৎ কাল—'

'হঠাৎ আর কি বাবা', উমাশশী উদাস মুখে বলেন—'হামেশাই তো এ রকম হচ্ছে। আর বাজার করলেই বা কী পোলাও কালিয়ার জোগাড় করে আনতে পারছ তুমি? আলুসেদ্ধর বদলে না হয় কুমড়োসেদ্ধ।'

সুধীর মাথাটা নীচু করে থালায় আঁক কাটে। একটু আগে যে ওর দারুণ খিদে পেয়েছিল, সেটা যেন হঠাৎ ভুলে যায়। খুব ছোটবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করে সে। খু—ব—ছেলেবেলার! একেবারে চৈতন্যের অস্ফুট ভোরের আধো আলো আধো অন্ধকার হাতড়াতে থাকে, কোন্ মায়ের কোলের কাছে বসে ভাত খেত সুধীর? দুধ খেতে হাত পা ছুঁড়ত?

সে কী অন্য আর কেউ?

এই উমাশশী কি সুধীরের নিজের মা? না সৎমা? আমিতার আর সুধীরের অন্য আর একজন মা ছিল? সে মা মরে গেছে?

এই যে মা, সুধীরের সামনে বসে, সে মা শুধু শ্যামল আর বীরেশের মা? তাই তাঁর সমস্ত চিন্তা ভাবনা দরদ মমতা ওই শ্যামল আর বীরেশকেই কেন্দ্র করে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে সুধীর। ছি ছি, এ সে কী

ভাবছে? ওই ছোট ছেলে দুটোকে কি সে হিংসে করছে? ওরা যে এখনো বাল্য অতিক্রম করেনি, সে কথা ভুলে যাচ্ছে কেন সুধীর? চারা গাছেই জল দেওয়ার দরকার, বড় গাছে কি জল দিতে হয়?

তবু মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায় সুধীরের, 'সকালে যদি শ্যামলটাকে একটুখানি বাজারে পাঠাতে, যা হোক কিছু আনতো—'

উমাশশী ছেলের কথাটা থামিয়ে দেন, কিন্তু ঝলসে উঠে নয়। ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, সে কথা তুমি বলতে পারো, ওদের আর এখন খোকা হয়ে থাকার বয়েস নেই, অবস্থাও নেই। কিন্তু ওদেরও তো মন বলে একটা বস্তু আছে বাবা? সে মনে সাধ বাসনা ইচ্ছে লোভ সবই আছে। জগতের সব কিছু থেকে বঞ্চিত, হাতে পয়সা পেলে আর কি নিজেকে সামলাতে পারে? সে দিন এক পো ডাল আনতে দিলাম শ্যামলকে, তিন ঘণ্টার মতন ছেলে নিরুদ্দেশ। তারপর ধমকের চোটে স্বীকার পেল সেই পয়সায় কচুরী কিনে খেয়েছে।'

সুধীর চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখল, ছেলের গর্হিত আচরণকে সমর্থন করছেন উমাশশী। বলছেন, 'জগতের সব কিছু থেকে বঞ্চিত, পয়সা হাতে পেলে নিজেকে সামলাতে পারবে কেন?'

বলছেন, 'ওদের তো মন বলে একটা বস্তু আছে, সে মনে লোভ আছে, বাসনা আছে!'

(যারা বঞ্চিত, যারা অভাবগ্রস্ত, তাদের তাহলে ন্যায় অন্যায় নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন না মানলেও চলে? পৃথিবী তাদের সমর্থক?) তবে সুধীর এত ভাবতে বসেছে কেন?

॥ ১২ ॥

রাত্রে খেতে বসে কাছাকাছি থাকে অমিতা। তখন যত গল্প। কিন্তু অমিতার কণ্ঠে কখনো অভিযোগ নেই, এ একটা আশ্চর্য! শুধু অমিতা বড় বেশী স্পষ্ট আর নির্ভীক।

তাই অমিতা জোর গলায় বলে, 'খবরদার দাদা, ওসব আদরের ফাঁদে পা দিতে যেও না। জানোই তো বড়র পীরিতি বালির বাঁধ! তা' ছাড়া মতলব তো বোঝাই যাচ্ছে। ওদের ভাঁড়ার উপছোনো দু'খানা লুচি কচুরী খাইয়ে তোমাকে কিনে নিতে চায় আর কি! নইলে তোমার স্বাস্থ্যোন্নতির চিন্তায় ওদের আর ঘুম হচ্ছে না?'

এই সময় উমাশশী আর দু'খানা রুটি হাতে এসে দাঁড়ান। দ্বিতীয় প্রস্থ নেবার অনুরোধ স্বরূপ। রোজই আসেন একবার করে খাওয়ার শেষে। কিন্তু উমাশশীর মুখের চেহারায় কি সেই অনুরোধ উপরোধের আগ্রহ দেখা যায়?

যায় না।

উমাশশী 'অফার' করেন, কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়, 'না' শুনলেই খুশি হবেন। ওরাও সেটা বোঝে। তাই নেবার ইচ্ছে থাকলেও বলে 'নেব না!' মাকে প্রসন্ন করার এই এক উপায়।

উমাশশী এটা বুঝেও চোখ বুজে বসে থাকেন।

কিন্তু কেন? কারণ কি? সত্যিই তো আর উমাশশী সৎমা নন এদের?

নয়, তা সত্যি।

তবে আছে কারণ।

উমাশশীর ধারণা যাদের হাতে পয়সা থাকে, পথে বেরোলেই তারা নিশ্চয় খাবার দাবার কিনে খায়, অতএব তাদের পেট সর্বদাই ভরা থাকে। আর পয়সা যে উমাশশীর বড় ছেলে আর মেয়ের হাতে নিশ্চয়ই থাকে, সে ধারণাও উমাশশীর বদ্ধমূল। নিজের রোজগারের পয়সা নিজের হাতে কিছু না রেখে সমস্ত অন্যের হাতে তুলে দেয় নাকি কেউ?

অতএব ওদের পেট কাঁদার কথা ভেবে মন কাঁদে না উমাশশীর। বরং ওরা না নিলে যে রুটি দু'খানা বাঁচে, সেই দু'খানা পরদিন সকালে একটু তেলের ছিটে দিয়ে ভেজে শ্যামল বীরেশের জলখাবারের

পাতটাকে রাজকীয় করে তোলা যাবে ভেবে খুশি হন। তাই অনাগ্রহ মুখ নিয়ে আর রুটি দু'খানা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন উমাশশী, ভাইবোনের আলোচনার অংশ কানে যেতে ভুরু কোঁচকালেন। তারপর বললেন, 'লুচি কচুরীর কথা কী হচ্ছিল?'

সুধীর উত্তর দেয় না।

অমিতা বলে ফেলে, 'দাদার নতুন মনিবের দাদার স্বাস্থ্য চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। তাই ওনাদের কাছে জলখাবার খাওয়ার প্রস্তাব করেছেন।'

'জলখাবার খাওয়ার?' উমাশশী কঠিন মুখে বলেন, 'মাইনে কমিয়ে দিয়ে?'

'আরে কমিয়ে দিয়ে কি!' অমিতা তাড়াতাড়ি বলে, 'এমনিই। গিন্নীর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে মনিব অনুরোধ জানিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যে টিফিনটা প্রভুপত্নীর কাছে খেতে।'

বিনা স্বার্থে, এবং বিনা কারণে কেউ এ হেন প্রস্তাব করতে পারে, সে কথা উমাশশীর বিশ্বাসে আসে না। তাই উমাশশী বলেন, 'মাইনে না কমাক, কাজ নিশ্চয় কিছু বাড়াবে। তা' মন্দই বা কী? এই তো খাটবার বয়েস। তা'ছাড়া, দু'বেলা একটু ভাল মন্দ খেতে পেলে— তা' তুই ধন্যবাদ দিয়েছিস তো?'

এবার সুধীর একটু হাসে। বলে, 'ওইটাই একটু ভুল হয়ে গেছে, প্রস্তাবটার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

'দিসনি? ধন্যি বাবা! এতখানি বয়েস হল, হুঁস যদি এতটুকু থাকে! থাকবেই বা কোথা থেকে? গুরু লঘু জ্ঞানই যে নেই। যাক্ কাল খাবার সময় বলিস ভাল করে—'

'খাবার সময়?' হঠাৎ সুধীর জোর গলায় হেসে ওঠে, হয়তো বা একটু বেশী জোরেই। ইচ্ছাকৃত এই শব্দ করে হাসা হাসিটাকে অতঃপর সামলে নিয়ে বলে, 'সত্যি খাবো না কি?'

'খাবি না?'

উমাশশী বিমূঢ়। 'খাবি না মানে ?'

'খাব না মানে খাব না। আর কোনো আলাদা মানে নেই! আমি তো আর পাগল নই যে ওই প্রস্তাবে রাজী হবো!'

উমাশশী বিরস গলায় বলেন. 'মনিব ভালবেসে হিত চাইছে, সেটুকু নেওয়া যে পাগলের কথা তা জানতাম না। এত যে কিসের অহঙ্কার তোদের বুঝি না। ভাল ঘরের ব্যাপার, নিশ্চয়ই ভালই খাওয়ার আয়োজন।'

'নিশ্চয়।' সুধীর বলে, 'সে আর বলতে।'

এ এক কৌতুক।

উমাশশী এ কৌতুক ধরতে পারেন না। তাই আবারও বলেন, 'তাহলে সাধা জিনিস ঠেলে ফেলবারই বা দরকার কি ? এটা জেনো, খাদ্য নারায়ণ, আর সেটা ভগবানেরই দেওয়া! মানুষ নিমিত্তমাত্র। সেই খাদ্যকে অবহেলা করা মানেই ভগবানের দানকে অবহেলা করা।'

মায়ের এই যুক্তিতে মনটা করুণায় ভরে যায় সুধীরের। মা যে তাঁর বড় ছেলের প্রতি মমতাহীন, এ কথা ভেবেছে ভেবে অনুতপ্ত হয়। হেসে নরম গলায় বলে, 'নারায়ণকে খেয়ে ফেলাও তো সাংঘাতিক কথা গো মা! তাছাড়া একা একা নারায়ণকে সাবাড় করছি, এটাই বুঝি খুব ভাল লাগে ?'

উমাশশী জো পান। এই অবসরে মনের বাসনা ব্যক্ত করে বসেন, 'তা' সত্যি। বুঝতে পারছি তোর মনের কথা। তা' কোনো ছুতো করে খাবারটা বাড়ীতে নিয়ে আসা যায় না ?'

'বাড়ীতে।'

নিয়ে আসা! সুধীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুতের 'শক' লাগে। উমাশশীর লোভার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত মনটা মুহূর্তে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু সে কোনো কিছু বলার আগেই অমিতা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, 'দ্যাট্স রাইট। এইটা তোমার মনে

আসছিল না দাদা? বাসনমাজা ঝিয়েরা যেমন মনিব বাড়ী থেকে গামছা চাপা দিয়ে ভাতের কাঁসি নিয়ে—'

হাসির দাপটে কথা শেষ করতে পারে না অমিতা। আর ওর হাসি দেখেই বোধকরি সমস্ত ব্যাপারটাকে লঘু করে ফেলতে সুধীরও হো হো করে হেসে ওঠে। অস্বাভাবিক জোরে।

দুই ভাই-বোনের এই কৌতুক হাস্যের দিকে তাকিয়ে রাগে অপমানে দুই চোখে আগুনের ফিনকি ফোটে উমাশশীর। আর অপমানের অনুভূতিটা ফিরিয়ে দেবার তীব্র ইচ্ছায় যে সন্দেহ এতদিন মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন, সেটা ব্যক্ত করে বসেন, 'হ্যাঁ, কথাটা আমার নির্বোধের মতই হয়েছে বটে। মস্ত নির্বোধের মতই হয়েছে। কী করবো, ভগবানের বিড়ম্বনায় পোড়া মায়ের প্রাণটা যে গড়া হয় অবুঝ-অজ্ঞানতা দিয়ে। ওই হতভাগা দুটোর কথা মনে পড়লে—' রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে বলে ওঠেন উমাশশী, 'তোমরা তবু ইচ্ছেমত দোকানে পসারে খেতে পারো। খাও-ও অবিশ্যিই। ওই হতভাগা দুটোই—'

'আমরা ইচ্ছেমত দোকানে পসারে খাই!'

'আমরা ইচ্ছেমত দোকানে পসারে খাই!'

দুটো বজ্রাহত কণ্ঠ একই সঙ্গে একই কথা উচ্চারণ করে ওঠে, আড়ষ্ট ভাবশূন্য মুখে। কিন্তু উমাশশী যে ফণা তুলেছিলেন সেই উদ্যত ফণা কি একেবারে ফিরিয়ে নেবেন বিনা ছোবলে? তাই নীরস কণ্ঠে বলেন, 'খাও কি না খাও তা তো দেখতে যাচ্ছিনা, খেলেই খেতে পারো তাই বলছি। হাতে তো পয়সা থাকেই। তবে এও বলি বাবা, তুমি যদি অবস্থার অনুরূপ বুদ্ধিতে চলতে, তা'হলে আজ সংসারের এমন হাড়ির হাল হ'তো না। কিসের যে অহঙ্কার তা'ও বুঝি না। ভাগ্যে অমন দয়ালু মনিব জুটেছে, তেমন লোক চতুর ছেলে হলে, আখের গুছিয়ে নেবার তাল খুঁজতো! আর তুমি? তুমি হয়তো কালই বলে বসবে—ওখানে

আমার মান থাকছে না, দেব কাজ ছেড়ে! আর তোমার ওই সুয়োবোন সেই তালে ধোঁয়া দেবে।'

সুধীর আর একবার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর একটা বিচিত্র হাসি হেসে বলে, 'ও আর কতটুকু ধোঁয়া দিতে পারবে মা? কতটুকু ক্ষমতা ওর? চোখে অন্ধকার দেখিয়ে দেবার মত যথেষ্ট পরিমাণ ধোঁয়া ভাগ্যদেবতার হাতেই আছে। ভয় নেই তোমার মা, চাকরী আমি ছাড়ছি না। দয়ালু মনিবের দয়ার সীমারেখাটা পর্যন্ত দেখবোই ঠিক করছি।'

॥ ১৩ ॥

পরদিনই কাজ ছেড়ে দেব, এ সংকল্প অতঃপর গঙ্গার জলে। অন্য এক নতুন সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠতে চায় সুধীর।

এতদিনের সমস্ত শিক্ষা, সংস্কার, ধারণা, রুচি, সবকিছুকে এক প্রবল ধিক্কারের উত্তাপে গালাই করে আর এক ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। দেখতে হবে তখন 'টাকা' বস্তুটা সুলভ হয়ে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয় কি না। আর এও দেখতে হবে টাকা দিয়ে কী কী কেনা যায়।

সুধীর কি একেবারে নিপাট নির্বোধ? সে কি জানে না টাকা দিয়ে জগতের কী কী জিনিস কেনা যায়? তাই আজ পরীক্ষায় নামতে চাইছে?

না, হয়তো অত নির্বোধ নয় সুধীর। হয়তো সে জানতো টাকা দিয়ে জগতের অনেক কিছুই কেনা যায়। শুধু বাড়ী গাড়ী, গহনা শাড়ী, আসবাব উপকরণই নয়, মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি সবই কেনা যায় টাকা দিয়ে।

কিন্তু মাতৃস্নেহ?

সেখানেই বড়-সড় একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছিল, সেই জিজ্ঞাসার

উত্তর খুঁজবে এবার সুধীর। আর দেখবে 'বিবেক' বলে সত্যি কেউ কোথাও আছে কিনা। দেখবে ধিক্কারে বেঁপরোয়া হয়ে ওঠা কঠিন মনের ওপরও কামড় দিতে পারে এমন তীক্ষ্ণ দাঁত সে বিবেকের আছে কিনা।

আচ্ছা 'মন' বলে বস্তুটা কি শুধু উমাশশীর এই ছোট ছেলে দুটোরই আছে? উমাশশীর বড় ছেলের ছিল না? তাই তা'তে লোভ বাসনা ইচ্ছে সাধ বলেও কিছু ছিল না? না হলে বিশ্বাস সাহেবের আলতার কারখানার ভয়ে সে ছুটে পালাতে চাইছিল কেন?

কই ভাবছিল না তো, ভাল থাকবার দায় কিসের আমার? কিসের বিনিময়ে? পৃথিবী কবে কি দিয়েছে আমায়?

না ভাবছিল না। হয়তো তার মধ্যেও যে 'মন' বলে বস্তুটা আছে, সেটা এর আগে পর্যন্ত খেয়াল ছিল না বলেই। এখন দেখছে বঞ্চিতদের ভাল থাকবার দায় নেই, পৃথিবী তাদের দুর্নীতির সমর্থক। অতএব—

পৃথিবী?

হ্যাঁ, পৃথিবী বৈকি!

শাস্ত্রের কথা—জননী পৃথিবীর প্রতীক!

একদা নাকি চতুরবুদ্ধি গণেশ জননীকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণের কাজ চালিয়ে দিয়েছিল।

দেবতার রাজ্যের নিয়মেই তো মানুষের নীতির গঠন। সুধীরের মতন মাটির পৃথিবীর মানুষরা তাই মাকে পৃথিবীর প্রতীক ভেবে বসতে, আর সেই ভাবনার সূত্রে জীবনের কোনো চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা করে না।

খেয়ে উঠে অমিতা বলেছিল, 'মায়ের ওপর রাগ করে হঠাৎ কোন ভুল করে বেসো না দাদা, মা তো ওই রকমই জানোই তো! তা' ছাড়া—সারা জীবন কিছু না পেয়ে শেষে ন্যায় অন্যায় বোধটাও ওঁর লুপ্ত হয়ে গেছে।'

'সুধীর বলেছিল, 'ওঃ! তাই নিয়ম বুঝি?'

'কি নিয়ম?' অনিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

সুধীর বলেছিল, 'ওই বোধটা লুপ্ত হয়ে যাওয়া?'

অমিতা বোধহয় একটু আহত হয়েছিল। দাদার মুখ থেকে এ ধরণের কথা শোনার অভ্যাস তো নেই। বরং অমিতাই মায়ের অসঙ্গত আবদার, অন্যায় অভিযোগ, ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, সুধীরই তখন তাকে বোঝায়, সান্ত্বনা দেয়।

আজ যেন দাদার গলায় এক নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সুর শুনতে পেয়েছে অমিতা। তাই তাড়াতাড়ি দাদাকে বোঝাতে বসেছে, 'নিয়ম টিয়ম জানি না দাদা, তবে মার অবস্থা বিবেচনা করলে দোষ দেওয়াও যায় না।'

সুধীর হেসেছিল। বিচিত্র এক ধরনের হাসি।

'আমিও তো তাই বলছি রে! দোষ দেওয়া যায় না। যারা অভাগা, হতভাগ্য, চিরদিনের বঞ্চিত, তাদের আর কোন কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না! হতভাগা হওয়ার গৌরবে এ একটা দিব্যি লাইসেন্স, কি বলিস?'

অমিতা দাদার কথা বুঝতে পারেনি। হয়তো ভেবেছিল দাদা কি হঠাৎ নেশা করেছে? হয়তো ভেবেছিল দাদার কি হঠাৎ মাথায় কোনো অসুখ করেছে? কি ভেবেছিল ঠিক জানে না সুধীর, তবু অমিতার চোখে একটা নতুন ছায়া দেখেছিল। অসহায়তার ছায়া। শূন্যতার ছায়া। দাদাকে হারিয়ে ফেলার মত একটা আতঙ্কের ছায়া।

সেই ছায়াকে সরিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি সহজ হতে চেষ্টা করেছিল অমিতা, 'কি ভেবে কি বলছ তুমি দাদা, তুমিই জানো। তবে ভেবে দেখ, মা তো ওদের দিকটা টানবেনই। আমরা তবু ছেলেবেলায় কিছু পেয়েছি, ওরা তো—'

সুধীরের ঠোঁটের কোণটা ব্যঙ্গে বেঁকে গিয়েছিল। সুধীর বলেছিল, 'তা সত্যি! আমরা তো তবু ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে মামার বাড়ী

গিয়ে লুচি খেয়েছি, রাবড়িও খেয়েছি। আর মামাতো ভাইবোনদের ছোট হয়ে যাওয়া জামা জুতোয় বেশ ভালই সেজেছি।…জীবনে যে একটা নতুন বই কেনা হয়নি আমাদের জন্যে, শুধু চেয়ে চিন্তে উঞ্ছবৃ না। করে পড়া চালিয়েছি, একথা মনে করতে যাবো কেন? তবু পড়েছি, পড়তে পেয়েছি, স্কুল কলেজে ফ্রী থাকলেও খাতা পেন্সিল ফ্রী দেয়নি দোকান থেকে, নগদ পয়সা খরচা করে কিনে দেওয়া হয়েছে আমাদের, সেই কথাটাই মনে রাখতে হবে, কি বল? কারণ মানুষ আমরা, নই তো মেষ!'

অমিতা হঠাৎ দাদার এই প্রকৃতি ছাড়া আচরণে ভয় পেয়েছিল, তাড়াতাড়ি শুতে চলে গিয়েছিল।

সুধীর দুঃখ বোধ করবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই দুঃখ বোধ করেনি। একটা আক্রোশের উল্লাস অনুভব করেছিল। তারপর—

রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখল সুধীর। আর দেখে অবাক হল। আক্রোশ নয়, প্রতিশোধ নয়, অভূতপূর্ব এক মুক্তির হাওয়া!

'ভাল থাকবার দায় আমায় নেই!' মনে মনে উচ্চারণ করল সুধীর। 'ভাল থাকতে হবে এ বাধ্যবাধকতা নেই।' তবে আর অসুবিধাটা কোথায়? 'ভার' কোথায়? নেই। শুধু একটা মুক্তির হাওয়া!

সেই হাওয়ার পাল তুলে পরদিন হাওয়াগাড়ীতে চড়ল সুধীর। মনে ভাবল, বিগত জীবনের উপর যবনিকা পাত হোক, ভবিষ্যতের পথে রোশনাই জ্বালার আয়োজনই চলুক।

কিন্তু শুধু 'স্রুরু হোক' বললেই তো হয় না। অপরাধের পথে পা বাড়াব' বললেও ইচ্ছেমত বাড়ানো যায় না। সে পথের সঙ্গী চাই। সে পথ যাদের [illegible] তারাই পারে হাত ধরে নিয়ে যেতে, তারাই পারে সে পথ দেখিয়ে দিতে।

সুধীরের মনিব নাকি সেই পথের পথিক।

অন্ততঃ অনাদি তো তাই বলে। কিন্তু অনাদির কথাই কি শেষ কথা? সেই কথার সাহসে সুধীর তার দয়ালু মনিবকে ডেকে বলবে, ই দেখি, কোথায় আপনার দয়ার সীমা রেখাটা?'

ধরণে এত 'মরিয়া' হওয়া কি সম্ভব? অন্ততঃ সুধীরের মত অতি সাধারণ ছেলের পক্ষে? নাঃ! সুধীরকে মরিয়া হতে হ'ল না। সুধীরের বরাতটা বোধহয় এবার তার জটিল গ্রন্থি মোচন করে খুলে পড়তে চাইছে। সুরাহা দেখা দিচ্ছে নিজে থেকেই।

মনিব নিজেই সেই সুরাহার পথে কথা পাড়লেন। নিঃশব্দে গাড়ী চালাতে চালাতে একসময় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি নাকি কাজ ছেড়ে দিতে চাইছ?'

সুধীর অবশ্য আচমকা এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তবু চমকে উঠল না। সামলে নিল। সামান্য হেসে বলল, 'একবার সে রকম ইচ্ছে হয়েছিল বটে।'

'হয়েছিল! অতীত কথা! এখন তাহলে আর সে ইচ্ছে নেই তো? ভাল!' কিন্তু বিশ্বাস সাহেব মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে বলেন, 'হঠাৎ ও রকম ইচ্ছের হেতু? অসুবিধেটা কি হচ্ছে?'

'না অসুবিধে আর কি? অসুবিধে কিছু না।' বলল সুধীর, কথায় ড্যাস টেনে ফুলস্টপের সুর দিয়ে। 'অসুবিধে কিছু নেই, অথচ কাজ ছেড়ে দিতে চাইছ?'—বিশ্বাস সাহেব মৃদু ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেন, 'ব্যাপার কি বল তো? হঠাৎ কোনো তালুক-মুলুক পেয়ে গেলে নাকি?'

সুধীর আর দ্বিধা করে না, পরিষ্কার গলায় বলে, 'আমাদের মত হতভাগাকে আর তালুক-মুলুক কে দিতে আসবে? শুধু একবার নতুন করে ভাগ্য অন্বেষণ করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল—যাক্ ছেড়ে দিন ও কথা। আমাদের মত লোকেদের নতুন পথ দেখতে যাওয়ার ফল আর কি হবে, হয়তো নতুন কাঁটাবনে পড়া!'

'কাঁটাবনে! হুঁ।' বিশ্বাস সাহেব গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমার এখানটা কি তোমার কাঁটাবন বলে মনে হচ্ছে?'

নতুন পথ না হোক, সুধীর কোথা থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে ফেলেছে হঠাৎ। নইলে এই গতকাল পর্যন্তও তো বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে কিছুতেই সাহস আর সপ্রতিভতা খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ আজ ভয় আসছে না।

আজীবন সঞ্চিত চিরদিনের সংস্কার আর চিরকালের মূল্যবোধগুলি যদি হঠাৎ মূল্যহীন বলে ধরা যায়, অর্থহীন বলে মনে হয়, হয়তো এমনই হয়।

সংসারের যে বিধবা যুবতীটি সংসার গণ্ডির মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা আর আচার পালনের শুচিতা দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, সে যদি হঠাৎ কুলত্যাগ করে বসে, মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়ে তার শুচিতাবোধের সীমা, আচার পালনের অভ্যস্ত নীতি।

কাঁটা-বনের উল্লেখে সুধীর রীতিমত সপ্রতিভভাবেই বলে, 'আপনার এখান বলেই শুধু নয় স্যার, গরীবের কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই কাঁটাবন।'

বিশ্বাস সাহেব দৈবাৎই হাসেন, সুধীরের এই কথায়, কেন জানি না, বেশ খোলা গলায় হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'দেখ তোমার কথাবার্তাগুলো মন্দ না, বেশ বুদ্ধিমানের মতই লাগে মাঝে মাঝে। তবে আর একটু চালাক হবার চেষ্টা করে দেখ না কেন? 'গরীব' কথাটার অর্থ কি? কিছু না। আলাদা কোনো অর্থই নেই ওর। 'নির্বোধের'ই আর একটা নাম গরীব, বুঝলে?'

সুধীর গম্ভীরভাবে বলে, 'বুঝতাম না স্যার। আজকাল নতুন করে চেষ্টা করছি বোঝবার।'

বিশ্বাস সাহেব সহসা তাঁর ড্রাইভারের মুখের দিকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করেন। যেন অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিতে চান। তারপর খুব আস্তে বলেন, 'চেষ্টা করছ? কিন্তু চেষ্টারও তো একটা পথ থাকা দরকার? এসো না আমার কারখানায়। দুদিন দেখলেই বুঝতে পারবে নির্বোধেরই আর একটা নাম গরীব কি না।'

সুধীর মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে থাকে।

সুধীর বোধকরি মাটি ছেড়ে জলে নামবার আগে শেষ পদক্ষেপটা সম্পর্কে একবার দ্বিধা করে। তারপর মনকে দৃঢ় করে নেয়। ছেড়ে দেয় মাটি। বলে ওঠে, 'বেশ আমি রাজী! বলুন কি করতে হবে?'

বিশ্বাস সাহেব আর একবার একটি তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বোধকরি ইচ্ছে করেও সুধীরকে একটু সময় দেন, তারপর মৃদু হেসে বলেন, 'সবুর! সবুর! কী করতে হবে, সে কি এক কথায় বলে ফেলা যাবে হে? এখন প্রথম প্রথম কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু দেখতে হবে। দেখে যাবে, শুনে যাবে, যা বোঝবার ইচ্ছে বুঝবে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নেবে তুমি বোবা কালা অন্ধ অবোধ! বুঝতে পারছ? হৃদয়ঙ্গম করতে পারছো আমার কথাটা।'

সুধীরও একবার তার প্রভুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে নিয়ে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ পারছি!'

'এর আর নড়চড় হবে না তো?'

'আশা করছি!'

'স্বর্ণহংসীর গল্প জানো? শুনেছ সে গল্প?'

'আজ্ঞে জানি বৈকি। কে না শুনেছে ও গল্প?'

বিশ্বাস সাহেব মৃদু হেসে বলেন, 'তা বটে। প্রচলিত গল্প, সবাই জানে। কিন্তু ব্যাপার কি জানো? জানে, মনে রাখে না। হাঁসের পেট চিরে একদিনেই সব সোনার ডিমগুলো বার করে নেবার চেষ্টায় সব ঘোচায়। এই আর এক টাইপের নির্বোধ, নিজেদেরকে যারা বেশী চালাক ভাবে। আশা করছি সেটা তুমি ভাববে না!'

এটা প্রশ্ন নয়, বিশ্বাস সাহেবের ধারণার কথা। এ কথার আর উত্তর দেয়না সুধীর। সাময়িক একটা স্তব্ধতা নামে।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বাস সাহেবই সে স্তব্ধতা ভাঙেন। বলেন, 'হ্যাঁ, মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হ'ল?'

সুধীর সচকিত হল। এই প্রসঙ্গান্তরের কারণ খুঁজল। আস্তে বলল, 'হ'ল।'

'কেমন দেখলে ?'

সুধীরের মনে হ'ল কড়া প্রশ্ন করে ওঠে—'আপনি কি আমাকে 'কনে দেখাতে' মেয়ে দেখিয়ে ছিলেন না কি ?' কিন্তু মনের ইচ্ছে তো সব সময় পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ধীরে বলে, 'ভালই !'

বিশ্বাস সাহেব একটু থেমে, একটু ভেবে বলেন 'হুঁ ! অবশ্য একটু 'এক্‌সেনট্রিক' বলে মনে হতে পারে তোমার, তবে ব্যাপার কি জানো ? মহিলাটি বড় বেশী নিঃসঙ্গ। মেয়েদের যা প্রধান অবলম্বন, বাচ্চা কাচ্চা, সেটা তো আর—'

সুধীরের চেঁচিয়ে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, 'তা' আমাকে এসব কথা বলছেন কেন ? আর সহানুভূতি উদ্রেক করাবার দরকার কি আপনার ? আমি যে আপনার বাড়ীর ড্রাইভার মাত্র, সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?'

এবারেও ইচ্ছে পূরণ হয় না। চুপ করেই থাকে সে। বিশ্বাস সাহেবও চুপচাপ। গাড়ী ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে থাকে। পার হতে থাকে গলি আর বাঁক।······ওই তো সেই মিষ্টির দোকান 'সুমিষ্টি'। খোলা বারকোশের ওপর দালদায় ভাজা জিলিপির স্তূপ, অনেকগুলো বোলতা ঘিরে ধরেছে সেই স্তূপকে। ওদের অবশ্য পয়সা দিয়ে খেতে হয় না। কিন্তু পয়সা দিয়ে যারা খায়, তারাও ওই বোলতার মতই ছেঁকে ধরে দোকানটাকে। সকালবেলা ভীড় ঠেলতে পারে না দোকানী। এখন একটু বেলা হয়ে গেছে, একটু ঢিলে পড়েছে।······

'সুমিষ্টি' ছাড়ালেই সোডা লেমনেড্ পান সিগারেটের দোকান ······সেটা পার হলেই সাইন বোর্ডের গায়ে সেই হাত। কাটা কব্জি একখানা 'ডানদিকের গলি' নির্দেশ করে বলছে—আদি ও অকৃত্রিম 'জানে'র বাড়ী। আপনার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অবস্থা জানুন। তিনশত বৎসরের প্রসিদ্ধ—

'আজ আমি ওখানে যাব।' সুধীর নিজেকে নিজে বলে মনে

মনে। সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার পর ফিরে এসে ঢুকে পড়বো ওই ডানদিকের গলিতে। দেখবো—

চিন্তায় বাধা পড়ল।

বিশ্বাস সাহেব বলে উঠলেন, 'তুমি সেদিন আমার এই সাঁতরা-গাছির কারখানাটার কথা জিগ্যেস করছিলে না?'

সুধীর চমকে উঠে বলে, 'না জিগ্যেস তো ঠিক—'

'ওই হল! তা চল আমার সেই কারখানাটা দেখিয়ে আনি।'

সেদিন যার উল্লেখেই চটে উঠেছিলেন বসন্ত বিশ্বাস, আজ নিজেই সেখানে নিয়ে যেতে চাওয়ার প্রস্তাবে সুধীর আশ্চর্য হল। তারপর ভাবল, এই লোকটার ব্যাপারে আশ্চর্য হবো না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি।

বড়লোকের খামখেয়াল! আর কিছু না।

আরো তিনটে বাঁক খেল গাড়ীটা। নিতান্ত সংকীর্ণ একটা গলির মধ্যে ঢুকল। করোগেট টিনে ঘেরা একটা কম্পাউণ্ডের সামনে দাঁড়াল। সুধীর দেখল, গেট বলতে যেটা, সেটাও কুদর্শন দু'খানা করোগেট টিনে তৈরী। বন্ধ। সামনে বড় বড় কতকগুলো গাছ।

বিশ্বাস সাহেবের গাড়ীর শব্দ হতেই খুলে গেল গেটটা। সুধীর দেখল জীর্ণ বিবর্ণ মস্ত একখানা একতলা বাড়ী বসানো রয়েছে সেই গাছগুলোর আড়ালে।

এটা কি! এতো স্রেফ একটা বসত বাড়ী। কালের রথচক্রে দীর্ণ! এ বাড়ীতে কিসের কারখানা?

গেটটা যে খুলে ধরেছিল, সে একটু সরে দাঁড়াল। বিশ্বাস সাহেব ঢুকলেন, বললেন, 'এসো। চিন্তার কিছু নেই, ঢুকে এসো।'

সুধীর তাঁকে অনুসরণ করে এগোল। একটা পাশ দিয়ে পথ। কিন্তু বাড়ীর পিছন দিকে ও কি? ওই বস্তুগুলো দেখবার কল্পনা কি স্বপ্নেও ছিল সুধীরের?

সে ধারণা করছিল, নির্ঘাৎ মদ চোলাইয়ের কারখানা। নইলে

এমন জঘন্য জায়গা নির্বাচন কেন ? এখানে এসেই বুঝতে হবে তাকে, নির্বোধের আর এক নাম 'গরীব' !

তবু—

বুকটা হিম হিম লাগল সুধীরের। মদ চোলাইয়ের থেকেও আরো ভয়ঙ্কর কিছু বুঝি ! সেই ভয়ঙ্কর সুধীরের জন্য অপেক্ষা করছে একরাশ শাড়ীর মুর্তি ধরে। শাড়ী ব্লাউজ সায়া !'

হ্যাঁ, বাড়ীর পিছনে গাছের ডালে ডালে গিঁট দিয়ে টানা লম্বা করে দড়ি টাঙানো, আর সেই দড়িতে সারি সারি শাড়ী ঝুলছে। মেলে দেওয়া শাড়ী। শাদা, লাল, নীল, হল্‌দে নানা রঙের। আর শুধুই শাড়ী নয়, আছে আনুষঙ্গিক। আছে সায়া ব্লাউজ তোয়ালে গামছা। অর্থাৎ অনেকগুলি মহিলার বাস এখানে। এই লোকচক্ষুর অন্তরালে।

কী এ ? মহিলা আশ্রম ? দুঃস্থ মহিলা হাসপাতাল ? সেলাইয়ের অথবা তাঁতের স্কুলের বোর্ডিং ? হয়তো অজ্ঞাতসারে, হয়তো বা নিতান্তই বিস্ময়ে সুধীরের কণ্ঠ অস্ফুটে উচ্চারণ করে, 'এখানে কিসের কারখানা ?'

চাকরটা গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

বিশ্বাস সাহেব ঘাসের ওপর পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগোচ্ছিলেন। এই অস্ফুট প্রশ্নের ভাষায় বোধকরি খুব একটা কৌতুক বোধ করলেন। সেই কৌতুকের কণ্ঠ প্রশ্ন করল, 'কী মনে হচ্ছে ?'

'বুঝতে পারছিনা ! মেয়েদের বোর্ডিং ? না কি—হাসপাতাল—

'সে কী হে' বসন্ত বিশ্বাসের কণ্ঠে যেন আরো বিস্ময়, 'এই যে শুনলে কারখানা ? অবশ্য ঠিক কারখানাও বলতে পার না তুমি একে, বরং বলতে পারো স্টোর !'

'স্টোর !'

'হ্যাঁ, স্টোর !' বিশ্বাস সাহেব অবলীলায় বলেন, 'শাদা বাংলায় গুদাম। যদিও আর কি, তোমার গিয়ে, ধান চাল সরষে তিসির নয়, তবে মানুষের খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার হয়।' কথা থামিয়ে বিশ্বাস

সাহেব চোখটা একটু কুঁচকে মৃদু হেসে বলেন, 'স্টোরটা হচ্ছে মেয়েমানুষের। অর্ডার মাফিক চালান যায় এখান থেকে। পারবে এখানে স্টোর-কীপ্রারের চাকরীটা নিয়ে থাকতে? দেখ, রাজী থাকো [illegible] পায়ে যাবে। এ চাকরী নিলে আর তোমার ওই [illegible] বানান সুখস্থ রাখতে হবে না।'

'যে কোনো কাজে রাজী—' সুধীর ড্রাইভারের কণ্ঠে যেন মেঘ গর্জে ওঠে, 'আপনি এই?'

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস সাহেবও কি গর্জে উঠলেন। এই অপমানকর কথায়?

আশ্চর্য্য, তা' তিনি উঠলেন না। একটি বিচিত্র হাসি হেসে বিশ্বাস সাহেব বলেন, 'হ্যাঁ আমি এই! দেখে একটু বিচলিত হচ্ছ বোধহয়? তা' হ'তে পারো, হওয়াই স্বাভাবিক। এককালে আমিও হতাম বুঝলে? মাথার চুল ছিঁড়তাম। কিন্তু ওই 'গরীব' কথাটার বানান ভুলে যাব এই প্রতিজ্ঞায় আবার সামলে নিতাম নিজেকে! তা' নেবে, তুমিও নেবে।'

'আমায় মাপ করবেন!' ক্ষুব্ধ গম্ভীর স্বরে বলে সুধীর, 'আমার দ্বারা হবে না।'

'হবে না!' বিশ্বাস সাহেব যেন একটু ক্ষুব্ধ হলেন। ক্ষুব্ধ হতাশ। বললেন, 'না হলে উপায় কি! তবে প্রথমটা ওই রকম মনে হয় বটে! আচ্ছা!…অবশ্য ভেবে দেখবার জন্যে দু'দিন সময় নিতে পারো। তবে—' বিশ্বাস সাহেবের অলস স্তিমিত ভঙ্গীর চোখ দুটোর মধ্যে হঠাৎ যেন দু' টুকরো আগুন জ্বলে উঠল। আর সুধীরের মনে হ'ল এই সকালবেলাতেও যে বিশ্বাস সাহেবের মুখটা লাল লাল, নাকটা ফুলো ফুলো। সেই লাল লাল মুখ আর আগুন ঝলসানো চোখে বিশ্বাস সাহেব কথাটা শেষ করেন, 'তবে আসার সময় যা বলেছি, সেটা মনে আছে আশা করি? বোবা কালা অন্ধ অবোধের

ভূমিকাটা যেন নির্ভুল হয়। আগে একবার একটা বোকা ছেলে অতি চালাকি করতে গিয়েছিল বুঝলে?' বিশ্বাস সাহেব সকৌতুকে বলেন, 'চোখ কান'কে বড় করে পুলিশে খবর দিয়ে এসেছিল।...তা' লাভের মধ্যে ছেলেটার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

'কী করলেন তাকে?' সুধীর তীব্রস্বরে বলে, 'মেরে ফেললেন?'

'আহাহা ইস্! তুমি কি আমায় খুনে গুণ্ডা ভাবতে সুরু করেছ নাকি হে? আর মেরে ফেললে কেরিয়ারের কথা ওঠে কোথা থেকে? আমি কিছুই করলাম না, আমি করবার কে? আমার করবার ক্ষমতাই বা কি? যা করবার পুলিশই করল। বছর তিনেক ঘানি টেনে মরল ছোকরা!'

সুধীর তীব্রস্বরে বলে, 'আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?'

বিশ্বাস সাহেব হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। সুধীরের মুখোমুখি হন। গম্ভীর স্বরে বলেন, 'না, ভয় ভাঙাচ্ছি! ধর্মের ভয়, পাপের ভয়, নীতির ভয়! ওই শব্দগুলো হচ্ছে ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ, বুঝলে? দূরে থেকে শোনো, মনে হবে কত কাণ্ডই ঘটে গেল। কাছে থেকে দেখলে টের পাবে সব ফক্কিকারি। ওই তোমার ন্যায়-নীতি পাপ-পুণ্যি তোমাকে ভাত দেবে?'

ভয়? তা ভয় ভেঙেছে বৈ কি। সুধীর সোজাসুজি লোকটার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তাকিয়ে বলছে, 'ওসব তো পুরণো কথা।'

'পুরণো! আরে বাস্! তোমার কথাগুলো বেশ লাগছে আমার। তা' এ জগতে পুরণো আর কোনটা নয় বল? নতুন কিছু নেই বুঝলে? আমাদের সেই গুহাবাসী প্রপিতামহদের থেকে বেশী আর কি শিখেছি আমরা? নতুন কি? তারাও অবিরত আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে, কেমন করে জীবনধারণের উপকরণগুলো অধিকতর উন্নত হবে, আরো বেশী আয়ত্তে আসবে, আর জীবনযাপনের পদ্ধতিতে উত্তরোত্তর আড়ম্বর আসবে। আর তো কিছু না? কাঠ থেকে পাথরে, পাথর থেকে লোহায়, লোহা থেকে মিশ্রণ ধাতুতে,

এই তো প্রগতি ? তা' এ যুগের আমরাই বা তার চাইতে আর বেশী কি করছি ? আজও তো ওটাই 'প্রগতি' বলে ধরা হচ্ছে ! শুধু রঙের তফাৎ, অলঙ্কারের তফাৎ, গড়নে কোনো তফাৎ নেই, বুঝলে হে—কি যেন নাম তোমার ?···হ্যাঁ হ্যাঁ সুধীর !···তা তোমায় সদুপদেশ দিই শোনো, ধীর মস্তকে একটু ভেবে দেখ দু'দিন। তারপর মতামত দিও।'

সুধীর দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে 'আচ্ছা !'

'ছ্যাটস রাইট। যাক, থাকো বা না থাকো, এখানের গিন্নীর সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দিই।'

'থাক্, থাক্। না না, আজ থাক্।'

'আহা কী মুস্কিল ! সে কি তোমায় খেয়ে ফেলবে ? বয়স্কা ভদ্রমহিলা, নিষ্ঠাবতী বিধবা—' বিশ্বাস সাহেব হেসে উঠে বলেন 'এসেছ তাঁর বাড়ীতে, অন্ততঃ তাঁর 'ঠাকুর ঘরের' একটু প্রসাদ খেয়ে যাও।'

এ আবার কোন ভাষা ? সুধীরের চোখের সামনে সব যেন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকে। অবাক হয়ে তাকায় সে। এতক্ষণ কি তবে ঠাট্টা করছিলেন বিশ্বাস সাহেব ? তবে যাচাই করে নেবার জন্যে পরীক্ষা করছিলেন ?

চিন্তাটা মাথার মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। ইত্যবসরে বিশ্বাস সাহেব ওই বাড়ীর একটা দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকেন, "কনক ! কনক !"

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে একটি বিধবা ভদ্রমহিলা বেরিয়ে আসেন, ফর্সা-থান পরা। খালি হাত, ছোট করে চুল ছাঁটা। সহাস্যে বলেন, 'আজ এত দেরী যে ?'

সুধীর চমকে তাকায়। গলার স্বরটা যেন কোথায় শুনেছে, মানুষটাকে যেন আগে দেখেছে। কোথায় ? কবে ? আগে ? না সম্প্রতি ?

॥ ১৪ ॥

মহিলাটির প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বাস সাহেবও সহাস্যে বলেন, 'এবার নিত্য হাজরে থেকে ছুটি নেব ঠিক করেছি।'

মহিলাটি একটু তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে বলেন, 'ভাল, সঙ্কল্প মহৎ! এ ছেলেটি?'

'এই যে, একেই এনেছি তোমাদের ভার নেবার জন্যে।'

'আমাদের ভার! তাই নাকি? খুব একটা ভারী হয়ে উঠেছি তা'হলে আমরা? বইতে লোক লাগবে?'

'খুব মিথ্যে নয়। সত্যিই মাঝে মাঝে একটু টায়ার্ড ফিল্ করছি।'

বিধবা মহিলাটি, একটু আগে সুধীর যাঁর নাম শুনেছে কনক, তাঁর চোখের কোণে এক টুকরো আগুনের ঝিলিক দেখতে পায়। যে আগুন ওই কাটা চুল আর শাদা থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

মহিলাটি যে নিতান্তই ঠাকুর ঘরের সেবিকা হিন্দু বিধবা মাত্র নয়, সেটাতে সুধীর নিশ্চিত হয়। এই বাড়ীর যে পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বাস সাহেব, সেটা কি তা'হলে সত্যি? সুধীরের বুঝি সামান্যতম আশা ছিল, ওটা বিশ্বাস সাহেবের একটা কড়া পরিহাস।

কিন্তু তা'হলে এই আগুনের ঝিলিক!

সেই আগুনের সঙ্গে কথাও ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'পাগল হয়েছেন? আপনার কখনো এক্ষুনি টায়ার্ড ফিল করলে চলে? এখনো কত কাজ বাকী!'

'অভিশাপ দিচ্ছ?'

'বালাই ষাট! শুভেচ্ছা জানাচ্ছি! আরো কত কাজ করবেন, সেই সব মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে মহৎ হবেন। জনসেবার পুণ্য ব্রত

নিয়ে ইলেকশানে নামবেন, ধাপে ধাপে এগোতে এগোতে চাই কি একটা মন্ত্রীত্বের গদিও অর্জন করে ফেলবেন। এখুনি ক্লান্তি?'

সুধীর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কে ইনি? কী সম্পর্ক এঁর, বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে? এঁর সাজসজ্জার সঙ্গে কথাবার্তাগুলো কি খুব একটা মানানসই? এঁরই ঠাকুরঘরের প্রসাদের লোভ দেখিয়েই কি সুধীরকে এখানে ধরে আনলেন বসন্ত বিশ্বাস? এঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা দুর্বোধ্য লাগছে, তাই কথাগুলো দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

বিশ্বাস সাহেব একটু বিচলিত স্বরে বলেন, 'তা' অভাগ্যদের কি দরজায় দাঁড় করিয়েই রেখে দেবে? এ বেচারাকে লোভ দেখিয়ে আনলাম, ঠাকুর ঘরের প্রসাদ খাওয়াব বলে—'

'আহা হা ইস!' কনক, বোধকরি কনকলতা, যেন আক্ষেপে ভেঙে পড়েন, 'বলতে হয় এতক্ষণ? চল, ভেতরে চল।'

সুধীর আর একটু অবাক হয়।

এই আক্ষেপটা কি ওঁর অকৃত্রিম? না সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যঙ্গ? কৌতূহলটা কিন্তু প্রবল হয়ে উঠছে। যেখানে কৌতূহল, সেখানে বোধকরি নীতি দুর্নীতির প্রশ্নটা একটু শিথিল হয়ে যায়। হয়ত এই মহিলাটিকে না দেখলে, বা এঁর দুঃসাহসিক ধরনের কথাবার্তা না শুনলে, এই পুরনো জরাজীর্ণ একতলা বাড়ীখানার মধ্যে ঢুকতে দ্বিধা করত সুধীর। মাঠের উপর মেলে দেওয়া ওই শাড়ী-ব্লাউজ-শায়া তোয়ালেগুলো তাকে আঙুল তুলে নিবৃত্ত করতে চাইত।

কিন্তু একটা নতুন আকর্ষণে বিশ্বাস সাহেবের পিছু পিছু ঢুকে পড়ল সুধীর। আর আরও একবার মনে হল তার, এঁকে কি আগে কোথাও দেখেছি?

বাড়ীটার বাইরেটা জীর্ণ, ভিতরটা খুব খারাপ নয়। ভিতরে ঢুকেই একটা অফিসঘর গোছের, সেইখানে বসালেন এঁদের কনকলতা, তারপর পর্দা সরিয়ে অন্তঃপুরের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

বিশ্বাস সাহেব মৃদু হেসে বলেন, 'মহিলাটিকে কেমন লাগল ?'

সুধীর শান্তভাবে বলে, 'কেমন লাগবার কী আছে ? এমনি দেখলাম।'

'বাঃ, একটু ভাল করে দেখে নেবে না ? এঁর আণ্ডারেই তো কাজ করতে হবে তোমাকে। অবশ্য যদি কর।'

সুধীর চমকে বলে, 'এঁর আণ্ডারে ?'

'আহা আইনে বলবে উনিই তোমার আণ্ডারে, কিন্তু দেখলে তো ? প্রকৃতপক্ষে আমিও ওঁর অধীনস্থ কর্মচারী !'

'কিন্তু কাজটা কি হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারছি না আমি।'

'সে কি হে ! এই যে বললাম। অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজ্‌নেস ! এটা হচ্ছে স্টোর—'

সুধীর দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'এদের সংগ্রহ করবার উপায় বোধহয় লুঠে আনা ?'

'লুঠে ? না না, লুঠপাট করার পাট আমাদের নেই, অন্য বহুবিধ উপায় আছে, সে সব টেণ্ডারাররা জানে। পরিত্যক্ত লুঠের মাল অবশ্য আসে অনেক সময়। কিন্তু তুমি আমার এই বিজ্‌নেসকে একেবারে ভয়ঙ্কর একটা নারকীয় পাতক মনে না করলেও পার। আর কি করবে বল এইসব মেয়েরা ? যারা অন্যের দ্বারা অপহৃত হয়ে, কিছুদিন পরে পরিত্যক্ত হয়েছে, যারা অর্থাভাবে ইচ্ছে করে পাপ পথে নামছে, যারা রাস্তার ফুটপাথে রেলস্টেশনে পড়ে পড়ে অধঃপাতের পথটা কোথায় তার অনুসন্ধান করছে, আর যারা—আর যারা অত্যাচারী স্বামীর আশ্রয়ে প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত হয়ে প্রতিদিন আত্মহত্যার সঙ্কল্প করছে !···উচ্ছন্নেই তো যেত এইসব মেয়ে ! বরং তা সত্ত্বেও কষ্ট পেত, অভাবে অনাহারে, রোগে, আর 'মানুষ' নামক পশুর লালসার আগুনে ঝলসে রাস্তায় পড়ে মরত। সে জায়গায় আমি

তাদের ভালমত ঘর বর জুটিয়ে দিচ্ছি। খারাপ করছি কিছু? একেও তুমি এক রকম পুনর্বাসন বলতে পার।'

সুধীর চাপা তীব্র স্বরে বলে, 'এই ইতিহাসই কি সত্যি? কারুরই সুখের সংসার থেকে ছিনিয়ে আনবার ইতিহাস নেই?'

বিশ্বাস সাহেব উদাস আর উদার হাসি হেসে বলেন, 'থাকতে হয়ত পারে। সেটা আমার ঠিক জানা নেই। সঠিক কথা ওই জোগানদাররাই বলতে পারে। অবিশ্যি যদি সত্যি কথা বলে। তবে কোন ব্যাটাই কখনো সত্যি কথা বলে না, এই যা।'

সুধীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য? কী আশ্চর্য?'

'ভাবছি জগতে এত চোরাগলিও আছে!'

সুধীরের কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন বিশ্বাস সাহেব। উচ্চগ্রামের সেই হাসি ফুরোতেই চায় না।

এ রকম হাসতে পারে ও? লোকটা কি বহুরূপী?

হাসি ফুবোবার আগেই কনকলতা ঘরে এসে ঢোকেন দু'হাতে দু'টি ছোট্ট শ্বেতপাথরের রেকাবি নিয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ে সচকিত হয়ে বলেন, 'কী হল? হঠাৎ এমন হাসির সাগরে জোয়ার এল যে?'

'আরে শোন শোন মজার কথা, এ ছোকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে, 'জগতে এতও চোরাগলি আছে!'

কনকলতা এক মিনিট চুপ করে থেকে হাতের রেকাবি দুটো টেবিলে নামাতে নামাতে বলেন, 'কোথা থেকে আনলে, ছেলেটাকে?'

'আমার গাড়ীর নতুন চালক।'

'ও!' কনকলতা বলেন, 'মনে হচ্ছে বারে বারে একই ভুল করছ। সেই রং নাম্বার!'

'দেখা যাক! ভুল করতে করতেই তো মানুষ একদিন ঠিক-এ পৌঁছয়। এক্সপেরিমেন্ট মানেই তখনো ভুলের স্টেজে।'

সমস্ত কথাই দুর্বোধ্য লাগে সুধীরের। চুপ হয়ে গিয়ে আবার নির্ণয় করতে চেষ্টা করে এঁদের মধ্যে সম্পর্কটা কি?

যেটা সবচেয়ে সোজা অঙ্ক, সেটা কষতে গেলেই তো গোলক ধাঁধাঁয় পথ গুলিয়ে যাচ্ছে। মহিলাটির এই বেশবাস কেন তা'হলে? তা'ছাড়া এই ঠাকুর দেবতা, শ্বেতপাথরের রেকাবি, ছানা চিনি পেঁপে কলার প্রসাদ! কী এসব?

চমক ভাঙে মহিলাটির সম্বোধনে, 'কই, খাও? অবিশ্যি আমার এ বিদুরের খুদ-কুঁড়ো মাত্র। তবু ঠাকুরের প্রসাদ বলেই ভদ্রলোকের সামনে বার করার সাহস।'

হঠাৎ সুধীর একটা অস্বাভাবিক এবং বোধকরি একটা অভদ্রই প্রশ্ন করে বসে। আর বেশ স্পষ্ট গলাতেই করে, 'কী ঠাকুর আপনার?'

কী ঠাকুর!

কী ঠাকুর!

দু'জনের মুখ থেকেই অস্ফুটে ওই প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়। তারপরই বিশ্বাস সাহেব আলগোছে মুখে একটা পেঁপের টুকরো ফেলে দিয়ে বলেন, 'তুমি তো বড় সর্বনেশে ছেলে, হে? আমি যে এতদিন দেখছি, কই কখনো তো জিগ্যেস করিনি, কী ঠাকুর!···সত্যিই তো কনক,—উত্তরটা কী?'

কনকলতা এবার মৃদুহাস্যে বলেন, 'ভয় নেই, নেহাতই নিরীহ দেবতা। বালগোপাল। উনি বৈষ্ণব হলেও ক্ষতি নেই, খেতে পারেন।'

সুধীর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, 'একটু হাত ধুতাম!'

হাত ধুতাম!

কনকলতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ইস! কী মুস্কিল, জল দিইনি! বুড়ো হচ্ছি তার প্রমাণ।···ওরে উর্মিলা, জল দিয়ে যা তো—দু'গেলাস।'

আবার মেয়ে! সুধীর একটু আত্মস্থ হয়ে বসে।

কিন্তু উর্মিলা এলে দেখে, ভয় করার মত কিছু নেই। নামটির যত বাহার, মানুষটির তত বাহার নেই। নেহাৎই গ্রামের চাষাভূষো ঘরের মেয়ের মত। ঘরোয়াভাবে আঁট-সাঁট করে শাড়ী পরা, মাথায় বড় একটা তালের মত ভিজে এলো চুলের খোঁপা, মুখ মাঝারি, রং শ্যামলা, গড়নটি সুপুষ্ট। জল রেখে নিঃশব্দে চলে গেল, তাকিয়েও দেখল না ঘরে কারা আছে।

'একে কিন্তু আমরা কোনখান থেকে হরণ করেও আনিনি, ভুলিয়ে বার করেও আনিনি,' বিশ্বাস সাহেব মৃদু হেসে বলেন, 'ও নিজে, যাকে বলে, কাকুতি মিনতি করে এঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তাই না কনক?'

কনকলতা মৃদুহাস্যে বলেন, 'হ্যাঁ। ট্রেনে আসছি নবদ্বীপ থেকে, হঠাৎ কোন একটা স্টেশন থেকে 'পড়ি তো মরি' করে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠল। হালচাল দেখে মনে হল না টিকিট কিনেছে, তাই বললাম, এটা বাপু ডবল ভাড়ার গাড়ী, সে টিকিট আছে তো?… ও স্বচ্ছন্দে বলল, টিকিট আমি কোথায় পাব? টিকিট কেনবার পয়সা আছে আমার? তা' আমি একটু ভয় দেখালাম, বললাম, চেকার এসে নামিয়ে দেবে।…অম্লান বদনে বললে, নামিয়ে দিলে আমার আর দুর্গতির পরিসীমে থাকবে না মা, ভাড়াটা তুমি মিটিয়ে দিও।

'…শোন তাজ্জব কথা! আমি তো অবিশ্যিই বলব, তোমার ভাড়া আমি খামোকা মেটাতে যাব কেন? তার উত্তরে বলল, কতদিকে কত পয়সা যায় মা তোমার, আমার একটা মস্ত উপকার হবে ভেবে না হয় গোটাকতক টাকা খরচা করলেই! 'দয়া কর'-টরর নাম নেই, 'আপনি আজ্ঞে'র বালাই নেই, যেন জোর জুলুম! ভারী মজা লাগল, ভাড়াটা দিয়েই দিলাম চেকার আসতে। বললাম; তাড়াতাড়িতে টিকিট কাটা হয়নি।…সঙ্গে খাবার ছিল, দিলাম, খেয়ে যেন বাঁচল। তারপর স্টেশনে নেমে যখন বললাম, যাবি কোথায়?

তেমনি অম্লান মুখে বললে, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।...শোন আবদার! যত বলি, আমি খামোকা তোকে নিয়ে যাব কেন? তুই যেখানে যাবি বলে বেরিয়েছিস, সেখানে যাবি তো? ও বলে, কোথাও যাব বলে বেরোইনি মা, যেদিকে দু'চক্ষু যায় বলে বেরিয়ে পড়েছি।...

'ব্যস্, তদবধি আমার স্কন্ধে। আমি মরতে বললে মরতে পারে। চাকরাণীর মত খাটতে চায়। কিন্তু কিছুতেই ওর মুখ থেকে পূর্বকথা বার করতে পারিনি। শুধু বলে, এখানে এসে বেঁচেছি মা!'

ঘটনাটা চুপচাপ শুনে সুধীর সহসা বিশ্বাস সাহেবের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ স্বরে বলে ওঠে, 'তা' ক'দিন আর বাঁচবে? ওরও নিশ্চয়ই [illegible] পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে?' পুনর্বাসন শব্দটার ওপর জোর দেয়।

বিশ্বাস সাহেব অলস ভঙ্গী ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এই একটা তোমার দোষ সুধীর, কিছুতেই মনে রাখতে পার না, তুমি আমার গাড়ীর ড্রাইভার।'

কনকলতার সামনে এই ড্রাইভার কথাটা খুব একটা ভাল লাগে না সুধীরের। তাই সেও দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীরভাবে বলে, 'ভবিষ্যতে মনে রাখতে চেষ্টা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে কনকলতা হেসে উঠে বলেন, 'শোন কেন তোমাদের সাহেবের কথা? যার যা পোজিশান, সে তা' ভুলে বসে থাকলেই উনি খুশি।'

'কী সর্বনাশ! বলেছি তোমায় এ কথা?'

যেন শিউরে ওঠেন বিশ্বাস সাহেব। কনকলতা ভয় খান না, নিশ্চিন্ত স্বরে বলেন, 'বলতে হয় না।'

'আরে আরে, মহিলাটি তো বড় ডেঞ্জারাস! চল হে! আরো থাকলে উনি আরো কত কী বলে বসবেন।'

বেরিয়ে এসে একেবারে গাড়ীতে চড়ে বসেন বিশ্বাস সাহেব। এবং ষ্টিয়ারিং ধরেন।

একটু চলে এসেই বিশ্বাস সাহেব অলসভাবে বলেন, 'কী মনে হচ্ছে? পারবে?'

'আমার কাজটা কি, তা' কিন্তু এখনও বলেননি আমাকে। অবশ্য কারখানাটা কি তা বলেছেন—'

বিশ্বাস সাহেব বলেন, 'কাজ? এই আমার যা কাজ তাই আর কি! রোজ একবার করে এসে দেখে যাওয়া, এরা সব আছে কেমন। হঠাৎ কারো কোন অসুখ করল কিনা, হঠাৎ কেউ ক্ষেপে গিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে কিনা, হঠাৎ কোন টিকটিকি পুলিসের পদধূলি পড়েছে কিনা, এই সব আর কি। অন্য কাজ, মানে আর কি, লেনদেনের বা দরদামের ব্যাপারে এক্ষুনি তোমাকে আমি জড়াতে চাইছি না, ক্যাপাসিটিটা দেখি আগে।'

সুধীর চুপ করে থাকে।

বসন্ত আর একটু থেমে বলেন, 'কনকের কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

সুধীর ঠোঁটটা একবার কামড়ায়, সুধীর ভেবে পায় না, কখন তিনি এই পছন্দ হওয়াটি ব্যক্ত করলেন। আর এও ভেবে পেল না, ওই থান পরা চুলকাটা মধ্যবয়সী হিন্দু বিধবাটির প্রতি এমন বিরক্তি আসছে কেন সুধীরের! খুব একটা বিরক্তিকর আচরণও যে করেছেন তা' তো বলা যায় না। এও দেখেছে, প্রসাদের রেকাবি নামাবার সময় অলক্ষ্যে একবার মাথায় ঠেকালেন।

তবে?

এই তবের উত্তর অবশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। অনেক সময় অকারণেই কারো প্রতি বিরক্তি আসে, বিতৃষ্ণা আসে, আর সেটা প্রথম দর্শনেই আসে। আবার আকর্ষণও যে আসে, সেও প্রায়শঃই প্রথম দর্শন থেকে।

এ সবই প্রকৃতির নিগূঢ় লীলা!

শেষ মোড়টা পার হতেই সুধীর বলে ওঠে, 'গাড়ী তো আপনিই

নিয়ে যাচ্ছেন, আমি তো বসেই আছি। আমায় এখানে একটু ছেড়ে দেবেন ?'

'এখানে ! এখানে কেউ আছে নাকি ?' বসন্ত বলেন।

সুধীর নম্র গলায় বলে, 'আজ্ঞে না, এমনি।'

'এমনি ? এমনি হঠাৎ বাড়ীর থেকে দশ মাইল দূরে নেমে পড়বে ? কেন বল তো ? 'জানে'র বাড়ী যাবে না কি ?' হেসে ওঠেন বিশ্বাস সাহেব।

সুধীর চমকে তাকায়। লোকটা গণৎকার না কি ? ঠিক ওই কারণেই তো এখানে নেমে পড়তে চাইছে সুধীর।...

আসলে যে লোকটা কী, বোঝা কঠিন। শয়তান, না [illegible] অর্থপিশাচ, না দার্শনিক ? উপকারী, না অনিষ্টকারী ?

গাড়ীটা থেমে পড়ে।

বিশ্বাস সাহেব বলে ওঠেন, 'নামো, নেমে পড়। যাও, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব গোণাওগে।'

সুধীর নেমে পড়ে ঈষৎ হেসে বলে, 'আপনি কি করে বুঝলেন ?'

'কি করে বুঝলাম ?' বিশ্বাস সাহেব বলেন, 'বোঝা একদম জলের মত সোজা। অন্ততঃ আমার পক্ষে। আমিও গিয়েছিলাম যে একদা।...অনেক টাকা খেয়েছে আমার।'

গাড়ীটা তখনো ছেড়ে দেয়নি।

সুধীর একটু থেমে বলে, 'তা'হলে বলছেন বুজরুক ?'

'ক্ষেপেছ ? তাই কখনো বলতে পারি ? কথাতেই তো রয়েছে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' সবকিছু নিজে যাচাই করে দেখতে হয়।...তা'হলে কখন আসছ ?'

'চারটে—চারটের সময়।'

'ঠিক আছে। বৈকালিক টিফিনটা আর বাড়ী থেকে সেরে এস না, বুঝলে ? মিসেস বিশ্বাস অনুরোধ জানিয়ে রেখেছেন। কী বুঝি নতুন রান্না শিখেছেন কোন্ মহিলা পত্রিকা থেকে।'

গাড়ীটা গর্জে ওঠে।

চোখ ছাড়া হয়ে যান আলতার কারখানার বসন্ত বিশ্বাস। আর ঠোঁট কামড়ায় তাঁর ড্রাইভার সুধীর সেন। আবার সেই প্যাঁচ!

যাক, চুলোয় যাক বিতৃষ্ণা। নেমেই দেখা যাক পুকুরে। দেখা যাক জল আছে কি পাঁক আছে।

হন হন করে 'জানের বাড়ী'র দিকে এগোয় সুধীর।

॥ ১৫ ॥

তিন গলি ঘুরে সাইন বোর্ড আঁটা বাড়ীটা দেখতে পেল সুধীর। খুপরি খুপরি জানলা দরজা দেওয়া তিনদিক চাপা একখানা ঘর, এই ভরদুপুরেও ঘরের মধ্যে অন্ধকার ছায়া।

দরজার সামনেটুকুই আলো, সেই আলোটুকুকে কাজে লাগাতেই বোধকরি দরজার সামনেই চৌকীটা পাতা হয়েছে। চৌকীর উপর একখানি মাদুর বিছান, শুঁটকো চেহারার লোকটা তার উপরই বসেছিল কোলের উপর একখানা খেরো বাঁধান পঞ্জিকা নিয়ে। আশেপাশে তেমনি বাঁধান পঞ্জিকার স্তূপ! লাল খেরোর উপর কালো কালিতে মোটা মোটা অক্ষরে সন···শকাব্দ লেখা।

ঘরে ঢুকেই সুধীরের প্রথম একটা অবান্তর কথা মনে পড়ল। ওই চৌকীটা আর মাদুরখানাও কি তিনশ' বছরের? দুটো জিনিসই তো দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র তেলের প্রলেপে দেড়াপুরু হয়ে গেছে। অথচ এ তেল ইচ্ছাকৃত প্রলেপে নিশ্চয়ই নয়? অবিরত ব্যবহারে ব্যবহারেই।

'কি চাই, আপনার?'

খোনা খোনা গলার এই আচমকা প্রশ্নে সুধীর প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'বলছি। একটু বসতে হবে।'

'বসুন। বসুন না!'

'জান' তাঁর পঞ্জিকাগুলি ঠেলে কিঞ্চিৎ ঠাঁই করে দিলেন। অর্থাৎ ওই চৌকীটিই তাঁর চেয়ার-চৌকী-ফরাস-সোফা সব।

মাতুরটার দিকে তাকিয়ে বসতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, তবু সঙ্কুচিত হয়ে বসেই পড়তে হল। 'জান' সেই খোনা দরাজ গলায় বললেন 'না-ম!'

সুধীর নাম বলল।

'জান' খদ্দেরকে কিছুক্ষণ অবলোকন করে নিয়ে থেমে থেমে, রেখে রেখে বললেন, 'নারীঘটিত ব্যাপারে একটু জড়িয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে!'

নারীঘটিত!

সুধীর দাঁড়িয়ে পড়ে তপ্ত কণ্ঠে বলে, 'তার মানে?'

'জান' দমেন না। তপ্তও হন না। একই 'টোনে' বলেন, 'উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন না। নারীঘটিত মানেই যে আপনি মেয়েছেলে চুরি করে আনছেন, কিম্বা চরিত্রহীন হয়ে যাচ্ছেন তা তো নয়? ঘটনা অনেক রকম হয়। ধরুন, কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা আপনি বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন, অথবা কোন স্ত্রীলোকের সহায়তায় লাভবান হচ্ছেন, একেও আমরা স্ত্রীলোকঘটিত বলে থাকি। সম্প্রতি আপনি এই ধরনের কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন···উঁহু, অস্বীকার করলে তো চলবে না, আমাদের কাছে পাকা খবর চলে আসবে। তিনশ' বছরের ব্যাপার!···'

সুধীর শিথিল স্বরে বলে, 'আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে—এখন যে কাজ করছি আমি, তাতে আমার উন্নতির আশা আছে?'

'আছে!' 'জান' সুদৃঢ় স্বরে বলেন, 'বিশেষ আশা আছে। বড় রকমের একটা পরিবর্তন আপনার আসছে।···আর তার মধ্যে স্ত্রীলোকের হাত আছে।'

বার বার 'স্ত্রীলোক' শব্দের আঘাতে বিপন্ন কম্পিত সুধীর বলে ওঠে, 'কী ধরনের হাত তাই বলুন না ?'

'আহা সেটা বলতে হলে একটু বিশেষ গণনার আবশ্যক। শনি, মঙ্গলবারে বিশেষ গণনা হয় না।'

'হয় না ?'

'না। কাল আসবেন।'

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে সুধীরের। কিন্তু কার উপর ? ওই 'জানে'র উপর, না বিশ্বাস সাহেবের উপর, নাকি নিজেরই উপর ?···ঠিক অনুধাবন করতে পারে না সুধীর। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আচ্ছা, নমস্কার ! পারি তো কাল আসব।'

'জান' আহত স্বরে বলেন, 'চলে যাচ্ছেন কেন ? এত তাড়া কিসের ? আপনাদের ছেলেছোকরাদের এই বড় দোষ ! এদিকে সব কুসংস্কারের ডিপো, অথচ মুখে একেবারে ঘোড়ায় জিন দেওয়া সেপাই !···বলছি 'বিশেষ' গণনা না হলেও, আপনি যা জানতে চান বলুন। তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাবেন।'

কিন্তু সুধীরের এখন উগ্র আগ্রহ, সেকি তিনটি উত্তর শুনেই ছাড়বে ?

সে কি জানতে চাইবে না, পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর্ম, ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কেবল অর্থ উপার্জনের চেষ্টাই তার বিধিলিপি কি না ?

যে লোক তাকে প্রলোভিত করছে, সে তার শুভানুধ্যায়ী না অনিষ্টকারী ?···স্ত্রীলোকের দ্বারা তার বিপদ আসছে না সৌভাগ্য আসছে ? সম্প্রতি দু'টি স্ত্রীলোককে সে দেখেছে, তাদের মধ্যে কোনজন তার ভাগ্যের শনি অথবা বৃহস্পতি ?

'জান' কিছুক্ষণ চক্ষু মুদে থেকে সাবধানে বলেন, 'একজনকে তো দেখছি বিধবা বর্ষিয়সী, ছাঁটা চুল, দোহারা চেহারা—'

সুধীর স্প্রীঙের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'এসব আপনি দেখতে পাচ্ছেন ?'

সেই শীর্ণ শীর্ণ মুখে বিজয় গৌরবের হাসি হেসে 'জান' বলেন, 'না পারলে চলবে কেন? আপনারা কি অকারণ আমার বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন?'

সুধীরের মুখ চোখ উত্তেজনায় লাল দেখায়। সে তীব্র স্বরে বলে, 'বেশ, দেখতে পাচ্ছেন তো বলুন, ওঁর দ্বারা আমার কি হবার আছে?'

'জান' সিদ্ধপুরুষের ভঙ্গীতে দু'টি আঙুল শূন্যে ঠুকে ঠুকে বিড় বিড় করে কি সব বলে প্রসন্ন হাস্যে বলেন, 'ভাল হবে। উনি আপনার শুভস্থানে অবস্থান করছেন। তবে সাবধান, ওঁকে কুপিত করবেন না। কুপিত করলে বিপদ আছে! ওঁর সন্তোষ বিধান করে চললে, আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ মসৃণ হবে!'

সুধীর চমকে ওঠে। পথ মসৃণ! অনাদি এই রকম কি একটা বলেছিল না? তাহলে তার নিজের কোন দোষ নেই, ভাগ্য যে পথে নিয়ে যাবে, তাই সে পথে যেতে বাধ্য হবে সে।

একটু ইতস্তত করে সুধীর বলে, 'আচ্ছা, আরো একজন মহিলার কথা বলছিলেন না?'

'জান' একটু সূক্ষ্ম হাসি হেসে বলে, 'বলছিলাম! বলছি, সুন্দরী, অলঙ্কার বিভূষিতা, দিব্য বস্ত্র পরিহিতা, কেমন কিনা? মিলছে?'

সুধীর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, 'মিলছে।'

আশ্চর্য! লোকটা তাহলে দেখতে পাচ্ছে? এ কী করে সম্ভব? এই বিশ্রী অমার্জিত চেহারার লোকটার মধ্যে এতবড় একটা বিদ্যে লুকান আছে? বিশ্বাস সাহেব তবে ব্যঙ্গ করছিলেন কেন?

আরো অনেকক্ষণ কথা চালানর পর সুধীর যখন ওঠে, তখন মুগ্ধ, বিচলিত, বিহ্বল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর কোন দ্বিধা নেই তার।

'জান' সহাস্যে বলেন, 'দেখবেন, সত্যি হয় কিনা! আজ আপনি পাঁচটি টাকা দিয়ে যাচ্ছেন আমায়, দেখবেন ছ'মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবার ক্ষমতা হবে আপনার!'

ছ'মাসের মধ্যে পাঁচ হাজার! সুধীর কাঁপা গলায় বলে, 'তাহলে বলছেন এ চাকরী ছাড়ব না?'

'না না! এই থেকেই আপনার লক্ষ্মী আসবে।'

সুধীর যখন সুযোগ পেয়েছে, আরো এগোবে না কেন? তাই প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, দেখুন তো আমার নিজের গাড়ী হবে কিনা!... মানে পরের গাড়ী চালিয়েই জীবন কাটবে কিনা!'

'গাড়ী!' 'জান' তাচ্ছিল্য সহকারে বলে ওঠেন, 'শুধু গাড়ী? বাড়ী গাড়ী, ঐশ্বর্য, সবই হবে। শুধু ওই যা। সাবধান হয়ে চলতে হবে। ওঁদের অপ্রীতিভাজন হবেন না। ওই স্ত্রীলোক দু'টির।'

'আচ্ছা, আমার মনিব লোকটাকে কি রকম বলে মনে হয়?'

সুধীর যেন স্বয়ং ভগবানের কাছে এসে বসেছে। ..তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী মানেই বেদবাণী!

'জান' ভুরু কুঁচকে বলেন, 'ব্যাপারটা কি জানেন? লোকটা খারাপ বললে খারাপ, ভাল বললে ভাল। মেজাজে থাকলে আপনাকে রাজা করে দিতে পারে। মেজাজে না থাকলে সর্বনাশ করে ছাড়তে পারে। অনেকটা নীলার আংটির মত আর কি!'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে থাকে লোকটা।

সুধীরকে কি লোকটা আঠা দিয়ে আটকে রেখেছে? ওই মাদুরটা কি যাদু-মাদুর? বসলে আর উঠতে পারা যায় না? তাই সে আবারও প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা ধরুন, আমার অনেক টাকা হল। তখন সে টাকা নিয়ে আমি কি করব?'

'টাকা নিয়ে কি করবেন? হাসালেন মশাই, এ প্রশ্ন তো কেউ করে না! বেশ তো আমাদের মত গরীব ব্রাহ্মণদের দান করে দেবেন—'

সুধীর অসহিষ্ণু হয়।

'আঃ বুঝতে পারছেন না? বলছি, এইতো বললেন মানুষ নিয়তির দাস। তা নিয়তি আমায় দিয়ে কি করাবে? আমায়

ওই মনিবের মত কুটিল পথে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে, না সৎপথে, ভদ্রপথে—'

'জানে'রা সহজে বিব্রত হয় না। তবু সুধীরের এই প্রশ্নে বোধকরি তিনশ' বছরের ঐতিহ্যের বাহক ওই গরীব ব্রাহ্মণ-সন্তান কিঞ্চিৎ বিব্রত হন। তবে প্রকাশ পায় না। সেই খোনা গলায় আশ্বাস দেন, 'আহা সে তো আপনার নিজের হাতে। দান ধ্যান করবেন, ধর্মকাজ করবেন, দোল দুর্গোৎসব করবেন —'

সুধীর অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'করব মানে কি? আমার নিজের হাতেই বা কি? সবই তো বলছেন নিয়তি—'

'এই দেখুন, আপনি চটে উঠছেন! পুরুষকার বলেও তো একটা কথা আছে?'

সুধীর আত্মস্থ হয়। গম্ভীরভাবে বলে, 'তা' কি করে থাকবে? দুটো কথা কখনো থাকতে পারে না! হয় নিয়তি, নয় পুরুষকার—'

'জান' এবার চড়ে ওঠেন। খ্যাঁকখেঁকিয়ে বলেন, 'থাকবে না! আপনি বললেই অমনি থাকবে না? কত রাজা মহারাজা আসছে এখানে, কত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকিল ব্যারিষ্টার, আপনাদের গে' তা' বড় তা' বড় সিনেমা ষ্টার! কেউ বলছে না—দুটো থাকতে পারে না, আর আপনি বলছেন থাকতে পারে না!...আসল কথা, আপনার এখন মতি খুব অস্থির রয়েছে, এরপর মাথা ঠাণ্ডা হলে ইচ্ছে হয় আসবেন!'

'ঠিক আছে' বলে বেরিয়ে যায় সুধীর, কি ভেবে আর দুটো টাকা রেখে দ্বিতীয়বার নমস্কার করে যায়।

সাত সাতটা টাকা বেরিয়ে গেল।

বিশ্বাস সাহেব ঠিক বলেছেন, সব বোগাস! তখন যেন কেমন মন্ত্র পড়ে অভিভূত করে ফেলেছিল আমায়! এতক্ষণ ধরে কি-ই বা বলল? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা পঞ্চাশবার!...কই, কি যে বলল, এখন তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না!...

কিন্তু ওই—চেহারার বর্ণনা? ওটা কি করে সম্ভব?

দীর্ঘ সময় বাসে যেতে হবে।···ভাবতে ভাবতে যায়···নির্ঘাৎ কিছু থট্-রীডিং শিখে রেখেছে, আর কিছু না। সব বাজে! সব বোগাস! সাত সাতটা টাকা গেল! সুধীর নাকি এমন বড়লোক হবে, পাঁচ হাজার টাকা হেলায় খরচ করতে পারবে! গাঁজাখুরির জায়গা পায়নি!

মা'র মনটা দু'দিন থেকেই ভার ভার।

কথা বন্ধ বললেই হয়। ভাতের থালা নামিয়ে দিয়ে সেই যে ঝপ্ করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন, আর বেরোন না। খেতে বসতে প্রবৃত্তি হয় না।···

উপকরণের দৈন্য মুছে যায় সেবায়, যত্নে, স্নেহে। সুধীর সবদিকেই রিক্ত।···কী বলছিল লোকটা? ছ'মাস? ছ'মাসের মধ্যে—

ভাতটা খানিক ভেঙে তার উপর ডাল ঢেলে মাখতে মাখতে সুধীর হঠাৎ বলে ফেলে, 'খেতে টেতে আর ইচ্ছে করে না।'

তথাপি ম'র কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সুধীরের কি নেশা চাপে? তাই আবার বলে ওঠে, 'মানুষের খেতে বসে কিছু লাগতেও পারে।'

এবার মা বেরিয়ে আসেন। একটা ছোট কাঁসার রেকাবে দু'টি ভাত রেখে পাতের অদূরে নামিয়ে দেন। অর্থাৎ যদি নেবে তো টেনে নাও, না নেবে তো পাতে ঠেকিয়ে নষ্ট কোরো না।

রেকাবটা নামিয়ে দিয়ে মা দেয়ালকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আর কিছু লাগলেও তো দেবার নেই, ভাত লাগে তো রইল!'

হঠাৎ কানের গোড়ায় যেন বেজে উঠল ভারী গলার একটা কথা, 'তাহলে বৈকালিক টিফিনটা আর বাড়ী থেকে সেরে এস না, মিসেস·বিশ্বাস কি যেন নতুন রান্না শিখেছেন—'

বৈকালিক টিফিন! বেলা চারটের মধ্যে!

দুটোয় ভাত খেয়ে যারা আবার চারটের মধ্যে টিফিন খায়, বসন্ত বিশ্বাস সুধীরকে তাদের দলে ফেললেন কেন? ভুলে? না শুধু বলার জন্যই? যাতে নিশ্চিন্ত সুধীর—

সুধীর কেন ওই অনুরোধ ওই আগ্রহ ঠেলে ফেলে দেবে? পৃথিবীতে এসে কি এত পেয়েছে সুধীর যে, এত অনায়াসে এতবড় পাওয়াটাকে অবহেলা করবে? বসন্ত বিশ্বাসের মত লোক যদি তার গাড়ীর ড্রাইভারকে এতখানি মূল্য দিচ্ছে, সেই ড্রাইভার সেই বস্তুকে ফেলে দেবে কোন্ নির্বুদ্ধিতায়? যাবে সে।

দেখবে কী হয় তারপর।

॥ ১৬ ॥

মিসেস বিশ্বাস বিশেষ একটি ভঙ্গিমার হাসি হেসে বলেন, 'যাক, তবু ভাল! আমি তো ভাবলাম আসবেই না। বস।'

মিসেস বিশ্বাস কি তাঁর কোন 'তুতো ঠাকুরপোর' সঙ্গে কথা বলছেন? সুধীর ভয়ে কাঠ হয়ে শুধু তার নিজস্ব ভূমিকা অভিনয় করে যাবে?

সহসা নিজেকে আত্মস্থ করে নেয় সুধীর—আমি তো আমার গণ্ডি ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠতে যাইনি। তুমি যদি তোমার গদি ত্যাগ করে নীচে নেমে আস, আমার কী দোষ?

ভৃত্যের ভূমিকা থাক্ এখন। ভদ্র যুবকের ভূমিকা নিক সে।

অতএব মৃদু হাস্যের সঙ্গে উত্তর দিতে বাধে না, 'বাঃ আসব না ভাবলেন কেন বলুন তো? শুনলাম কি সব নতুন নতুন রান্না শিখেছেন মহিলা পত্রিকা দেখে—'

মিসেস বিশ্বাস হেসে ওঠেন।

'ওমা! কী কাণ্ড! বিশ্বাস সাহেব বুঝি ঘরের কথা ফাঁস করে

দিয়েছেন ? দেখ তো অন্যায়, লোকসমাজে বলে বেড়ান কি ভাল, আমি কিছু রান্না জানি না, আমি শিক্ষানবীশ ?'

'মন্দই বা কি ? আপনার তো এতসব করবার কথা নয় ? সাহেব-বাড়ীতে মেমসাহেবরা অপটুই হয়ে থাকেন !'

মিসেস বিশ্বাস হঠাৎ সাজে ঝলমল মুখের উপরের আঁকা ভুরু জোড়া উঁচুতে তুলে বলে ওঠেন, 'তুমি এত সাহেবের মেম দেখলে কোথায় শুনি ?'

'কোথায় আর !' সুধীর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'সাহেবদের গাড়ী চালিয়ে ! আপনার মত তো সবাই না ? মেমসাহেবরা তো সাহেবদের সঙ্গে ছায়া হয়ে ঘোরেন ! এবং মনে রাখেন না ড্রাইভারেরও কান থাকে !'

মিসেস বিশ্বাস কাঁচভাঙা সুরে হেসে ওঠেন।...'বল কি ? তা' তোমাদের তো মজা মন্দ নয় ?'

সুধীর হাসে। 'সাজা' কথাটা শুনতে খারাপ, মজা বলাই ভাল...তবে এখানে এসে পর্যন্ত সে অভিজ্ঞতা আর হয়নি। আপনি তো—'

একটু থেমে পড়ে। ভদ্র যুবকের সীমারেখা কতদূর অবধি ভাবতে চেষ্টা করে। মিসেস বিশ্বাস এই ভাবনার অবসরে হঠাৎ দূরের আসন থেকে কাছের আসনে সরে আসেন, বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'না, আমি তোমাদের সাহেবের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরি না। সাহেবের সময় কোথা বল ? তাছাড়া—'এবার একটু যেন হাসেন মহিলা, ক্ষুব্ধ হাসি। হেসে বলেন, 'তাছাড়া চুপি চুপি বলি, তোমাদের ওই বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে আমায় মানায় ?'

সুধীরের ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, মানাবে না কেন ? দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও তো থাকে লোকের ! বলল না। মহিলাটির এই ঘনিষ্ঠতা কিছুতেই সহজে নেওয়া যাচ্ছে না।

চুপ করে রইল।

মিসেস বিশ্বাস হঠাৎ ঝেঁজে উঠলেন, 'তোমাদের সব সময় এত ভয় কেন বল তো ? আরো অনেককে দেখলাম, তোমাকেও দেখছি, ভয়েই কাঁটা ! চাকর ছাড়া নিজেকে আর কিছু ভাবতে পার না ? স্রেফ গাড়ী ধোওয়া চাকর ! হ্যাঁ, অনাদির সঙ্গে নিজের কোন তফাত অনুভব করতে পার না মনে হয়। কেন ? বিশ্বাস সাহেবের গাড়ীর ড্রাইভার ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই তোমার ? তুমি মানুষ নও ? একটা ভদ্রঘরের ছেলে নও ? শুনেছিলাম তো গ্র্যাজুয়েট নাকি, দেখে কে বিশ্বাস করবে ?'

সুধীর আর অবাক হয় না।

সুধীর এই প্রায় হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাটিকে আর মনিব-গিন্নী বলে সমীহ করবেই না প্রতিজ্ঞা ক'রে গম্ভীর গলায় বলে, 'যেখানে যা পরিচয়, সেখানে তো সেইভাবে থাকাই ভাল। আমি যে ভদ্রঘরের ছেলে, এটা বিশ্বাস করতে বেশী কথার দরকারই বা কি ? আজ মরজি হয়েছে, অনুগ্রহ দেখাতে ডেকে এনেছেন, হয়ত হঠাৎ কখন সে মরজি চলে যাবে, তখন বলে উঠবেন, চাকর চাকরের মত থাকেনি।'

'আমি এই কথা বলব ?' মিসেস বিশ্বাস একটা বিচিত্র হাসি হেসে বলেন, 'আমি কে ? আমিই বা কোন্ রাজকন্যা ? আমিও তো তোমাদের বিশ্বাস সাহেবের অনুগ্রহের ওপর আছি ! এই যে খাচ্ছি, পরছি, সাজছি, গয়নার ওপর গয়না গড়াচ্ছি, সব ওই অনুগ্রহের ফসল। তুমিও যা'—আমিও তা', তুমি সাহেবের গাড়ী চালাও, আমি সাহেবের বাড়ী চালাই—'

নাঃ, এখন আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। মদের প্রভাব ! তার প্রতিক্রিয়াতেই—না, মাতাল হ'লেন না বিশ্বাস গিন্নী, শুধু একটু বেশী কথা বলবেন !

সুধীরের বোন যদি এ খবর শোনে, তা'হলে—গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে, সুধীরের মমতাবর্জিত-হৃদয় মুখরা মা হয়ত নিশ্বাস নিতে ভুলে যাবে, তবে সুধীর অত বিচলিত হবে না। সুধীর জগতের

অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। তাই সুধীর প্রসঙ্গ পরিবর্তনে মন দেয়। সেটাই ওষুধ।

বলে ওঠে, 'বাঃ, নতুন নতুন রান্নার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসে খালি কথা বলবেন বুঝি? দারুণ খিদে পেয়েছে। বার করুন আপনার কি আছে?'

'ইস! সত্যি!' শ্রীমতী শরীরে একটা মোচড় দিয়ে উঠে পড়ে বলেন, 'মানুষের যে খিদে পায় এ কথা ভুলেই গেছি কিনা!'

এ ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরে দালানে চলে যান শ্রীমতী বিশ্বাস। সেই সরান পর্দার ভিতর থেকে দেখতে পাওয়া যায়—শ্রীমতী 'ফ্রিজিডেয়ার' খুললেন, কত কি যেন বার করে করে ওদিকে টেবিলে সাজাতে লাগলেন। টেবিলটা চোখের আড়ালে, শুধু বাসন নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

মনের অগোচর পাপ নেই।

হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে স্বীকার করল সুধীর, ভাল ভাল কিছু খাওয়া যাবে ভেবে বেশ যেন খুশিই লাগছে তার।

ছি ছি, সে কি শিশু?

মনকে ধিক্কার দিয়ে শক্ত করে নিল সুধীর। আর ভাবতে লাগল, ঈশ্বর জানেন কী জুটবে! হয়ত মাছ মাংস ডিম ছানা দুধ ক্ষীর সবকিছু দিয়ে কতটা অখাদ্য বস্তু প্রস্তুত করা যায়, তারই নমুনা দেখতে হবে।

'এস!' একটি মধুর ভঙ্গী নিয়ে ডাক দিলেন শ্রীমতী বিশ্বাস। বললেন, 'বস!'

বস!

সুধীর বসবে, না ছুটে পালাবে?

নইলে তো ওই গদি আঁটা বিশেষ কায়দার চেয়ার, ঐ ঝকঝকে চকচকে কাঁটা চামচ প্লেটে সাজান টেবিল, আর ওই দু'প্রস্থে ভাগ করা খাদ্যসম্ভার, এর সামনে এসে বসতে হবে!

ছু'জনের মানেই নির্ঘাৎ ওঁর নিজেরও। সন্দেহ নেই কিছু সুধীরকে কোন একটা বিশেষ বিপদেই ফেলতে চায় এরা!…বেশ বোঝা যাচ্ছে তাছাড়া আর কিছু নয়।

খেতে বসলে হঠাৎ কি রঙ্গমঞ্চে বিশ্বাস সাহেবের আবির্ভাব ঘটবে? তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সমান সমান ব্যবহার করছি, এই অপরাধে রিভলবার বার করবেন? হয়ত—

দূর!

সহসাই আর একটা কথা ভেবে মনে মনে হেসে ওঠে সুধীর।

এত ভেবে মরছি কেন? এখন তো আমার লাক্ ফিরছে। ছ'মাস পরে আমি ছু'হাতে টাকা ছড়াব, এ তারই সূচনা।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে। গদি দেওয়া সেই দামী চেয়ারটা। বসে বলে, 'দেখি, কি কি রেঁধেছেন আপনি।'

সাজান প্লেট ঈষৎ এগিয়ে দিয়ে মিসেস বিশ্বাস হঠাৎ খান খান হয়ে হাসতে থাকেন। অপ্রকৃতিস্থ ধরনের হাসি।

'কেমন ঠকিয়েছি? ভেবেছিলেন তো সাহেবের বাড়ীতে নেমন্তন্ন যাচ্ছি, মেমসাহেবের রান্না, নিশ্চয় চপ কাটলেট ফ্রাই পেষ্ট্রি স্যাণ্ডুইচ্ পুডিং, কেমন? নিন, এখন বসে বসে গাঁইয়া খাওয়া খান। পায়েস, সরুচাকলি, গোকুলপিঠে, তালের বড়া। সাহেবকেও ঠকিয়েছি, বলেছি বই দেখে শিখছি। যেন এসব কখনো চোখে দেখিনি। বই দেখব কেন বলত? ঠাকুমাকে করতে দেখিনি? মাকে? বিধবা পিসিকে? আমাকে অবিশ্যি ছুঁতে দিত না। নিজেরা তসর কাপড় পরে রান্নাঘরের কাজ করত কিনা!…হলে কি হবে? একলব্যের মত দূরে থেকেই—'

হাসির ধমকে চোখে প্রায় জল এসে যায় মিসেস বিশ্বাসের।…

কষ্টে নিজেকে সামলে চেয়ারে বসে পড়ে বলেন, 'তোমাদের বিশ্বাস সাহেব আমাকে জেলেনীর আঁশচুপড়ির গল্প শোনান।

বুঝলে ? আমি বলি বেশ, তুমি আমার ডিপার্টমেণ্টে এস না।··· কিন্তু একা কি করে খাই বলত ? একা কি খাওয়া যায় ? ঝি চাকরদের সঙ্গে বসে কি খাব আমি ? এক টেবিলে ?'

॥ ১৭ ॥

রাত্রে কিছুতেই যেন ঘুম আসছিল না, ঈষৎ তন্দ্রার পাতলা আবরণ বারে বারে ভেঙে যাচ্ছিল উত্তপ্ত স্নায়ুর চাঞ্চল্যে। গল্পটা কি কাল সকালে অমিতাকে বলবে সুধীর ? বলে একটু হালকা হবে ? কিন্তু সব গল্প কি বোনের কাছে বলা যায় ?

সুধীর ভাবল। বার বার ভাবল। আর শেষ অবধি ভাবল বোধহয় বলা যায় না।

বোনটা বন্ধুর মত হলও না।···আর একবার ভাবল সুধীর, তবে গল্প বলা যাবে এমন লোক সুধীরের জীবনে কখনই দেখা দেবে না। কোথা থেকে দেবে ? সুধীর নিজের ঘরের দরজা খুলে ধরলে তো দেবে ? সুধীরের সামর্থ্য নেই দরজা খুলে ধরে প্রতীক্ষার ক্ষণ গোণবার।

না, এখন আর সুধীর 'জানে'র কথা বিশ্বাস করছে না। নিজের এই স্বল্প পরিসর ঘরখানার জরাজীর্ণ দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে থাকতে সেই গলির শীর্ণ 'খোনা খোনা' লোকটাকে একের নম্বরের জোচ্চোর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না সুধীর।

সেই অপচয়ের সাতটা টাকা যেন সাত সাতটা আগুনের ঢেলা হয়ে বুকের মধ্যে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। ওই টাকাটায় অন্ততঃ পাঁচদিন বাজার হত সুধীরের সংসারে।

জ্বালা করা করা মন নিয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। অথবা ঘুমোয়নি, হঠাৎ শোনা একটা গল্প হঠাৎ সত্যি হয়ে উঠে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ওকে।

গল্পের মানুষগুলো তাদের সুখ দুঃখ নিয়ে জেগে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুধীরের চোখের সামনে।

নইলে—স্বপ্ন কি এমন স্পষ্ট হয়?

প্রথমেই দেখতে পেল সুধীর, একটা ছায়াছায়া গ্রাম। যে রকম গ্রামের থেকে রেলস্টেশন থাকে অনেকখানি দূরে, যে রকম গ্রাম একশ' বছর আগের চেহারা নিয়ে নিভৃত বিশ্রামে মগ্ন থাকে।

ওই গ্রামেরই আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটা বছর চোদ্দর মেয়ে উল্লসিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল পথের থেকে বাড়ীর দিকে, মেয়েটার মুখে সাফল্যের অনিন্দ্য দীপ্তি, আর হাতে প্রায় তরকারির ঝুড়ির মাপের প্রকাণ্ড এক চুপড়ি ভর্তি সদ্য শিশিরসিক্ত শিউলি ফুল।

রোদটাও এখনও সদ্য শিশিরসিক্ত, তবু মেয়েটা ফুলে রোদ লাগার ভয়ে তার মোটাসোটা রঙিন শাড়ীর আঁচলটা টেনে টেনে চুপড়ির উপর চাপা দিচ্ছিল।

ফুলের ওজনটাই তার সাফল্যের বাহক তাতে আর সন্দেহ নেই। তার অন্য সব বান্ধবীদের উপর টেক্কা দিয়ে প্রায় অর্ধেক রাত থাকতে উঠে গিয়ে শিউলি তলায় হানা দিতে পেরেছে, তবেই না এই সঞ্চয়ের বোঝা!

বেড়ার দরজা ঠেলে আস্তে আস্তে যখন বাড়ির উঠানে পা দিল মেয়েটা, তখন একজন প্রৌঢ়া বিধবা একটা মাটির হাঁড়িতে মোটা করে গোবর গুলে সারা উঠোনে ছড়াচ্ছিলেন। মেটে উঠোন ঝাঁট দেবার আগে ওটাই বোধকরি রীতি।

মেয়েটাকে দেখেই মহিলা হাত থামালেন। তীব্রস্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে কুমি, কোন্ রাত থাকতে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলি, শুনি?'

বোঝা যাচ্ছে পোশাকী নাম যাই হোক, মেয়েটার ডাক নাম কুমি। কুমি যে এই ক্রুদ্ধমূর্তি সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিল তা' মনে হল না। কারণ মোটেই চমকাল না, খুব একটা ভয়ও পেল না।

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিল, 'কোন্ রাত্তির আবার? ভোর রাত্তির।'

'ভোর রাত্তির? তুই বললেই আমি শুনব?' প্রৌঢ়া পরিকল্পিত শাসনের ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে আরো জোরে জোরে বলেন, 'মাঝ রাতে জেগে দেখি বিছানা খালি। বুকের পাটাকেও তোর বলিহারি, কুমি!'

কুমি ধীরে সুস্থে দাওয়ায় উঠে ফুলের চুপড়ি নামিয়ে রেখে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে বলে, 'ফুল তুলতে নতুন যাচ্ছি বুঝি? এই আজ প্রথম দেখলে? সেই এতটুকুন বয়েস থেকে যাচ্ছি না?'

মহিলা আরো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'এতটুকুন বয়সে যখন গিয়েছ, তখন কিছু বলবার ছিল না। এখন বুড়ো ধিঙ্গী হচ্ছ তাই বলা। কার মনে কি আছে—'

কুমি কি উত্তর দিত কে জানে, ঠিক এই সময় দাওয়ার ওদিকের একটা ঘরের বন্ধ দরজা খুলে গেল, এবং আর একটি বিধবা বেরিয়ে এলেন। আগেরটিকে যদি প্রৌঢ়া বলা যায়, তো ইনি যৌবনোত্তীর্ণা। বছর চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তবে বৈধব্যের বেশ এবং পল্লীগ্রামের জল হাওয়া অনেক আগেই যেন যৌবনকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে গেছে।

মহিলাটি প্রথম বেরিয়েই পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদে থেকে হাত তুলে সূর্যদেবকে নমস্কার করে নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে চাপা বিরক্তির স্বরে বলে ওঠেন, 'তোর এই ফুল কুড়নয় এবার দেখছি দিব্যি দিতে হবে, কুমি!'

'দিব্যি দিতে হবে?'

মহিলা বলেন, 'তা' ছাড়া উপায় কি? বারণ যখন শুনবিনে।'

'বারণ করবারই বা মানে আছে কি?'

'আছে মানে।' মহিলাটি দৃঢ়স্বরে বলেন, 'কাল থেকে রাতদুপুরে যাবিনে। সকাল হলে তবে যাবি।'

কুমি হাত মুখ নেড়ে বলে ওঠে, 'আহা রে, মরে যাই, পাড়াসুদ্ধ মেয়ে সবাই দয়ার অবতার হয়ে বসে আছে। আমার জন্যে ফুলগুলো রেখে দিয়ে যাবে।'

'না যায়, নিবি না। রোজ একঝুড়ি করে ফুল নিয়েই বা হচ্ছে কি? আনিস, পড়ে থাকে, শুকোয়।'

'তা' শিউলী ফুল নিয়ে আবার হবে কি? চচ্চড়ি রেঁধে খাবে সজনে ফুলের মত?' কুমি ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'যাওয়াটাই মজা, আনাটাই আহ্লাদ!'

সকালের আলো বেশ সাদা হয়ে উঠেছে, তবু দাওয়ার উপর আরো একটা ঘর তখনো বন্ধ ছিল, এবার খুললে। এ-ঘর থেকে বেরোল আরো এক বিধবা।

সুধীর শুনতে পেল কে যেন কোথায় বসে এলিয়ে পড়া জড়ানে জড়ানে সুরে বলেছে—'হ্যাঁ, এক বাড়ী বিধবা! পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি বিধবা ঠাকুমা, পঞ্চাশ বছরের বিধবা পিসি, চল্লিশ বছরের বিধবা মা, আর চব্বিশ বছরের বিধবা দিদি। সবেধন নীলমণি ওই কুমি। নেহাত নাকি বিয়ে হয়নি, তাই বিধবা হতে পায়নি। তবে ওই চব্বিশ বছরের দিদিটা বিধবার সাজে থাকলে কি হবে, মোটেই বিধবার মতন কৃচ্ছ্রসাধন মানত না। বেলায় ঘুম থেকে উঠত, দুপুরে বিছানায় গা গড়িয়ে পাড়া রাজ্য থেকে চেয়ে-আনা নাটক নভেলগুলো পড়ত, পুজোআর্চার দিক ঘেঁষত না, আর রাঁধতে বললে বলত, 'সাদা কাপড়খানা পরে রাধতে দাও তো রাঁধি, ও তোমাদের কেটে মটকা পরে পারব না বাবা।'

পিসি বলত, 'পারতে তোকে হবেও না। তোর হাতে খেয়ে উদ্ধার হব বলে বলি না, রাত-দিন বসে থেকে থেকে মন হু-হু করবে বলেই বলা।'

বিধবা দিদি বলত, 'আমার অত মন 'হু-হু' করে না। শুধু তোমাদের ঘরে ভাত নেই, সেই ভাতে ভাগ বসাচ্ছি, এটাই যা জ্বালা. আর জ্বালাফালার ধার ধারি না।'

কিন্তু ঘরে ভাত না থাকার মত গড়ন নয় মোটেই তার। স্বাস্থ্য যেন টলটল করছে। গলাটাও যেন রসে টলটলে। সেই টলটলে গলায় বলত, 'মজা আহ্লাদ, ওসব এ বাড়ীর জন্যে নয় রে, কুমি! এ বাড়ীর জন্যে শুধু পেঁচা মুখ, হাঁড়ি মুখ, আর ছুঁই ছুঁই!' বলত, 'কাল থেকে তুই আর একা যাবিনে কুমি, আমাকে ডেকে তুলবি, আমি যাব তোর সঙ্গে।'

পিসি বলে উঠত, 'থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে। মাছ যাবে বেড়ালের চোখ থেকে দুধ আগলাতে!'

যুবতী বিধবা মেয়েটা তীব্রস্বরে বলত, 'রাত-দিন বেড়ালের স্বপ্ন দেখে দেখেই তোমরা তার পথ পরিষ্কার করে তুলবে দেখছি। গলায় দড়ি দিয়ে যে মরছি না কেন এখনো তাই ভাবি। এবার মরবই ঠিক করছি।'

তা সেই মেয়েটা তার কথা রাখল। মরলই।

স্রেফ্ যমের বাড়ীই চলে গেল। তবে গলায় দড়ির ফাঁস জড়িয়ে নয়, অন্য আর এক ফাঁস জড়িয়ে।

আর সেই দেখে এতদিন মা পিসি ঠাকুমার এত বকুনিতে যা না হয়েছিল তাই হল। সেই শিউলি ফুল-কুড়ন সরল সাদা আর ডাকাবুকো মেয়েটা ভীতু ভীতু, আর সংসার অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। আর তারপর—'

হঠাৎ একটা হাসি শুনতে পেল সুধীর। কাচের গ্লাস ভাঙার মত হাসি।

হাসি থামলে কথা, 'আর তারপর—মেয়েটা যখন বছর ষোল হয়ে উঠেছে, তখন—হি-হি-হি—তখন হয়ে গেল একদিন তারও মুণ্ডপাত!'

ঘুমের মধ্যে ঘেমে উঠল সুধীর। আর তখন দম আটকানর মত একটা কষ্ট অনুভব করল। আবার যেন ঝপাঝপ কতকগুলো দৃশ্য তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল।

সেদিন একাদশী, বিকেল-বিকেল আলোয়-আলোয়, বুঝি গোবিন্দ মন্দিরে এসেছিল কুমি যত্নে গাঁথা গোড়ে মালা নিয়ে, দিদি সঙ্গে এসেছিল পাহারাদার হয়ে। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যার আবছা আলোয় একা কুমি দিশাহারা হয়ে মন্দিরের পিছনের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

দিদি?

দিদি নেই।

দিদি বলেছিল, 'তুই মালা পরান দেখবি তো দেখ, আমি ননীদের বাড়ী থেকে একখানা বই নিয়ে আসি। ননীর দাদা কলকাতা থেকে এসেছে আজ, নিশ্চয় এক-আধখানা বই এনেছে। রেলগাড়ীতে তো পড়তে পড়তে আসে।

একটু যেন বেশীই কৈফিয়ৎ দিয়েছিল দিদি। কুমিকে এত কথা বলবার কি ছিল? ছিল না—তবু বলেছিল।

তারপর এই ব্যাপার।

অনেকক্ষণ দিদির জন্য অপেক্ষা করে কুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ননীদের বাড়ী খোঁজ করতে গিয়েছিল।

কিন্তু অবাক হয়ে গেল কুমি ননীর ঠাকুমার উত্তরে। দিদি মোটে যায়ইনি সেখানে!

তবে?

মন্দিরের পিছন দিয়ে কাদের বাড়ী যেতে পারে দিদি?...... এদিক ওদিক দেখে বেড়িয়ে ফের মন্দিরে এসে ভাবতে লাগল কুমি, বাড়ী ফিরে যাবে কিনা। ফিরে গেলে তো দিদি পরে বেদম রাগ করবে। বলবে, ত্বর সইল না একটু? আর এই ভর সন্ধ্যাবেলা একা বাড়ী ফিরলে পিসির জেরার জ্বালায় অস্থির হতে হবে।

ভাবতে ভাবতে গোবিন্দর আরতি সুরু হল। অগত্যাই পুরো আরতির সময়টা দাঁড়িয়ে থাকতে হল কুমিকে। আরতির মাঝখানে তো চলে যেতে পারে না? আরতি দেখবে, শান্তিজল নেবে, হরিরলুটের প্রসাদ কুড়োবে, তবে তো ছুটি!

আরতি শেষ হতে বেরিয়ে এল কুমি, আর থমকে দাঁড়াল!

হয়ত একাদশীটা কৃষ্ণপক্ষের ছিল। আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আরতির শেষে এভাবে বেরিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভয়ানক একটা ভয় করে উঠল কুমির। কুমি জানে না কেন সেদিন আগে থেকে অত ভয় করছিল তার।

ভগবান কি প্রস্তুত করছিলেন তাকে? না শয়তান সেই দিনই কুমির দিকে বিষদৃষ্টি হেনেছিল?

জানে না।

শুধু ভয়ানক একটা ভয় করেছিল তার, আর সেই ভয় ভয় বুক নিয়ে বাড়ীর পথে দৌড় দিয়েছিল কুমি, দিদির ভরসা ত্যাগ করে। নির্ঘাৎ দিদি তার কথা ভুলে গিয়ে বাড়ী ফিরে গেছে।

রাগে দুঃখে ভয়ে চোখে জল এসেছিল কুমির। ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল, গিয়ে দিদিকে আচ্ছা করে বকবে, হঠাৎ নন্দী পুকুরের ধারের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।...কে? কে ওরা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে? কি করছে ওরা?...

বুকটা হঠাৎ পাথর হয়ে গিয়েছিল কুমির। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, হাত পায়ের উপর এক্তিয়ার ছিল না এক বিন্দু।

কিন্তু শুধুই কি হাত পায়ের উপর এক্তিয়ারের অভাব ঘটেছিল? গলার উপর নয়?

গলাটা বশে থাকলে কুমি কি 'দিদি' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠত না?

নাইবা আকাশে চাঁদ থাকল, নক্ষত্রের আলোয় চেনা মানুষকে চেনা যাবে না, নিজের হাত পায়ের মত চেনা মানুষ?

চিনতে ভুল হয়নি, শুধু ডাকতে শক্তি হয়নি। তাই পরে দিদি স্বচ্ছন্দে গলা তুলে হেসে বলতে পারল, 'আর দু'পাঁচ মিনিট বসতে পারলি না? খানা খন্দ ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে একা ছুটে আসতে হল? মন্দিরের ভেতর তো আর কেউ খেয়ে ফেলছিল না তোকে?'

যেন পৃথিবীতে একমাত্র কুমিই খাদ্যবস্তু।

কুমি হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। পনের বছরের কুমি। তারপর কুমি অনেক কষ্টে বলেছিল, 'তুমি কেন বললে ননীদিদের বাড়ী যাচ্ছ—'

'ওমা!' দিদি ঝরঝরিয়ে হেসে উঠেছিল। কুমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল সেই হাসির দিকে। কুমি তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুনতে পাচ্ছিল দিদির গলা উচ্চারণ করছে, 'তা বলেছি তো কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? যেতে যেতে মনে হল ননীর বৌদির বড় ঠ্যাকার। যাক্‌গে, কাজ নেই বই চেয়ে। তার থেকে বাসন্তীদের বাড়ী থেকে—এই তো নিয়ে এসেছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—'পণ্ডিত মশাই'।'

বইটা দেখতে পারেনি কুমি।

ও শুধু ভাবছিল ননীদির বদলে বাসন্তীদিদের বাড়ীতে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না সত্য, কিন্তু গোবিন্দমন্দিরের পিছন দিকটা দিয়ে কি বাসন্তীদিদের বাড়ী যাওয়া যায়?······নন্দী পুকুরের ধারের ওই জামগাছ তলাটা কি বাসন্তীদিদের বাড়ী থেকে ফেরার রাস্তা?

কুমি ভূতে তাড়া খাওয়ার মতন ছুটে ছুটে এসেছে, তাই একটু আগে এসেছে। খানিক পরেই তো দিদি এসে গেল।

এল বকতে বকতে, চেঁচাতে চেঁচাতে।

'মা, তোমার ছোট মেয়ে বাড়ী এসেছে? ধন্যি মেয়ে বাবা! এক বলতে আর বোঝে!'

রাত্রে শুয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করেছিল কুমি। বারবার ভেবেছিল পিসির ঘর থেকে উঠে গিয়ে ঠাকুমার ঘরে ঢুকে দিদিকে বলে, 'দিদি আমার গা ছুঁয়ে বল!'

ঠাকুমার ঘরেই থাকে দিদি। ঠাকুমাকে আগলায়।

এ ঘরে পিসি আর কুমি।

মা একা শোয়।

মা'র কাশি রোগ, কারো সঙ্গে শুতে চায় না। বলে, 'রাতভোর কেশে ঘুম কাড়ব তোমাদের!'

কুমির মাঝরাতে উঠোনের আগল খুলে ফুল কুড়োবার সাহস ছিল, কিন্তু সেদিন কুমি সাহসের পরীক্ষায় ফেল করল। প্রথম রাতে উঠেও এঘর থেকে ওঘরে যেতে পারল না। শেষে অনেক কেঁদে কেঁদে ঠিক করল, দিদির কথাই ঠিক। কি শুনতে কি শুনেছি আমি, কি দেখতে কি দেখেছি।

কিন্তু—

কুমি অত কেঁদেছিল কেন?

তা জানে না কুমি।

শুধু মনে আছে ভিতর থেকে ডুকরে ডুকরে কান্না উথলে উঠেছিল।

কুমি যদি দেখত, পিসি একাদশীর দিন লুকিয়ে জল খাচ্ছে, এত কান্না পেত কি কুমির?

তারপর অদ্ভুত একটা অবস্থা চলল।

কুমি জানে না কি করে পনের বছরের কুমি সেই ভয়ঙ্কর ভারটা বহন করে চলেছিল! সে কি দিদির উপর মমতায়? নাকি শুধু পনের বছরের অসহায়তায়?

ঠাকুমা বুড়ি, পিসি শুচিবাই, মা রুগ্ন, পথে-ঘাটে বেরোতে হলে কুমি আর কুমির দিদিকেই বেরোতে হয়। জল আনতে, ধান ভাঙিয়ে চাল করিয়ে আনতে, কলুবাড়ী থেকে তেল আনতে, আরো কত রকম ফ্যাচাং আছে সংসারে, পুরুষহীন সংসারে কে করবে মেয়েরা ছাড়া?

কিন্তু পিসির প্রাণপণ চেষ্টা—কোন সময় যেন কোন মেয়েটাই একা পথে না বেরোয়। কুমি বেরোতে চাইলে কুমির দিদিকে লেলিয়ে দিত। কুমির দিদি বেরোতে চাইলে কুমিকে।

আর দিদি হঠাৎ আজেবাজে একটা ছুতো করে কোথায়

যেন উধাও হতে যেত। তারপর ফিরে এসে আলটু-ফালটু একটা কারণ দেখাত।

অবিশ্যি এটা ছু'চার দিনই।

কুমি যেদিন রেগে উঠল, সেদিন দিদি হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে একটা নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে বলল, 'কোথায় আসি দেখ্। এইখানে আসি।'

কুমি রুদ্ধশ্বাস বক্ষে বলেছিল, 'এই পোড়ো বাড়ীটায় আস তুমি?'

'আসিই তো! না এসে উপায় নেই যে।'

কুমি তবু প্রশ্ন করেছিল। আর কুমির চুলকাটা, হাত শুধু, আর নরুনপাড় ধুতি পরা দিদি কী রকম সাঙ্ঘাতিক মত একটু টেপা হাসি হেসে বলেছিল, 'কেন? কেন জানিস? এখানে আমার বর আসে। বরও বলতে পারিস, যমও বলতে পারিস। তুই যদি আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করিস্ কাউকে কিছু বলবি না, তাহলে সব কথা তোকে খুলে বলতে পারি। তোকে জানালে আমার অস্তুবিধেটা ঘোচে!'

সেদিনও কেঁদেছিল সেই নিরেট বোকা মেয়েটা। যে মেয়েটা জানত না, পৃথিবী জায়গাটা কি? জানত না, মানুষের বাড়া হিংস্র জানোয়ার আর নেই। জানত না, মেয়েমানুষের মনের মধ্যেও বাসনা কামনা থাকে। জানত না, মেয়ে মানুষেও মদ খেয়ে মাতাল হতে পারে। সত্যই জানত না। এমন অদ্ভুত কথা শুনলে বোধ করি মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে যেত। তাই কেঁদেছিল। কেঁদে কেঁদে বলেছিল, 'শুনতে চাই না তোমার কথা। ওসব তো খারাপ কথা!'

দিদির মুখে তখনও সেই ভয়ানক হাসিটা লেগে ছিল। তেমনি-ভাবেই বলেছিল, 'তা যমই নয় খারাপ, বর তো আর খারাপ নয়?'

কুমি দিদির হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধগর্জনে বলেছিল, 'ছুঁয়ো না তুমি আমায়! খারাপ হয়ে গেছ তুমি! মনে করেছ আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে পেরেছি—' গর্জন বর্ষণে পরিণত হয়েছিল, 'দিদি তুমি না বিধবা?'

সুধীর কি এসব দেখতে পাচ্ছে! না······শুধু শুনতে পাচ্ছে?

শোনা আর দেখায় এমন গুলিয়ে যাচ্ছে কেন? গুলিয়ে যাচ্ছে কেন স্থান কাল পাত্র?

ওই মেয়ে দুটোকে বর্ধমান জেলার একটা গণ্ডগ্রামের দুটো কম বয়সী মেয়ে মনে হচ্ছে না কেন? ওদের বয়স আর চেহারাতে এমন একটা লুকোচুরি চলছে কেন? সবটাই স্বপ্ন বলে? স্বপ্ন? হ্যাঁ স্বপ্নই বৈকি!

স্বপ্নের সেই বিধবা যুবতীর রোষকষায়িত দৃষ্টিটা যেন দেখতে পাচ্ছে সুধীর।

এবার সেও গর্জন ধরেছে। বলছে, 'হ্যাঁ বিধবা! একশ'বার বল না বিধবা বিধবা! তা বিধবা বলেই তো? সধবা ঠাকরুণদের মতন যদি কপালে একতাল সিঁদুর লেপে বরের ঘর করতাম, তা'হলে কি এই পোড়োবাড়ীতে বর খুঁজতে আসতাম? তোকে ছেলেমানুষ ভাবতাম, তা'তো নয়, খুব তো পেকেছিস! তবে তোকেই প্রশ্ন করি—বিধবা হয়েছি কি আমি নিজের দোষে? সেই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগাটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি বিয়ের তিনমাসের মধ্যে? কিছু জানি না, কোন অপরাধ নেই, একখানা টেলিগ্রাম এল, আর জন্মের শোধ সর্বসুখে বঞ্চিত পতিত হয়ে থাকলাম! কেন? কেন? বল কেন? এ জন্মের শোধ আর খেতে পাব না, পরতে পাব না, কারুর সঙ্গে দুটো হাসি-গল্প করতে পাব না, চুল কেটে হতকুচ্ছিৎ হয়ে বেড়াব, কেন এসব?'

কুমি দিদির এই রুদ্রমূর্তির সামনে কান্না ভুলে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আর শুকনো কাঠ গলায় বলেছিল, 'চুল তুমি নিজেই কেটেছ দিদি, পিসি তো বলেনি—'

'না, তা' বলেনি বটে—'দিদি হিংস্র হাসি হেসে বলেছিল, 'শুধু চুলে পাতা কাটতে বারণ করেছিল।···দয়ার অবতার তো তাই হাতে একগাছা করে পেতলের চুড়ি রাখতে সেধেছিল।' কিন্তু

ভিক্ষের দান নেব কেন রে ?···নিইনি, নিজের হাতে মাথা মুড়িয়েছি, হাত শুধু করেছি। তখন বুঝিনি, এখন আবার দেখতে চাই এই হাতে সোনার চুড়ির গোছা কেমন মানায়! এই চুলে পাতা কাটলে কেমন দেখায়!'

কুমি কি রাগ করতে ভুলে যাচ্ছে! তাই কুমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে?

আর সুধীর?

স্বপ্নতে আর গল্পতে, প্রত্যক্ষে আর কল্পনাতে, একাকার হয়ে গিয়ে নিথর হয়ে গেছে সে? তাই ঘুম ভেঙেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না?

॥ ১৮ ॥

ধীরে ধীরে মনে পড়ল।

গল্প বলেছেন মিসেস বিশ্বাস।

বলেছেন, 'গাঁইয়া খাওয়া খেলে, এবার একটা গাঁয়ের গল্প শোন।' শুরু করেছেন আস্তে আস্তে তারপর নেশার ঝোঁকে প্রাণ খুলে বলে গেছেন। যতবারই সুধীর 'আচ্ছা, এবার তা'হলে—' বলে উঠে পড়বার আবেদন জানিয়েছে, মিসেস বিশ্বাস ততবারই তাঁর রঙিন নখ সম্বলিত কোমল করপল্লবটি বাড়িয়ে সুধীরের হাত চেপে ধরে বলেছেন, 'কী করবে বাড়ি গিয়ে? আছে কে সেখানে? বিধবা মা? আইবুড়ো বোন? ফোঃ! ওরা কি আবার ধর্তব্য নাকি? তোমার বাড়ী ফেরার একটু আগে-পরেতে কিছু এসে যাবে না ওদের। বস বস, গল্পের শেষটা না শুনলে অ'ঃ কপালে ধরবে।'

তারপর আবার হতাশ গলায় বলেছেন, 'কিন্তু শেষ কি হয়েছে গল্পটা? কি জানি। বুঝতে পারি না এটাই শেষ, না সবে কলির সন্ধ্যে!'

সুধীর ভয় পেয়েছে বৈকি।

যতবার মিসেস বিশ্বাসের কোমল করপল্লব ওর হাতের উপর এসে পড়েছে, ততবারই ভয়ে শিউরে উঠেছে। ভেবেছে, এ আর কিছু নয়, 'ফাঁদ!'

মহিলাটি যে বিশ্বাস সাহেবের স্ত্রী নয়, সে ধারণা ক্রমশঃই বদ্ধমূল হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে, একে দিয়েই জাল পাতেন সাহেব। এই রকম একটা সঙ্গীন মুহূর্তে নিভৃত কোনখান থেকে বেরিয়ে আসবেন তিনি, সস্তা ডিটেকটিভ্ গল্পের ভিলেনের মত রিভলবার হাতে নিয়ে, এবং তারপর—

নাঃ, খুন করবেন না, খুনের ভয় দেখাবেন।

খুন করাটা তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ত্তে আনা, ভয় দেখিয়ে সেটাই আনবেন। এরকম কুৎসিত কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ওই রকম সদা-সন্ত্রস্ত ভীত ত্রস্ত দু-একটা অনুচরের প্রয়োজন থাকে। যারা কিছুতেই গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দিতে পারবে না। পারবে না নিজেরই প্রাণের ভয়ে। আর—একবার নিজের কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাদের জড়িয়ে ফেলতে পারলেই তো হয়ে গেল চিরকালের মত।

কিন্তু—

যতবারই একথা ভেবেছে সুধীর, ততবারই মিসেস বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকিয়েছে, আর অবাক হয়েছে, সত্যিই কি ইনি?

নিতান্ত গেরস্ত ঘরের ছেলে সুধীর বাঙালীমেয়ের মদ খাওয়াকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারে না। ঘৃণায় শরীর মন 'রী রী' করতে থাকে তার, তবু নেশাচ্ছন্নের প্রতি মনের গভীরে কোথায় যেন জাগছে একটু সহানুভূতি! কোথায় যেন একটু করুণা!…ওর ওই গ্রামের গল্পের মধ্যে কোথায় যেন সহসা বিদ্যুৎ চমক! ওকে একটা ষড়যন্ত্রের নায়িকা ভাবতে মন সায় দিচ্ছে না।

আর 'কুমি' বলে মেয়েটাকে মিসেস বিশ্বাস চিনলেন কী সূত্রে, একথা ভেবে দিশে পাবার আগেই মিসেস বিশ্বাস গল্পটাকে এগিয়ে

নিয়ে গেছেন অনেক 'আখর' দিয়ে দিয়ে। সেই বাহুল্য 'আখর'-গুলো বর্জন করলে এই দাঁড়ায়ঃ কুমি তার দিদির রুদ্রমূর্তি দেখে থতমত খেয়ে গিয়ে কথা বলল না অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে বলেছিল, 'তাহলে তুমি বাড়ি থেকে চলে যাবে?'

কুমির দিদি কেমন বুনো আক্রোশের ভঙ্গীতে সেই পোড়ো বাড়ীটার ধুলোভরা মেজেয় পায়চারি করেছিল বেশ কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ একটু হতাশ গলায় বলেছিল, 'তা, চলে যাওয়া ছাড়া উপায়? আমি যদি একটা বর যোগাড় করে নিয়ে ননীর বৌদির মত কি বাসন্তীর মত সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে চাই, দেবে কেউ তা করতে?'

কেন কে জানে, কুমির হঠাৎ চোখে জল এসেছিল, বলে উঠেছিল, 'বেশ, তুমি যা ইচ্ছে কর, আমি কাউকে বলে দেব না।'

'কুমি—'

কুমির দিদির গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনালঃ 'খারাপ হতে কার ইচ্ছে হয়, বল? আমারই কি ইচ্ছে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে ইচ্ছে মেটাই? কি করব? আমাদের এই সমাজ আমাকে ঠেলে মন্দ পথে পাঠাচ্ছে।'

কুমি কস্টে কান্না চেপে বলেছে, 'চেষ্টা করলেই তো 'ভাল' থাকা যায়।'

দিদি আবার চড়ে উঠেছে, 'না, তা যায় না। বুঝলি, যায় না। আর একটু বড় হলেই বুঝতে পারবি কেন যায় না। আর শুধুই কি তাই? বিধবাদের কোন 'পোজিশন' আছে সমাজে? মান মর্যাদা বলতে কিছু আছে? হয় নিন্দে, নয় করুণা, এই তো হচ্ছে পাওনা তার। এই হাড়ির হাল হয়ে সমাজের একপাশে পড়ে থেকে কী ঐশ্বর্যটা লাভ হবে শুনি? যে সমাজে মান নেই, মর্যাদা নেই, আদর ভালবাসাও নেই, সে সমাজে ঠাঁই থাকল কি গেল তা নিয়ে মাথা ঘামানটা বোকামী। মেয়েমানুষ জাতটা বোকা বলে আবহমান-কাল ধরে তাদের ওপর কম অত্যাচারটা চলে আসছে না! আর 'বোকা' হয়ে থাকতে ইচ্ছে নেই।'

কুমি মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'বেশ তো, থেকো না!'

হঠাৎ কুমির দিদি কুমির কাছে সরে এসেছিল, কুমির দুকাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে কেমন এক রকম হেসে বলেছিল, 'খুব ঘেন্না করবি তো তখন দিদিকে?'

কুমি মাথা নেড়ে বলেছিল, 'জানি না!'

'আমি জানি।'

কুমির দিদি উদাস গলায় বলেছিল, 'করবি ঘেন্না। কারুর কাছে পরিচয় দিবি না, কখনো প্রকাশ করবি না, তোর একটা দিদি ছিল। সবই জানি। যাক, তাই আমার বিধিলিপি।'

তারপর বলেছিল, 'বাড়ি যা!'

বাড়ি অবিশ্যি ফিরেছিল কুমি সেদিন, কিন্তু তার দিদির 'বিধিলিপি' কি তাকে তাড়া করেছিল? নাকি অশরীরী আত্মার মত তাকে গ্রাস করেছিল?

তাই করেছিল হয়ত, তাই দিদিকে 'ঘেন্না' করবার অহঙ্কার আর রইল না তার। হঠাৎ একটা তচনচ কাণ্ড ঘটে গেল কুমির উপর দিয়ে। সেই নারকীয় বীভৎসতার ধাক্কায় চূরমার হয়ে গেল কুমির সমস্ত অহঙ্কার।

ক'দিন পরে? সেকথা মনে নেই। এই কথা মনে আছে, ওই ঘটনারই কাছাকাছি। হয়ত পরদিন, হয়ত দু'দিন পর।

সেদিনও দিদিকে খুঁজতে এসেছিল কুমি। বাড়িতে পিসি ভয়ানক রাগারাগি করছিল দিদিকে না দেখতে পেয়ে, কুমি বলেছিল, 'যাই, দেখিগে ঘাটে গেছে নাকি—' বলে চলে এসেছিল সেই পোড়ো-বাড়িটায়।

কিন্তু সেদিন সেখানে দিদি ছিল না। পরে জেনেছিল কুমি, দিদি সেদিন ঠাকুর-মন্দিরে গিয়েছিল—'অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্র' আওড়াতে, পরদিন চলে যাবে গ্রাম ছেড়ে চিরদিনের মত, তাই।

আর শুধুই কি গ্রাম? আরো অনেক কিছুই কি ছাড়তে হবে

না? সেই শূন্যতার পূরণ আশায় বোধহয় কুমির দিদির ঠাকুর-মন্দিরে যাওয়া।

কিন্তু কুমি?

কুমি কিছু জানে না। কুমি সেই পোড়ো-বাড়িটায় ঢুকে এঘর ওঘর ঘুরছিল 'দিদি'কে খুঁজতে, হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটা মাংস লোলুপ বন্য শৃগাল।

'হয়ে গেল দফা শেষ—' হেসে উঠেছিলেন মিসেস বিশ্বাস, 'দিদিকে ঘেন্না করার মহিমা গেল ঘুচে। আর যখন সে আগুনের দাহে ছুটে যাচ্ছিল পুকুরে ডুবতে, তখন দিদি এসে পড়ে ধরল।...... প্রথমে বুঝতে পারেনি দিদি, তারপর বুঝতে পেরে তীব্র গলায় বলেছিল, 'এখানে কী করতে এসেছিস, লক্ষ্মীছাড়ি রাক্ষুসী?'

কুমি বলতে পারেনি, 'তোমায় খুঁজতে।' সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।...তারপর দিদি বলেছিল, 'মরা এত সোজা নয়, বুঝলি? মরা যদি এমন সোজা হত, আমি অনেক আগেই মরতাম! শোন্, আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

কুমি প্রবলভাবে মাথা নেড়েছিল।

ওর দিদি একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'না গিয়েই বা করবি কি? সর্বনাশ তো হয়েই গেছে, আর উপায়? ঘরে থাকলেই কি তুই সাহস ক'রে 'রাধা-গোবিন্দর' ঘরে সন্ধ্যে দিতে পারবি? না অসময়ে মা পিসিকে একদিন একটু জল দিতে পারবি? পারবি না তো। তবে?'

কুমি এবার জোর গলায় বলেছিল, 'মরব।'

দিদি অদ্ভুত একটু রহস্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'তাহলে মর! দেখ্, তোর কাছে যদি সেটা সোজা হয়।'

কুমির দিদির সেই রহস্যের হাসিটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মিসেস বিশ্বাস। চোখ বুজলেই দেখতে পান। এখন বুঝতে পারেন ব্যঙ্গ হাসি মানে কি! কিন্তু কুমির কথা এমন

বিশদভাবে জানালেন কি করে তিনি? কুমির সঙ্গে তাঁর কী সূত্রে পরিচয়?

কে জানে সূত্রটা কি, তবে গল্পটা বলে চলেছেন ঠিকই।

কুমির দিদির যে সেদিন সমস্ত রঙিন স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত চোখের আলো মুছে গিয়েছিল, আর বিদ্রোহিনী সেই মেয়েটাও যে বিদ্রোহের বদলে এক নতুন প্রতিহিংসায় মেতেছিল, সে কথা মিসেস বিশ্বাসই বলেছেন। বলেছিলেন, 'কুমির দিদি তারপর বলেছিল, 'জোর ধাক্কায় যেমন ইঁট কাঠের ঘরের বন্ধ দরজা খোলে, তেমনি বুদ্ধির ঘরের বন্ধ দরজাও খোলে। মস্ত একটা ধাক্কায় ভারী একটা দরজা খুলে গেল আমার! এবার থেকে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখব! ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম—'

কুমির কান্না থামছিল না।

কাঁদতে কাঁদতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে। দিদি হঠাৎ চাপা একটা ধমক দিয়ে উঠল, 'থাম্, প্যান প্যান করিস না। কাঁদব,···মরব, কেন? পৃথিবী যা খুশি তাই করবে, আর আমরা হয় কাঁদব, নয় মরব? এমনই অপদার্থ? বেশ, মরবি তো অমনি মরবি কেন? মেরে মরবি!'

'দিদি—'

'আঃ! বলছি না থাম্।' দিদি কুমির হাতটা চেপে ধরে বলল, 'আয়, আমার সঙ্গে।'

তারপর কুমির দিদি কুমিকে ফের টেনে নিয়ে গেল সেই পোড়ো ঘরে। যেখানে সেই সুকান্ত লোকটা নিরুদ্বেগে বসে বসে সিগারেট ওড়াচ্ছিল। কুমির দিদিকে দেখে দিব্যি সপ্রতিভ গলায় বলে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলে? সেই থেকে বসে বসে—'

কুমি অবাক হয়ে দেখছিল, লোকটার মুখে এতটুকু অপরাধীর ছাপ নেই। কী করে হয়? কুমি কি এখানে আসতে পারত, যদি না দিদি টেনে আনত? কুমি কি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত, যদি না দিদি হাতটা শক্ত করে ধরে থাকত?

কুমির দিদি বিস্বাদ গলায় বলেছিল, 'সেই থেকে বসে বসে আমার কথাই চিন্তা করছিলে বোধহয় ?'

লোকটা হেসে উঠল। বলল, 'মনে হচ্ছে খুব রেগেছ! কী হল ? এ বুঝি গিয়ে এই নারকীয় পাষণ্ডের নামে খুব লাগিয়েছে ? কে হয়, বোন ?'

কুমি হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের এত সপ্রতিভতা সে জীবনে দেখেনি। এই সপ্রতিভতাই কি কুমিকে মোহগ্রস্ত করেছিল ?

কুমির দিদিও যেন কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থেকেছিল, তারপর বলেছিল, 'তোমায় যতটা শয়তান ভেবেছিলাম, দেখতে পাচ্ছি তার থেকে অনেক বেশী শয়তান!...যাক, সেটারও শেষ দেখতে চাই। হ্যাঁ, আমার বোন, ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'ওকেও নিয়ে যাব ?' লোকটা চমকে উঠেছিল।

কুমির দিদি সেই চমকানির দিকে একটা ক্রূর হিংস্র দৃষ্টিক্ষেপ করে বলেছিল, 'হ্যাঁ, নিয়ে যাব। বিয়েটা ওর সঙ্গেই হবে।'

লোকটা কুমির দিদির কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন একটু নিবে গেল। দমল, তবু চেষ্টা করে হেসে বলল, 'এ যে একেবারে লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা! বসে থেকে বেজার ধরছিল, হঠাৎ হাতের কাছে একটা মজার জিনিস পেয়ে কিঞ্চিৎ মজা করা গেল। এই তো ব্যাপার! এর জন্যে একেবারে—'

'থাম।'

দিদি রূঢ় স্বরে বলে ওঠে, 'এই হচ্ছে শেষ ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থায় রাজী না হলে দেখ, তোমার মত লোককে কী করে জব্দ করা যায় তা শেখাব। মেয়েমানুষ জাতটাকে শুধু একদিক থেকেই দেখেছ, এর পর তাহলে আরও একদিক থেকে দেখতে পাবে।'

লোকটা মাথা হেঁট করেছিল।

কুমি অবাক হয়ে দেখছিল, একটা সহায়-সম্বলহীন বিধবা যুবতী

জীবন কেটেছে যার গণ্ডগ্রামে, সে এই শহুরে বড় লোকটাকে যেন মন্ত্রপড়া সাপের মত হৃতবল করে দিল।

বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতই মাথা হেঁট করে বসে রইল সে দিদির দাঁতে-পেষা তীব্র বাক্যের সামনে।

কত কি যেন বলল দিদি!

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে নিশ্বাস ফেলে বলল সে, 'একবারের জন্যে কি ক্ষমা করা যায় না? ভুলে যাওয়া যায় না—'

কুমির দিদি ভুরু কুঁচকে বলল, 'একবারের জন্যে? কুমির যে ক্ষতি তুমি করলে, সেটা যদি মুছে দিতে পার, ক্ষমা করতে পারি! পারবে তুমি তা?'

কুমির দিদি গম্ভীর স্বরে বলে, 'তোমায় অন্যরকম ভেবেছিলাম!'

লোকটাও গম্ভীর হল। বলল, 'আমি যদি তোমার বোনের বিয়ে দিয়ে দিই? ভাল বিয়ে দিয়ে দেব, যত টাকা লাগে—'

'টাকা? টাকা দিয়েই সব পাপ মিটিয়ে নেওয়া যায় এই তোমাদের ধারণা, কেমন? তা হয় না। অন্য কোথাও বিয়ে হলে কুমি চিরদিন নিজেকে জোচ্চোর ভাববে, অসতী ভাববে—'

এই সময় হঠাৎ হেসে উঠেছিলেন মিসেস বিশ্বাস, বলেছিলেন, 'কিন্তু বল তো—কী যেন তোমার নাম? সুবোধ না?'

'সুধীর।'

'ওই হল। দুটোই এক। তা বল তো সুধীর, ওটা তো হল, কিন্তু যদি কেউ স্বামীকে বলে-কয়ে, স্বামীর পারমিশান নিয়ে অসতী হয়, তাকে কি জোচ্চোর বলে?'

সুধীর চমকে উঠেছিল।

তারপর সুধীর বুঝেছিল নেশা বেশী জোরাল হয়ে এসেছে। এখন একে ধমক দেওয়াও যায়।

তাই দিয়েছিল সুধীর: 'কী বকছেন যা তা?'

মিসেস বিশ্বাস হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'সবাই তাই

ভাবে। যা তা! কিন্তু বিশ্বাস কর সুধীর, সত্যি। সত্যিই পারমিশান নেওয়া আছে আমার। শুধু মনের মত মানুষ খুঁজে পাই না।'

সুধীর উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'আপনার এখন বিশ্রামের দরকার, আমি চললাম।'

মিসেস বিশ্বাস আবার চেপে ধরেছিলেন ওর হাত, 'গল্পটার শেষ শোন।...সেই লোকটা মাথা হেঁট করে বলেছিল, বেশ, রাজী হলাম যেন তোমার কথায়, কিন্তু তারপর?'

'তারপর আবার কি? স্ত্রীর দিদি! বড় শালী!'

হেসে উঠেছিল কুমির দিদি। নিষ্ঠুর হাসি! বোধকরি নিজের উপরই সেই নিষ্ঠুরতা।

লোকটা এবার রূঢ় হল। বলল, 'যদি সে নির্দেশ না মানি?'

কুমির দিদি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'দেখা যাবে বীরপুরুষের বীরত্ব! তবে জেনে রাখ, সব মেয়েই মাটির পুতুল নয়।'

নাঃ, শেষ পর্যন্ত মরা হয়নি কুমির। বরং দিদি যখন ওই লোকটাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিঁধছিল, তখন যেন একটু মায়া মায়া হচ্ছিল তার।

হ্যাঁ, মায়াই হচ্ছিল। লোকটাকে তখন আর বাঘ সিংহ শৃগাল মনে হচ্ছিল না কুমির। মনে হচ্ছিল যেন একটা অবোধ শিশু; যে শিশু না বুঝে আগুনে হাত দেয়।

হয়ত ওই মায়াটা থেকেই নিজের মরার কথাটা ভুলে গেল কুমি। আর সেই মায়াটাই বাড়তে বাড়তে নিজের উপর এসে পড়ল। প্রাণটা বড় মায়ার বস্তু মনে হল।

সেইরাত্রে দু'বোন একসঙ্গে ঘর ছাড়ল। কলকাতায় এল। তারপর বিয়ে হয়ে গেল কালীঘাটে গিয়ে। আর কুমি দারুণভাবে সেই বরটার প্রেমে পড়ে গেল।

সুধীর এখানে আবার কথা বলে উঠেছিল। বলেছিল, 'অসম্ভব!

ওর ওই প্রতিবাদ শুনে হেসে উঠেছিলেন মিসেস বিশ্বাস। বলেছিলেন—

'মেয়েমানুষের অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোন বস্তু আছে নাকি? আর এ তো একেবারে সাধারণ স্বাভাবিক। পীড়নকারীকে ভালবাসাই তো মেয়েমানুষের একটা বিশেষ ধর্ম। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ না? শুধু পীড়নকারীকে বা হরণকারীকেই নয়, মেয়েরা ভালবাসতে দ্বিধা করেনি তার পিতৃহন্তাকে, ভ্রাতৃহন্তাকে, স্বামীহন্তাকে। লুঠে ডাকাতের পায়ে প্রাণঢালা নতুন নয় মেয়েদের। এখনো কি দেখতে পাও না তার নমুনা? পণের দায়ে মেয়ের বাপ ভিটেমাটি বিক্রী করে সর্বস্বান্ত হয়। আর সেই মেয়ে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে সেই পণগ্রহণকারীর গলায় মালা দেয়, তার বুকে গিয়ে পড়ে!···মেয়েমানুষের আবার 'অসম্ভব'! অতি অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে তারা। নইলে কুমির দিদি মাসে মাসে তার সেই ছেড়ে-আসা গ্রামে যেতে পারে টাকা নিয়ে নিয়ে?'

'অ্যাঁ!' সুধীরের চোখ বড় হয়ে উঠেছিল।

'হ্যাঁ।' মিসেস বিশ্বাস হেসে উঠেছিলেন, 'কুমি পারে না, কোনদিন পারেনি। কিন্তু কুমির দিদি পেরেছে, পারে। টাকা নিয়ে যায়, নিয়ে যায় কাপড় কম্বল র‍্যাপার ওষুধ। কুমির ঠাকুমা পিসি নেয় সে সব আদর করে, কুমির দিদিকে বসায়, খাওয়ায়। শুধু মা নাকি কথা বলে না। কিন্তু আনা-ওষুধগুলো তো খায় মা! তবেই বল, 'অসম্ভব' কথাটার মানে কোথায়?···এই আমিই হয়ত এখন তোমায় ধরে রাখতে পারি, বলতে পারি—ভয় নেই আমার স্বামী কিছু বলবে না, এদিকে আসবেই না আজ—'

সুধীরের ঘাম ছুটে গিয়েছিল।

সুধীরের বুঝতে বাকী থাকেনি, মহিলাটি পুরো অপ্রকৃতিস্থ। তবু জোর ঠেলে উঠে পড়ে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠেছিল সে, 'কী বলছেন কী আপনি! যাক যেতে দিন আমায়—'

টেবিলের কোণে ধাক্কা খেয়ে, চেয়ারকে ছিট্‌কে দিয়ে টেবিল থেকে মুক্ত হয়ে সরে এসেছিল সুধীর, আর মিসেস বিশ্বাস হতাশ বিষণ্ণ দু'টি চোখ তুলে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য! লোকে তবে বলে কেন, পুরুষজাতটাই লোভী! সুন্দরী নারী দেখলেই তাদের— আচ্ছা সুধীর, আমাকে কি তোমার সুন্দরী বলে মনে হয় না?'

সুধীর চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। চাপা তীব্র স্বরে বলে উঠেছিল, 'পুরুষ জাতটা সম্পর্কে আপনাকে কে কি বলেছে আপনিই জানেন, তবে মেয়ে জাতটা সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণার কারণ আপনি ঘটাচ্ছেন না। এ ধরনের কথা শুনতে হবে জানলে কক্ষণো আসতাম না আমি!'

মিসেস বিশ্বাস মিইয়ে গিয়েছিলেন, হতাশ হতাশ গলায় বলেছিলেন, 'তবে? তবে কি হবে? তোমাদের বিশ্বাস সাহেবের কাছে হেরে গিয়েই থাকব তাহলে?'

বিশ্বাস সাহেবের কাছে! সেটা আবার কি? সুধীর ঈষৎ থমকেছিল, 'তার মানে?'

কিন্তু শুধুই কি বিশ্বাস সাহেবের নামে থমকেছিল সুধীর? কুসুম বিশ্বাসের আবেগ-আরক্ত মুখের উপর বসান করুণ আবেদনের চোখ দুটোও কি থমকে দেয়নি তাকে?

কিসের এই আবেদন? কিসেরই বা হারজিত?

মানে জানতে চেয়েছিল সুধীর। আর তারপর 'মানে' শুনে আক্রমিতের মত হুড়মুড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিল, চেয়ারটা উল্টে টেবিলটা ঠেলে, দরজার কোণে রাখা ফুলদানীটা ধাক্কা মেরে উল্টে দিয়ে।

কী ভয়ঙ্কর মানে! কী সাঙ্ঘাতিক বীভৎস!

সেই 'মানেটা' যেন সুধীরকে গ্রাস করবে বলে তেড়ে আসছে!

কুসুম বিশ্বাস নিঃসন্তান।

বিশ্বাস সাহেব রায় দিয়েছেন, সেই অভিশাপ তার জীবনের সাথী,

তার ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা। 'মা' হবার উপাদান তার মধ্যে নেই, বিধাতাই দেননি। মিসেস বিশ্বাস চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন স্বামীকে।

তাঁর বিশ্বাস তাঁর এই বন্ধ্যাত্ব, বিধাতার কার্পণ্য নয়, বিশ্বাস সাহেবের ত্রুটি।

অতএব—

হ্যাঁ, অতএব বিশ্বাস সাহেব স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন।

কিন্তু শুধু স্বাধীনতাতেই কি সব হয়? মিসেস বিশ্বাসকে যদি কেউ 'সুন্দরী' বলে গণ্য না করে? যদি তাঁর কাছে আটকা পড়তে না চায়?

কীভাবে বাড়ী ফিরেছিল সুধীর জানে না। শুধু সারারাত স্বপ্ন দেখেছে এলোমেলো, অদ্ভুত।

কিন্তু সেই গল্প আর স্বপ্নের ফাঁস থেকে মুক্ত হতে কি কাজটা ছেড়েই দিয়েছিল সুধীর? উমাশশীকে বলবার সুযোগ দিয়েছিল, 'তা ছেড়ে দেবে বৈকি বাবা! মানী মানুষ তুমি! মা ভাইয়ের মুখের অন্নের থেকে অনেক দামী বস্তু তোমার মানটা, তাই এক কথায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসতে বাধে না।'

নাঃ, দেয়নি। একথা বলবার সুযোগ মাকে দেয়নি সুধীর। চাকরি ছাড়েনি। ছাড়েনি বলেই তো ওই ভয়ের জানলাটার নীচে দিয়েই যাওয়া-আসা করতে হয় তাকে। ওই পথটা ছাড়া গাড়ি বার করবার আর তো কোন পথ নেই। গ্যারেজের গা ঘেঁসেই তো বিশ্বাস সাহেবের আলতার কারখানার উঁচু দেওয়াল।

ভয়, ভয়!

একতলার ঘরের ওই জানলাটার নীচে দিয়ে দ্রুতপায়ে পার হয় সুধীর ঘাড় নিচু করে। তবু ভয় কি তাকে গ্রাস করতে আসেনি?

এসেছে।

কাতর মিনতি ভরা আবেদনমুখর দুটি চোখ হয়ে গ্রাস করতে চায় সে। কাতর, তবু যেন আগুনের রেখা দিয়ে আঁকা।

সুধীর কি ঘাড় গুঁজে এগিয়ে গিয়ে হাত এড়াতে পারবে তার?

না, পারে না।

ভয়ের আকর্ষণ বোধকরি ভালবাসার আকর্ষণের থেকেও তীব্র। তাই সুধীরের পলায়নপর দৃষ্টির সঙ্গেও সে দৃষ্টির বিনিময় অবধারিত।

হয়ত সে বিনিময় চকিতের জন্য, তবু সেই চকিত মুহূর্তটুকুই যে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে অহরহ তাড়া করে ফেরে সুধীরকে। আগুনের রেখায় আঁকা মুখর চোখ দুটো শুধু বিশ্বাস সাহেবের জানলাতেই আটকে থাকে না, আটকে থাকে সুধীরের মর্মমূলে। বিঁধে গিয়ে আটকে থাকে। অহরহ অনুক্ষণ।

তবু চাকরীটা ছাড়েনি সুধীর।

সুধীর কি তবে বিশ্বাস সাহেবের 'স্বর্ণসিন্ধু' মকরধ্বজের স্বাদ পেতে শুরু করেছে? না কি শুধু বিশ্বাস সাহেবের অবিশ্বাসী হতে পারবে না বলেই, সাহেবের কাছে দেওয়া কথার খেলাপ করবে বলেই নিত্য দিন ওঁর সাঁতরাগাছির কারখানায় যাচ্ছে তদারক করতে? অথবা অন্য কোন আকর্ষণ আছে? সেই আকর্ষণই তাকে বেঁধে রেখেছে? কে জানে কি! তবে চাকরী সে করে যাচ্ছে।

অথচ ওই চোখকে আর কতদিন সহ্য করা যায়? তাছাড়া শুধুই চোখ? পাকিয়ে পাকিয়ে ছোট করা কাগজের গুলিগুলো? যে গুলিগুলো জানলা থেকে ছুটে এসে সুধীরের গায়ে লেগে পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে! যেগুলো খুলে চোস্ত করে মেলে ধরলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠবার মত ছোট ছোট সব লাইন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।...

যেমন...অত ভয় কেন? আমি কি বাঘ না সিংহ! একটা গল্প শুনে এত ভয়?...অথবা একবারের জন্যে একটা চান্স আমাকে

দিলে পারতে! একেবারেই কি অসম্ভব? নিজের সম্পর্কে সত্য মিথ্যাটা যাচাই করতে পেলাম না।

প্রথম দিন প্রথমে ওই গুলি-পাকান কাগজটা কুড়িয়ে নেয়নি সুধীর, চলে গিয়েছিল অগ্রাহ্য করে। ভেবেছিল জগতে পাগল কিছু আছেই। আর তারা পাগলামী করবেই, তা বলে আমি পাগল হতে পারি না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যাপারটার অন্যদিকটা চোখে পড়ল। এই কাগজ যদি অপর কারো চোখে পড়ে! যদি সে এর পাঠোদ্ধার এবং মর্মোদ্ধার করে ফেলে!

ভেবে ডবল করে কাঁটা দিল গায়ে।

অতএব গুলিটাকে পায়ে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর নীচু হয়ে কুড়িয়ে নেওয়া! চলছে এই খেলা।

সুধীর ঠিক করেছে দেখবেই শেষ অবধি। কী হতে পারে শেষ? হয় খুন হওয়া, নয় জেলে যাওয়া! এর থেকে বেশী কিছু তো নয়? হোক। জেলে গেলে কলঙ্ক ছড়াবে? ছড়াক। ক'দিন মনে রাখবে লোকে সে কলঙ্ক? কত কলঙ্কিত অধ্যায় বুকে নিয়ে নিথর হয়ে বসে আছে আদালতের ফাইল, কত কলঙ্কের কালি মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে খবরের কাগজরা নতুন খবরের ডালি ধরছে! নতুন নতুন সমারোহে!···কে মনে রাখবে কবে কোনদিন তার আইন আদালতের পৃষ্ঠায় সুধীর গুপ্ত নামক একটা হতভাগার নাম ছাপা হয়েছিল?

মা, বোন, ভাই?

তাদের কাছে তো সুধীর নামক ব্যক্তিটা মৃতই। যে লোকটা তাদের কাছে শুধু একটা ব্যর্থতার মূর্তি, মৃত ছাড়া আর কী সে!

তবে কেন জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলবে না সুধীর নামে পরিচিত সেই ব্যক্তিটা? ছ'মাসের মধ্যে সেই 'জান' নামক ব্যক্তিটাকে অবলীলায় পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিতে পারা গেল কিনা, সেটা পরীক্ষা করে

দেখতে তো আর ছ'টা মাসও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। দিনে দিনে এগিয়ে গেছে অনেকগুলো দিন।

কাগজগুলো কুড়িয়ে নেয় সুধীর। তখনই খুলে পড়ে না, আরো পাকিয়ে পকেটে রেখে দেয়। পরে কোন এক সময় দেখে। ছিঁড়ে টুকরো করে করে ফেলে দেয় রাস্তার ধারে, ডাস্টবিনে।

কুমির গল্পের রহস্য ভেদ হয়ে গেছে সুধীরের কাছে। পরদিনই হয়েছে। বিশ্বাস সাহেবের সাঁতরাগাছির আশ্রমে গিয়েই হয়েছে।

পরদিন আর বিশ্বাস সাহেব গেলেন না। সুধীরকে একা যাবার হুকুম দিলেন। সুধীরও গেল। ডুবেছি না ডুবতে বাকি আছি, পাতাল কতদূর ?—এই মনোভাবে সে হুকুম পালন করতে গেল। পার হল দীর্ঘ পথ, পার হল জানের বাড়ী, তিন-বাঁকা সরু গলি গিয়ে পড়ল সেই করোগেট টিনের গেট দেওয়া কম্পাউণ্ডটার সামনে।

দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে শুধু একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে, সেলাম জানিয়ে পথ ছেড়ে দিল। তারপর উর্মিলা এসে জানাল, 'আপনাকে ডাকছেন।'

আর তারপরই—যখন 'আশ্রমকর্ত্রী' কনকলতার সামনে এসে দাঁড়াল, ভেদ হল রহস্য।

কুমির দিদি! কুমি, যেটা নাকি কুসুমের অপভ্রংশ শব্দ।

না, ভুল নেই। কুসুম বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরেই কথা বলে উঠলেন কনকলতা, কুসুম বিশ্বাসের কট ক্ষের ঝাপটা মেরে।

'আজ থেকেই হাতেখড়ি ?'

গতকাল যেন এঁকে দেখে বার বার মনে হয়েছিল কোথায় যেন দেখেছি এঁকে, সে রহস্যও অতএব ভেদ হল। দেখেছি এঁকে নয়, এঁর অনুজাকে। বসন্ত বিশ্বাসের নিভৃত জীবনের একটি জানালা খুলে পড়ল সুধীরের চোখের সামনে। যে জীবনে কনক আছে, কুসুম আছে।

'তারপর ?'

'তারপর স্ত্রীর দিদি। বড় শালী।'

এক অপ্রকৃতিস্থ রমণীর বিজড়িত কণ্ঠ ধ্বনিত হল কানের মধ্যে। সুধীর বিহ্বল হল, চকিত হল। ভাবল—সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছেন কনকলতা?

সুধীরের ওই বিহ্বল দৃষ্টি দেখে হেসে উঠলেন কনকলতা। খালি হাত আর থান কাপড়ের সঙ্গে যেন হাসিটা তেমন মানানসই নয়। হেসে উঠে বললেন, 'অবাক হয়ে কী দেখছ বল তো?'

সুধীর নিজেকে সামলে নিল। আত্মস্থ হয়ে আর ইচ্ছে করেই বলল, 'অবাক হয়েছি বললে হয়ত ভুল হবে না।'

'ওমা, তাই নাকি? কী এমন অবাক করা কাণ্ড করে বসলাম?'

'আপনি করেননি, বিধাতা পুরুষ করেছেন। অবাক হয়ে দেখছিলাম মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চেহারার আশ্চর্য মিল!'

কনকলতা এক মুহূর্ত থতমত খেলেন। তবে তিনিও আত্মস্থ হতে বিলম্ব করলেন না। বলে উঠলেন, 'সত্যি বুঝি? তাহলে তো দেখতে হয় তোমার সাহেব গিন্নিটিকে! তা আকৃতিটা তো শুনলাম আমার মত, প্রকৃতিটা?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ লোক কেমন? লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার কেমন?'

'লোকজন? মানে চাকর-বাকরের সঙ্গে?' ইচ্ছে করে চাকর-বাকর শব্দটার উপর জোর দেয় সুধীর। বলে, 'অন্যের কথা বলতে পারি না, নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, চমৎকার! চাকর-বাকরদের নেমন্তন্ন করে কাছে বসিয়ে খাওয়ান, গল্প শোনান।'

কনকলতার চোখটা হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। তারপরই হেসে উঠে বলেন, 'বাঃ, সত্যিই চমৎকার! শুনে মিসেসের চাকর হতে ইচ্ছে হচ্ছে। তা' কী গল্প শোনালেন?'

'এক নভেলের গল্প। এখন বলুন আমায় কি করতে হবে?'

কনকলতা ঈষৎ গম্ভীর হন, ‘কেন, তোমাদের সাহেব তোমাকে বলে দেন নি কি করতে হবে ?’

সুধীর মাথা নাড়ে, ‘না ! উনি শুধু বলেছেন আপনার নির্দেশমত কাজ করতে।’

কনকলতা আর একবার হেসে ওঠেন, ‘ওঃ, তাই নাকি ? তা, আমি যদি নির্দেশ দিই বিশ্বাস সাহেবের এই পুণ্য আশ্রমের আশ্রম-বাসিনীগুলিকে গাড়ী করে বয়ে বয়ে তাদের ইচ্ছেমত জায়গায় ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে এস ?’

‘দেব।’

‘বটে ! ভাল ভাল ! তা যাক্, আজ আর সবাইকে নিয়ে যেতে হবে না, শুধু একজনকে নিয়ে গেলেই হবে। একটু দূরে যেতে হবে। একটি অখ্যাত গণ্ডগ্রামে—’

এখানে বিশ্বাস সাহেব নেই।

সুধীর তাই আর ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে না। সুধীর তার বাক্য-বিন্যাসে ছাত্রজীবনের সাহস আর ক্ষিপ্রতা ফিরে পাচ্ছে। অতএব সুধীর স্বচ্ছন্দে বলে উঠতে পারছে, ‘বর্ধমান জেলায় বোধহয় ?’

কনকলতা এবার স্পষ্টতঃ চমকে ওঠেন। চোখের কোণায় আবার আগুন ঝরে। তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠেন, ‘মনিব গিন্নীর কাছে নেমন্তন্নটা খাওয়া হল কবে ?’

‘কাল সন্ধ্যায় !’

‘হুঁ ! খুব রঙে ছিলেন বোধহয় তখন গিন্নী ?’

সুধীর অবোধ। সুধীর অবাক গলায় বলে, ‘মানে ?’

‘থাক্ মানে জেনে দরকার নেই। খানিক পরেই রওনা হতে হবে, নইলে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরতে পারবে না। তোমাকে এখানেই খেয়ে নিতে হবে।’

সুধীর আপত্তি জানায়। কনকলতা ভুরু কুঁচকে বলেন, ‘কেন, খাবে না কেন ? এখানে খেতে ঘেন্না করবে ?’

'ওকথা বলছেন কেন? খাবার প্রয়োজন বোধ করছি না, এইটাই বলছি।'

'তুমি বোধ করছ না, আমি করছি। সারাদিন উপোসে থাকবে নাকি?'

'চা খাবার খেয়ে তো বেরিয়েছি, ওতেই চলে যাবে।'

কনকলতা একটু গুম্ হয়ে থেকে বলেন, 'বেশ, ঠাকুরের প্রসাদ খেতে তো আপত্তি হবে না, তাই খাও পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে যান কনকলতা। সুধীর ঘর থেকে নেমে আসে বাগানে। অবশ্য 'বাগান' শব্দটার অপপ্রয়োগ করে বলা চলে বাগান।

কতকগুলো গাছ এলোমেলো ছড়ান ছিটোন, মাঝে মাঝে শুকনো কাঁটাসার ঝোপঝাড়।...আর সেই গতদিনের মতই গাছের ডালে দড়ি টাঙিয়ে মেলে দেওয়া রয়েছে রাশিকৃত শাড়ি, জামা সায়া! নির্দোষ ওই জড়বস্তুগুলো যেন একটা পাপের ইশারার মত কটাক্ষ হানছে।

সুধীর কি অতি চালাকী করতে যাবে? তারপর?

তিন বছর অথবা আরো অনেকগুলো বছর ঘানি টানবে?

আপন চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন সুধীরের কানে হঠাৎ একটা নরম গলার বিস্ময় প্রশ্ন এসে ধাক্কা মারে।

'ওমা! এ মানুষ কোথায় হাওয়া! মা এদিকে ভোগের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে—'

এ গলা কার? সুধীর ফিরে দাঁড়াল। দেখতে পেল সেই 'তাল' করে খোঁপা বাঁধা শ্যামলা গাঁইয়া মেয়েটা! মেয়েটা দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একখানা বড়সড় থালা নিয়ে।

একে কি 'আপনি' বলতে যাবে সুধীর? অন্যদিকে 'বাবু' বলার মত? নাকি স্রেফ বুক জোর করে তুমিই বলবে? তুমি, তুমিই ঠিক। মনে হচ্ছে তো দাসাবাঁদী শ্রেণীর। কুড়িয়ে পাওয়া পথের মেয়ে। অতএব বলে ফেলা চলে, 'এত সব কি?'

'ভোগের পেসাদ। মা পাঠিয়ে দিলেন, খেয়ে নাও।'

সুধীর ঘরে এসে চেয়ারে বসে। মেয়েটা থালাটা নামিয়ে দেয়।

ঝকঝকে করে মাজা পিতলের থালা, তার উপর একগোছা লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা, গোটা দুই রসগোল্লা, আর কালো পাথরের বাটিতে এক বাটি ক্ষীর।

সুধীর মনে মনে বলে, 'জ্ঞানের' কথা মিথ্যে—একথা আর বলতে পারা যাচ্ছে কই? কাল থেকেই তো ভাগ্য খুলে গেছে দেখছি! লুচি, রসগোল্লা, ক্ষীর, জগতে এসব বস্তুগুলো আছে! তবু মুখে বলে ওঠে, 'এই এত সব খেতে পারে মানুষ?'

ঊর্মিলা অম্লান বদনে বলে, 'শোন কথা! পারবে না কেন? আমি তো এর ডবল খাই।'

সুধীর কৌতুক অনুভব করে। নেহাৎ দাসী শ্রেণীর মনে হয় না মেয়েটাকে। সরল! গ্রাম্য!

হেসে বলে, 'সবাই যদি তোমার মত না হতে পারে? তা ছাড়া এটা কি খাবার সময়? সবে তো ন'টা বেজেছে।'

'তা বললে কি হবে, সারাটা দিন তো অন্ন জুটবে না। অন্য ড্রাইভার হলে রাস্তায় হোটেলে-মোটেলে খেয়ে নিত, আপনি ভদ্দরলোক যদি তা না খাও, তাই মা বলল—'ভোগের পেসাদটা দিয়ে আয় ঊর্মি!' মা বেরোবে বলে সকাল সকাল ভোগ দিয়ে সেরেছে তো।'

সুধীর ওর কথায় আর এক দফা হেসে ফেলে। হেসে বলে, 'তা তো সেরেছেন! কিন্তু তোমার মায়ের নিজের কী হবে? 'পেসাদ' তো চলে গেল—'

ঊর্মি সহসা গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'মা যেখানে যাচ্ছে, সেখানে মায়ের মা আছে, পিসি আছে, তাদের কাছে খাবে। না খাইয়ে ছাড়ে না তারা।'

নাঃ সন্দেহের আর কিছু নেই। সুধীর ভাবে, এই উদ্ঘাটিত সূত্রের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুধীর কি শুধু অজ্ঞ অবোধের ভান করে যাবে? প্রশ্ন করবে না—কুসুম বিশ্বাস ব্যাধিগ্রস্ত কিনা?

চেষ্টা করেছিল, বার বার প্রশ্ন করতে চেষ্টা করেছিল সুধীর, পারেনি। যদি দপ্ করে জ্বলে ওঠেন কনকলতা! অথবা যদি প্রশ্ন করে বসেন হঠাৎ—এ সন্দেহের কারণ কী? কোন ধরনের সূত্র থেকে তোমার এই ধারণা?—উত্তর দেওয়া যাবে না। অতএব প্রশ্নটাই থাক।

কিন্তু 'কুমির দিদি' নিজেই কি অনেক কিছু সন্দেহ করছে না? সন্দেহ করছে না—কুমি রঙে থাকে, কুমি কোন বায়না করে!

সেদিনের পর আরো অনেকদিন গেছে, সুধীর নিত্য নিয়মে আসে, দেখে-শোনে, কারো কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে কিনা জিগ্যেস করে, ঠাকুরের প্রসাদ খায়, বিদায় নেয়।

হ্যাঁ, প্রসাদটা নিত্য বরাদ্দ।

নিত্য অবশ্য ক্ষীর লুচি নয়, ফলমূল মিষ্টি। কিন্তু না খাইয়ে ছাড়েন না কনকলতা। ওজর আপত্তি মানেন না। সেদিনও মানেননি, সেই বর্ধমানের গ্রামে যাবার দিন। উর্মিলার অনুরোধ গায়ে না মেখে হাত গুটিয়ে বসেছিল সুধীর, কনকলতা এসে গম্ভীর মুখের ভান করে বলেছিলেন, 'তোমার সাহেব তোমাকে হুকুম দিয়েছে না আমার সব নির্দেশ মানতে হবে? তবে এটা কী হচ্ছে?'

সুধীর মৃদু হেসে বলে, 'সে হুকুমটা কাজ সম্পর্কে।'

'সেটা আমি বুঝব। কোন্‌টা কাজ আর কোন্‌টা অ-কাজ সে আমি বুঝব। এখন নির্দেশ হচ্ছে খেয়ে নাও। তাড়াতাড়িই খেয়ে নাও। বেরোতে দেরী হলে ফিরতে দেরী হবে।'

সুধীর গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'তাছাড়া আপনাকে তো দিয়ে তবে খেতে হবে।'

কনকলতা ভুরু কোঁচকান। বলেন, 'আমার সম্বন্ধে এত তথ্য জানলে কি করে? কৌতূহল খুব প্রবল বুঝি?'

সুধীর থালা টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসে বলে, 'মোটেই না। তথ্য নিজে কানে এসে ঢোকে।'

'হুঁ! এর উত্তর পরে দেব।'

সুধীর কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ উর্মিলা বলে ওঠে, 'মা বার বার আমায় ভোগা দিয়ে দিয়েই ভুলিয়ে রাখল, একবারও দেশে নিয়ে গেল না! মাসে মাসে যায়, অথচ—'

কনকলতা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছিলেন, 'তা সত্যি! তোকে খুব ঠকাচ্ছি! তবে নয় আজই চল।'

'হুঁ, ঠাট্টা হচ্ছে! এক্ষুনি বেরোচ্ছ তোমরা—'

'তুইও এক্ষুনি বেরোবি। যা একটা ফর্সা শাড়ী পরে আয়।'

উর্মিলা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, 'এই বেশ আছে। রেলগাড়ী তো চড়ছি না। ডুরে শাড়ীতে ময়লা বোঝায় না।'

'না না, তা হোক্—' কনকলতা জোর দেন। অর্থাৎ তাকে যেন একটু সরাতেই চান।

উর্মিলা চলে গেলে সহসাই কঠিন দেখায় কনকলতার মুখ। আর গলার স্বরটাও কঠোর শোনায়: 'আর কি কি বলেছেন, তোমার মেম সাহেব?'

সুধীর চকিত হয়ে উঠে বলে, 'কী বলছেন?'

'বলছি তোমার মেম সাহেব তোমায় কী কী গল্প শুনিয়েছেন?'

সুধীর মৃদুস্বরে বলে, 'বোধহয় তাঁর ছেলেবেলার গল্প।'

'তাই মনে হচ্ছে। তা শুধু গল্পই শুনিয়েছেন? আর কোনও বায়না করেননি?' কনকলতার কণ্ঠ তীব্র, তীক্ষ্ণ, রূঢ়।

সুধীর কেঁপে ওঠে। কথা চাপা দেয়। বলে, 'আর কি বলবেন?'

'কিচ্ছু বলেননি?'

'মনে করতে পারছি না তো। কেন এ কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ। পরে পারবে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু শোনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে পার।'

সুধীর মনে মনে বলে সেই ভয়ঙ্করের ঝাপটে তো সারারাত ঘুমোইনি কাল। বলে, তুমি তাহলে সবই জান, সব খবরই রাখ, হিত উপদেশ দিতে পার না কেন তবে বোনকে? ওই ভয়ঙ্করের আকর্ষণেই হয়ত কাজটা ছাড়ব প্রতিজ্ঞা করেও ছাড়লাম না আমি, তাই তোমায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছি বর্ধমান জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে, তোমার গোপালঠাকুরের প্রসাদ খাচ্ছি বসে বসে! মনে মনে বলছে।

মুখে কি বলত কে জানে, হঠাৎ খুব একটা হাসির শব্দে চমক লাগল দু'জনেরই। পাটভাঙা একটা শাড়ী জড়িয়ে সাজসজ্জা সেরে চলে এসেছে উর্মিলা। আর হাসির ঝরণা বইয়ে বলছে, 'এই নাকি ভদ্রলোকের খিদে ছিল না! বলা হচ্ছিল এত খাওয়া মানুষে খেতে পারে! এখন? এখন কি হল? পাতে যে পিঁপড়ে কেঁদে যাচ্ছে!'

সুধীর অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে পাতের দিকে তাকায়। সত্যিই বটে অন্যমনস্ক হয়ে কখন যে সব খেয়ে নিয়েছে! ছি ছি!

কনকলতাও ক্ষণপূর্বের কাঠিন্য ত্যাগ করে হেসে ওঠেন। 'কী সর্বনেশে মেয়ে রে তুই, উর্মি! ওই রকম করে বলে ভদ্রলোকের ছেলেকে? নাঃ, তুই আর কোনদিনও সভ্য হবি না। নে, চল চল।'

উর্মিই সেদিন বাঁচিয়েছিল।

আর আশ্চর্যের বিষয়, কনকলতাও আর কোনদিন 'মেম সাহেবের' প্রসঙ্গ তোলেননি। বরং গাড়ীতে অনেকগুলো মাইল রাস্তা যেতে যেতে অনেক হাসিখুশি ভরা ছেলেমানুষী প্রশ্ন করেছিলেন সুধীরকে।

'আচ্ছা বল তো, ওই যে পাখীটা ডাকছে, ওটা কী পাখী? আচ্ছা

ওই যে গাছটায় ফুল ধরে রয়েছে, ওটা কী গাছ? হুঁ : বলতে আর হয় না, কলকাতার ছেলেরা তো ধান গাছে তক্তা বানাতে চায়।'

কনকলতা যেন উর্মির বয়সী।

ওঁর ওই হাল্‌কা ভঙ্গীর কথা শুনতে শুনতে সাহস পেয়ে সুধীর বলে উঠেছিল এক সময়, 'দেখুন, একটা প্রশ্ন আমাকে করতে দেবেন?'

কনকলতা হেসে ওঠেন, 'অনুমতি না নিয়েই তো এই একটা প্রশ্ন করে ফেললে!'

'না, ও রকম না। বলছি—তখন আপনি যেভাবে যত্ন করে খাওয়ালেন আমাকে, এখন যেভাবে সহজ মনে কথা বলছেন, এটা কি আপনি সব ক্ষেত্রেই করে থাকেন? আপনাদের গাড়ীর যে কোন ড্রাইভারকেই—'

কনকলতা গালে হাত দেন, 'হায় কপাল, ড্রাইভার আমি আবার পেলাম কখন? ড্রাইভার বলতে তো তোমাদের বিশ্বাস সাহেব। আমাকে মাস মাস ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আর ফিরিয়ে আনার দায় তো ওঁরই ছিল। এতদিনে একটু ছুটি পেল লোকটা!'

সুধীর অবাক হয়ে বলে, 'ড্রাইভার কি ছিল না আগে?'

'তা ছিল।' কনকলতা মুচকে হাসেন: 'বোধকরি মনের মতনটি ছিল না। তাই—আরে আরে, আর সোজা নয়, এইবার ডাইনে মোড় নাও। খানিকটা গিয়ে একটা পেট্রল পাম্প পাবে, তার পাশ দিয়েই—'

নির্দেশমত মোড় নিয়ে সুধীর আস্তে আস্তে বলে, 'আমার কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য লাগছে, মিসেস বিশ্বাসের ব্যবহার, আপনার ব্যবহার, একেবারে অপ্রত্যাশিত। ইতিপূর্বে আমি যেখানে কাজ করেছি, তাঁরা ঘর-ঝাড়া চাকরের থেকে খুব বেশী তফাতের দৃষ্টিতে দেখতেন না আমাকে।'

কনকলতা হেসে বলেন, 'মহৎ ব্যক্তিরা সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট টিউটারকেও বাসনমাজা চাকরের থেকে তফাতের দৃষ্টিতে দেখেন না। ওটা দৃষ্টির গুণ।'

সুধীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'এখানে এসে পর্যন্ত অদ্ভুত একটা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়েছি আমি! কোন সময় মনে হচ্ছে খুব সৌভাগ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, কোন সময় মনে হচ্ছে ভীষণ একটা বিপদের মুখোমুখি।'

কনকলতার কণ্ঠস্বরটা স্নিগ্ধ শোনায়।

কনকলতা বলেন, 'বিশ্বাস সাহেব নামের মানুষটাকে ঠিক বুঝতে পারলে হয়ত এই দ্বন্দ্বটা ঘুচবে। তবে এদের মত লোককে বোঝা একটু শক্ত। মজা এই, ইনি অথবা এঁদের মত লোকেরা এমন একটা পথে গিয়ে পড়েন যে, সে পথে তাঁরা ভদ্রলোকের দেখা পান না, সৎ সরল বিশ্বাসী নির্লোভ মানুষ তাঁদের কাছে আকাশকুসুমের মত। তাই তেমন একটা অভিনব বস্তু চোখে পড়লে—থাম থাম, একটু পিছিয়ে নাও—রাস্তাটা ছেড়ে এলাম!' ছাড়া রাস্তাটা আবার ধরল সুধীর।

তবে রাস্তা নির্ভুল হলেও কনকলতার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত গাড়ী গেল না। যায় না। পাড়াগাঁয়ের পুকুর পাড়ের এবড়ো খেবড়ো সরু রাস্তা, বলতে গেলে রাস্তাই নয়। তাই কোন একখানে নামিয়ে দিতে হল তাঁকে।

হেসে বললেন, 'দেখছ তো? রাস্তাই নেই। তাই তো পীচঢালা বড়রাস্তার দিকে ছুটছি আমরা সবাই মিলে। আর আমার তো কথাই নেই। পায়েচলা পথটুকুও মুছে গিয়েছিল। ছিল শুধু ওই পুকুর। পচা পানাপুকুর।...আয় উর্মি!'

সেই পানাপুকুরের পাশ দিয়েই একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি উর্মিলার হাত ধরে।

তা সেদিনের পর অনেকদিন গেছে। নিত্য হাজরে দেওয়া ছাড়া কোন কাজ দেখতে পাচ্ছে না সুধীর। অথচ সেটা দিতে হচ্ছে।

এদিকে সুরু হয়েছে ওই ভয়। জানলার নীচের ওই ভয়। কিন্তু বিশ্বাস সাহেব? তিনি কোথায়? তিনি কি মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন? তা সাময়িকভাবে বটে।

বিশ্বাস সাহেব কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য পাঞ্জাবে গেছেন। কী সেই বিশেষ প্রয়োজন, কতদিন লাগবে সে প্রয়োজন মিটতে, তা কেউ জানে না। সুধীরকে শুধু বলে গেছেন. এর মধ্যে যেন আবার মেজাজ দেখিয়ে কাজটা ছেড়ে বস না।...

কিন্তু অনাদি বিট্‌কেল হাসি হেসে বলে, 'জানি বাবা, জেনেছি। সাহেবের বারটা বেজে এসেছে।...ওই আলতার কারখানায় এবার লালবাতি জ্বলবে।'

সুধীর অবশ্য লালবাতির চিহ্ন দেখতে পায় না। অনবরতই তো প্যাকিং বাক্সে পেরেক ঠোকার কর্ণবিদারী ধ্বনি উঠছে কারখানা থেকে, উঠছে আরো বহুবিধ শব্দ। আর বড়রাস্তা দিয়ে ঘুরে ওদিকে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই বাক্স বোঝাই হচ্ছে লরীতে।

ম্যানেজার নামে পরিচিত লোকটা কুলিগুলোকে অকারণ কুৎসিত গালাগাল পাড়ে, আর অনাদি গিয়ে দাঁড়ালেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকায়। সবই তো যথাযথ।

যা কিছু উল্টোপাল্টা শুধু সুধীরের জীবনেই এসে হাজির হয়েছে। গরীব-গেরস্ত ঘরের ছেলে সুধীরের নিস্তরঙ্গ জীবনে। দারিদ্র্য ছাড়া আর কোন পীড়া ছিল না সুধীরের। বিশ্বাস সাহেবের গাড়ী চালাতে এসে পীড়ার পাথারে পড়ে গেছে।

তবু আজকের ঘটনাটা বুঝি দুঃস্বপ্নেও ছিল না।

আজ গাড়ী তুলে রেখে চলে আসবার সময় প্রতিদিনের মত যে কাগজের গুলিটা এসে সুধীরের গায়ে পড়ে পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল, সেটা প্রতিদিনের মত নয়। সেই কাগজের গুলির মধ্যে আরও একটা গুলি। না, বন্দুকের গুলি নয়। কিন্তু সুধীরের মনে হল,

তাঁর থেকে কম মারাত্মকও নয়। চোস্ত করে বিছিয়ে ধরতেই ধরা পড়ল, সেটা একখানা একশো টাকার নোট !

আর লেখার লাইনটা ? সে লাইনটা হচ্ছে—'বিশেষ দরকার, একবার অন্ততঃ দেখা কর !'

নোটখানার উল্লেখ নেই। কিন্তু কী এটা ? ঘুষ ? না পেয়াদা ? নিশ্চিত বুঝে ফেলেছে—এটা ফেরত দেবার জন্যও অন্ততঃ আসবে সুধীর। ফেরত দিতে। তিরস্কার করতে।

কিন্তু সুধীর কেন এই ফাঁদে পড়তে যাবে ? সুধীর তো ওই জানলাটা দিয়েই ফের ফেলে দিতে পারে নোটখানা। পারত, অনায়াসেই পারত। তবু নোটখানা যেন পকেটের মধ্যে পুঁতে রইল। আর সুধীর তার মনকে চোখ ঠারল, 'ঠিক আছে, দেখাই করব একবার। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়ার দরকার।'

তবু তো নোটটা রইল পকেটে ! ঘণ্টাকতক থাকবে। সন্ধ্যার আগে সুবিধা হবে না আসবার। কিন্তু সে সন্ধ্যায় সুবিধা হল না।

সে সন্ধ্যায় সুধীরের অসহ্য মাথা ধরল। সুধীর বেরোতে পারল না।

অমিতা বলল, 'শার্ট পরেই শুয়েছ দাদা, শরীরটা কি বেশী খারাপ লাগছে ?'

সুধীর বলল, 'সামান্য শীত শীত করছে।'

সুধীর মিথ্যা কথাই বলল। শীত করছিল না তার, গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তবু শার্ট ছাড়ল না। শার্ট ছাড়লে শার্টের পকেটটা তো ঝুলে থাকবে আলনায়। সেই বিশ্রী জিনিসটা পকেট ছাড়া কোথায় রাখবে সুধীর ? বিছানার তলায় ? তাকের উপর বইয়ের খাঁজে ? বাবার আমলের টেবিলটার চাবিহীন ড্রয়ারটায় ?

ঠিক এই মুহূর্তে কোনখানটায় কার দরকার পড়বে সুধীর জানে ? জানে কি কার হাত পড়বে ঠিক সেইখানটায়। আর ওই একশো টাকার নোটখানা কার হাতে ছোবল দেবে ? কিন্তু ছোবল কি আরও নানা মূর্তিতে আসে না ? সুধীরদের মত হতভাগাদের জীবনে ?

মাথাধরার যন্ত্রণায় বীরেশকে 'এ্যানাসিন' আনতে দিয়েছিল সুধীর, আর বোধকরি অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘর অন্ধকার করার দরুন, অথবা মানসিক ক্লান্তির দরুন, আচ্ছন্ন-করা সেই ঘুমটা হয়তো গভীর হয়েছিল। ভেঙে গেল উমাশশীর তীব্র মন্তব্যে।

ঘরের দরজার বাইরেই রয়েছেন উমাশশী। বলছেন বীরেশকে, 'তা তো আনতে দেবেই! বড় মানুষের মাথা! সে মাথা একটু ধরলেই মচ্‌মচিয়ে পয়সা খরচ করে ওষুধ আসে! আর—শ্যামলটা আজ দশদিন ধরে পেটের অসুখে ভুগছে, এক পয়সার ওষুধ পড়ল না পেটে!'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সুধীর। দেখল শার্টটা সব ঘামে ভিজে গেছে। শার্টের পকেটটা? সুধীরের ঘুমের অবকাশে কেউ সেটাকে শূন্য করে দেয়নি তো? নাঃ, ঠিক আছে। শুধু ঠিক নেই সুধীরের জগৎ! অথচ পকেট থেকে ওই সাপটাকে বার করে মায়ের হাতে তুলে দিলে এখুনি ঠিক হয়ে যায় সব।

সুধীর তো অভাবগ্রস্ত, তবে আবার সুধীরের পাপ-পুণ্য কিসের? ভদ্রতা সভ্যতা রুচি অরুচি কি?

সুধীর তো সেদিনই সঙ্কল্প করে ফেলেছে, টাকা দিয়ে মাতৃস্নেহ কিনতে পাওয়া যায় কিনা দেখবে একবার। অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুধীর। মার সামনে দাঁড়াল। পকেট থেকে নোটটা বার করে মায়ের দিকে এগিয়ে ধরে ভূতাহতের গলায় বলে উঠল, 'মা, এটা রাখ।'

মা সর্পাহতের গলায় চমকে ওঠেন: 'কী? কী এটা?'

'একশো টাকার নোট। বাড়তি কিছু রোজগার হয়েছে।'

আবার অন্ধকারটায় ঢুকে এল সুধীর।

সকালবেলা অমিতা এসে ঘরে ঢুকল। জেগে ছিল সুধীর, চোখের উপর হাতচাপা দিয়ে পড়ে ছিল। এটা ঘুমের ভঙ্গী নয়, তাই

ফিরে গেল না অমিতা। বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়ে বিনা ভূমিকায় তীব্র প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ বাড়তি অতগুলো টাকা পেলে কোথায়, দাদা ?'

সুধীর চোখ থেকে হাত না তুলেই উত্তর দিল, 'ধরে নে তোদের ভগবান দিয়েছে!'

'ভগবান, না শয়তান ?'

'তা সেটা বললেই বোধহয় ঠিক হবে।'

'দাদা!'

'কী রে ?'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে আত্মাকে বেচে খাওয়াই ঠিক করলে ?'

সুধীর উঠে বসল। আলস্যভাঙার একটা ভঙ্গী করে নিয়ে বলল, 'বেচে খাবার মত একটা জিনিসও যে ছিল, তাই ভেবেই আনন্দ কর!'

'আনন্দটা তোমার মাকে করতে বলগে, দাদা!'

সুধীর তিক্ত একটু হাসে। বলে, 'সেটা বলতে হবে না। ছেলের সুমতি হয়েছে ভেবে এতক্ষণে হয়ত কোথাও পুজো চড়াতে গেছেন।'

'মায়ের ওপর অভিমান করে নিজেকে নষ্ট করবে তুমি, দাদা ?'

'ওটা কোন কথাই নয়। বরং বলতে পারা যায়, নিজের ওপর আক্রোশ করে। কিন্তু পৃথিবীর তাতে কি এল গেল বলতে পারিস, অমিতা ? কী ক্ষতি হবে জগতের, যদি সুধীর ড্রাইভার তার আত্মাকে বেচে পেট চালায় ?'

'এই যুক্তিটাই খাড়া করলে তাহলে ?'

সুধীর অমিতার ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকায়, তারপর বলে, 'নিজেকে খাড়া রাখবার আর কোন উপায় যখন পাওয়া যাচ্ছে না—'

'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—'

'অমিতা, খাড়া করা যুক্তি নয়। একটা নতুন জীবনদর্শন গ্রহণ করছি।...ভেবে দেখলাম, এতটা স্বার্থপর হওয়া অপরাধ ?'

'স্বার্থপর ?'

'তাছাড়া কি ? আমি সৎ থাকব 'অনেস্ট' থাকব, আমার স্বর্গীয়

আত্মাকে সুশুভ্র রাখব, আর আমার মা ভাই কেবলমাত্র অভাবের তাড়নায় আত্মাকে ধ্বংস করতে থাকবে, এটা শুধু অপরাধ নয়, পাপ! এইটাই আমার বর্তমানের জীবনদর্শন।'

যাক্ দর্শনটা বেশ উচ্চমানেরই হয়েছে!'

'খুব রেগে গিয়েছিস মনে হচ্ছে! আমি তো ক্রমশঃ ঝেড়ে ফেলছি। রাত্রে মনে হচ্ছিল, সমস্ত হিমালয় পাহাড়টা আমার মাথার মধ্যে, আজ সকালে দেখছি পালকের মত হাল্কা লাগছে!'

'যাক, ভালই হয়েছে, আমারও কাজ হালকা হয়ে গেল। এবার স্বস্তি করে কমলা হোস্টেলে গিয়ে থাকতে পারব।' রেগে রেগে বলে অমিতা।

সুধীর বলে, 'বস। শোন তাহলে। বিশ্বাস কর, টাকাটা কুড়ান টাকা! পথে চলতে চলতে দেখি পায়ের কাছে পড়ে—'

'এ ভাঁওতা তুমি মাকে দিও, দাদা!'

'যদি বলি ভাঁওতা নয়—'

'তাহলে মানতেই হবে ব্রতকথার গল্প এ যুগেও সত্যি হয়।'

সুধীর বলে, 'ব্রতকথা সত্যি হয় কিনা জানি না। তবে টাকার কথাটা সত্যি হয়েছে। পথে কুড়িয়ে পাওয়া! তবে আশঙ্কা হচ্ছে, হয়ত এখন মাঝে-মাঝেই এমন কুড়িয়ে পাওয়া যাবে!'

'একশো টাকার নোটের হরিরলুঠটা দিচ্ছে কে, দাদা?'

'যাদের সে সামর্থ্য থাকে, তাদেরই কেউ একজন।'

'সামর্থ্য যাদের থাকে, তারা কিন্তু বিনা স্বার্থে একটা পয়সাও খরচ করে না।' অমিতা বলে।

'তা স্বার্থচিন্তা হয়ত কিছু আছে তার।'

'কিন্তু জানবে দাদা, এটা লোভ দেখান! তোমার ওই ঘুঘু বিশ্বাস সাহেব ঠিক জানে, ভয়ানক অভাব-গ্রস্তের সামনে—'

'বিশ্বাস সাহেব নয়, অমিতা! বিশ্বাস মেম!'

'কী? কী বললে?'

'ওই যা বললাম।'

অমিতা চৌকির একধারে বসে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'দাদা, সব কথা আমায় খুলে বলতে হবে!'

'খুলে বলতে হবে! কিন্তু সব কথা কি খুলে বলা যায়? বোনকে তো নয়ই, একান্ত বন্ধুকেই কি বলা যায়? অথবা বিবাহিতা স্ত্রীকেও? যায় না। যেখানে অন্য কোন মেয়ের সম্ভ্রমের প্রশ্ন, সেখানে কিছুতেই কারো সামনে উদ্ঘাটিত করা যায় না, তার সেই দুর্বলতার কথা। তাছাড়া—উচ্চারণই কি করা যায়? মিসেস বিশ্বাস পাগল তাই!

পাগল, অথচ গারদে বন্দী নয়, এদের নিয়েই বড় ভয়। এরাই বেশী অনিষ্টকারী। কিন্তু বিশ্বাস সাহেবের মনস্তত্ত্বটা কি? স্ত্রীর প্রতি রাগ নেই কেন? শাসন নেই কেন?'

যতটা খুলে বলতে পারা যায়, বলে অমিতাকে। সব শুনে অমিতা ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'দাদা, পুলিশে খবর দাও তুমি!'

'তার উত্তর তো আগেই দিয়ে দিয়েছেন বিশ্বাস সাহেব, শুনলি তো?'

'হোক। চিরদিনই কিন্তু পাপের জয় হয় না—'

হো হো করে হেসে ওঠে সুধীর। হেসে উঠে বলে, 'তোর মতবাদটা যে একেবারে প্রপিতামহীর আমলের রে! লোকে শুনলে গায়ে ধুলো দেবে।'

'লোকের দেওয়া ধুলো গায়ে লেগে থাকে না দাদা, নিজের ওড়ান ধুলো ঢুকে চোখ বন্ধ না হয়ে যায়, সেটা দেখা দরকার। লোকটা ওইভাবে পাপের ব্যবসা করে চলবে, চোখে দেখে চুপ করে থাকবে তুমি?'

'শুধু চোখে দেখে চুপ করে কিরে? বরং তার সাহায্যে আসছি!'

'দাদা', উঠে দাঁড়ায় অমিতা, দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আমি তোমাকে এভাবে ধ্বংস হতে দেব না।'

'তুই? তুই কে রে, তুচ্ছ প্রাণী! তোর এ জোর করবার অধিকার? স্বয়ং মা চাইছেন!'

'মাকে খুশি করার জন্যে তুমি মানুষ খুন করতে পার?'

সুধীর আস্তে বলে, 'ঠিক মাকে খুশি করার জন্যে নয় অমিতা! সে কথা বললে, মায়ের আমার তু'জনের প্রতিই অবিচার করা হবে। নিজের মনও বুঝছি। দেখছি বড়লোক একবার হতেই হবে আমাকে! বড়লোক হবার লোভই আমাকে বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে আটকে রেখেছে! নইলে—যেদিন থেকে চাকরী নিয়েছি, সেদিন থেকেই তো রোজ ভেবে আসছি ছেড়ে দিই চাকরী! পারছি না কেন? ওই আশা!'

'বড়লোক। বড়লোক হয়ে কি হবে?'

'অমিতা!' হেসে ওঠে সুধীর, 'মিসেস বিশ্বাসকে বরং পাগলা-গারদের বাইরে রাখা চলে, তোকে নয়!'

'ঠাট্টা করতে পার দাদা, কিন্তু ভেবে দেখেছ তোমার বড়লোক বিশ্বাস সাহেবের অবস্থা! খুব সুখী বলে মনে হচ্ছে?'

সুধীরও বিছানা ছেড়ে উঠেছে।

ঘরের মেজের দেড় হাত জমিটুকুতে পায়চারি করতে করতে বলে, 'হচ্ছে না! তবু টাকা জিনিসটাকে একবার দেখার মত দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। 'অভাব' জিনিসটা সংসার থেকে ঝেঁটিয়ে ধুয়ে সাফ করে বিদায় করে দিয়ে নিবৃত্ত হতে চাই!'

অমিতাও হেসে ওঠে, 'তোমাকেও গারদের বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। নিবৃত্ত হতে দেখেছ কাউকে? ভাবতে দেখেছ কাউকে, এত টাকা নিয়ে কী করব? টাকা বাড়িয়ে, শেষে সেই বাড়ান টাকাকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে বেড়ায়। নিরাপদে রেখে দেবার জন্যে দেয়ালে গর্ত খোঁড়ে। তবু বাড়িয়ে চলার জন্যে উন্মাদ হয়ে ছোটে। বেশ কিছু,

অনেক কিছু, টাকা হলেই তোমার মায়ের আশ মিটবে? ভাইদের সন্তোষ হবে? হবে না।···তবে কেন তুমি—'

'অমিতা থাম! নীতিবাগীশের ধর্ম-বক্তৃতা ঝাড়তে আসিসনে! সংকল্পে স্থির থাকতে দে!···জীবনে একবারও অন্ততঃ গাড়ীর মালিক হয়ে গাড়ী চালাতে চাই, ড্রাইভারের পরিচয় লাথি মেরে দূর করে দিয়ে। তারপর সেই গাড়ী চাপা পড়ে মরতে হয় মরব!'

'মরবে!'

মরীয়াকে সংকল্পচ্যুত করতে কে পারে? হয়ত এই মরীয়া হয়ে ওঠাটা আরো এগিয়ে আনল অমিতার ধর্মবক্তৃতা! ঠিক করল কোন কিছুতে পিছপা হব না! মরি মরব, চূর্ণ হই হব!

মায়ের সামনে দাঁড়াল সুধীর চায়ের জন্য!

যেতে মাত্রই চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন উমাশশী। বাজারে কেনা ছোট দুটি রসগোল্লা আর দু'খানা নিমকি। সুধীরদের বাড়ীতে দোকানের খাবার! অভূতপূর্ব ঘটনা।

সুধীর প্লেটটা ঠেলে রেখে বলে, 'এসব আবার আনতে গেলে কেন, মা? লাগবে না।'

উমাশশী নরম গলায় বলেন, 'খা-না বাপু! বাড়ীতে জলখাবার খাওয়া তো উঠেই গেছে! আমারও তো ইচ্ছে হয়—'

ইচ্ছে হয়!

সত্যিই হয়ত ইচ্ছে হয় উমাশশীর। তবু উমাশশীর ওই নরম গলায় ইচ্ছে প্রকাশটা যেন একটা নির্লজ্জ ধৃষ্টতার মত লাগে।

সুধীর মায়ের সেই নরম মুখের দিকে তাকাতে পারে না। বলে, 'আমার তো খাওয়ার অভাব নেই। এখুনি মনিব বাড়ি গিয়ে জুটে যাবে রাজসই জলযোগ। ওটা রেখে দাও বীরেশদের জন্যে।

আস্তে ডিসটা সরিয়ে রাখেন উমাশশী ক্ষুণ্নভাবে। টাকা দিয়ে মাতৃস্নেহও কেনা যায় বৈকি! শুধু সে স্নেহের প্রকাশটা দৈন্যে ভরা হয়ে ওঠে।

একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়ে বিচলিত হয়েছিলেন উমাশশী, ভেবেছিলেন ছেলের উপর এতটা রূঢ় হওয়া হয়তো ভাল দেখায়নি, উচিত হয়নি। তাই আজ আনাকতক পয়সা দমকা খরচ করে ফেলেছিলেন তার জন্য। পয়সাটা বাজে খরচ হল। অথচ আশ্চর্য, আজ আর খুশির সঙ্গে মনে হল না উমাশশীর—যাক্, বীরেশ শ্যামল খাবে। মনে হল না। বরং নিজেকে কেমন যেন অপমানিত মনে হতে লাগল।

মিসেস বিশ্বাসের তীর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বিষ তীর! একশো টাকার নোটের চেহারা নিয়ে।

সুধীর বেশ একটা হিংস্র আমোদ অনুভব করছে। দেখা যাক্ না, কত হরিরলুঠ ছড়াতে পারে। সাহেব এসে পড়ার সময় হয়ে এল, হোক না তার মধ্যে কিছু প্রাপ্তি। দু'একদিন ছাড়া একখানা করে একশো টাকার নোট উমাশশীর হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে যে উল্লাস, সেও তো এক রকম হিংস্র উল্লাসই। এই হিংস্র উল্লাসে মজে আছে সুধীর।

উমাশশী একেবারে চুপ। বড় বেশী চুপ! চুপ আর ভীরু ভীরু। 'কোথায় পাচ্ছিস এত টাকা?' একথা বলতে সাহস করছেন না।

সুধীর হিসাব করে আজকেরটা নিয়ে ছ'টা হল! আজকেরটা নিয়ে সাতটা!

উমাশশীর জীবনে মস্ত বড় একটা ভূমিকম্প!

কিন্তু ওই চোখ! ওই ভয়ের চোখের কাছ থেকে কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে সুধীর নিজেকে? আজ সেই ভয়ের চোখ কথা কয়ে ওঠে, 'এত অহঙ্কার কেন? একবার এলে কি হয়?'

চিঠি নয়, কথা।

সুধীর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে, ধারে কাছে অনাদি নেই তো? নেই অন্য কারুর কান? নেই।

এদিকটায় কারো আসার কোন দরকার হয় না। গলির এই শেষ সীমান্তে গ্যারেজের মুখে !

'কি বলতে চান বলুন !' ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলে ওঠে সুধীর। মিসেস বিশ্বাস, যাঁর নাম নাকি কুমু, চকিত দৃষ্টিতে তাকান। বলেন, 'বসবে তো একটু ?'

'দাঁড়িয়ে শুনলাম বা !'

আজ আর মিসেস বিশ্বাসের সেই বাহারী-সাজের ঘটা নেই। সাজটা সাদাসিধে আটপৌরে ধরনের। চুলগুলো রুক্ষু রুক্ষু, মুখে নেই প্রসাধনের প্রলেপ। বর্ধমানের কোন একটা গ্রামের পথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে হয়ত বেমানান দেখাবে না। দেখে একটু যেন মায়াই আসে। বলেন, 'এত ভয় কেন ?'

সুধীর গম্ভীর মুখে বলে, 'ভয়ের কি কোন কারণই ঘটেনি ?'

'অপর কেউ হলে পরমভাগ্য বলে মনে করত !' বলেন মিসেস বিশ্বাস, 'কিন্তু মজা কি জান ? তেমন লোককে ঘৃণা আসে।'

'দয়া করে আর কিছু বলুন।'

'বলছি, তোমার প্রকৃতির সঙ্গে ওই টাকা নেওয়াটা কিন্তু অঙ্কে মিলছে না।'

'অমিলের কি আছে ? আমি অভাবগ্রস্ত, আমার মা শুধু ওই অভাবের তাড়নায় মনুষ্যত্ব হারাচ্ছেন, আমার ভাইরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার সামনে টাকার প্রলোভন এলে স্বভাব নষ্ট হওয়াটা তো স্বাভাবিক !'

মিসেস বিশ্বাস একটু বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বলেন, 'তোমার মাকে আমায় দেখাতে পার, সুধীর ?'

'লাভ নেই কিছু। সুখ পাবেন না।'

'তবে থাক! কিন্তু আর একটা কথা বলি—রোজ যেখানে যাও তুমি, সেখানে আমায় একদিন নিয়ে যেতে পার?'

'সাহেব এলে যাবেন!'

হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠেন মিসেস বিশ্বাস। বলেন, 'তোমার সাহেব এমন কোন অর্ডার দিয়ে গেছেন?'

'কি বলছেন?'

'বলছি সাহেবের অর্ডার আছে আমার হুকুম না মানবার!'

'আপনার সম্পর্কে কোন কিছুই বলে যাননি উনি।'

'ঠিক আছে, আমি হুকুম করছি আমাকে তোমাদের ওই সাঁতরাগাছির আশ্রমে নিয়ে চল।'

'বেশ, চলুন। হুকুম যখন, কবে যাবেন?' বলে সুধীর। ভাবে, সত্যিই তো, আমার কি! আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসব আমি। আমায় তো বারণ করে যাননি সাহেব। তাই বলে, 'কবে যাবেন?'

'আজ। আজই!'

'বেশ!'

'সুধীর! সুধীর। থাম থাম, গাড়ী থামাও তো একবার!'

'থামাব!' গাড়ীর গতি মন্দ করে নেয় সুধীর। 'কি হল?'

'আর একটু পিছিয়ে চল।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'একটা সাইনবোর্ড দেখলে?'

'দেখেছি। 'জানে'র বাড়ী তো?'

'দেখেছ? তুমিও দেখেছ? ওখানে আমায় একবার নিয়ে যেতে পারো?'

'যেতে চান চলুন।'

'তোমার বুঝি এসবে বিশ্বাস নেই?'

সুধীর গাড়ী পিছোতে পিছোতে বলে, 'আগে ছিল না বিশ্বাস, সম্প্রতি হয়েছে!'

'বিশ্বাস হয়েছে?'

কুসুম বিশ্বাস উত্তেজিত হল, 'গিয়েছিলে বুঝি?'

সুধীর নির্লিপ্ত স্বরে বলে, 'গিয়েছিলাম! বলেছিল—শীঘ্র বড়লোক হব! তারপর থেকেই রোজ একখানা করে একশো টাকার নোট কুড়িয়ে পাচ্ছি!'

কুসুম বিশ্বাস ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'কুড়িয়ে পেয়ে বড়লোক হওয়া যায় না।'

সুধীর কি চুপ করে যাবে? না, সুধীর এই সুযোগটা অবহেলা করবে না। করে না। গম্ভীরভাবে বলে, 'আপনি তো ভাবেন হওয়া যায়।'

কুসুম বিশ্বাসের মুখটা হঠাৎ সাদাটে দেখায়। তারপর রক্তোচ্ছাসে লাল হয়ে ওঠে। একটুক্ষণ পরে বলেন, 'তা নয়! তুমি ভুল ধারণা করেছ। 'বড়লোক' হবার জন্যে মরে যাচ্ছি না আমি। এটা হচ্ছে তোমাদের বিশ্বাস সাহেবের ওপর আমার চ্যালেঞ্জ! আমার দৃঢ় ধারণা ডাক্তারদের ঘুষ দিয়ে মিথ্যে কথা বলায় ও। আমি ওকে ওর এই জোচ্চুরীর সাজা দিতে চাই! মুখের মত জবাব দিতে চাই!'

সুধীর গাড়ীটা থামায়। বলে, 'বেশ তো, 'জ্ঞানের বাড়ি' গিয়েই জেনে আসুন আপনার ধারণাটা ভুল না ঠিক!'

'আজ থাক্!' মিসেস বিশ্বাস হতাশ গলায় বলেন, 'ও যে ঠিক বলবে, তাতেই বা বিশ্বাস কি?···পৃথিবীতে কাউকেই আমার বিশ্বাস হয় না সুধীর!'

পৃথিবীতে বিশ্বাস হারান এই রমণীকে কি ভালবাসবে সুধীর? পৃথিবীর উপর বিশ্বাস ফিরিয়ে দেবে ওর?···ভালবেসে বোঝাবে, শুধুমাত্র বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে হার-জিতের খেলায় জিততে গিয়ে,

তুমি তোমার জীবনের সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে ফেল না। জয়ের আনন্দ তোমাকে শান্তি দিতে পারবে না।...

সত্যই ভালবাসতে ইচ্ছে করছে ওই শান্তিভ্রষ্ট গ্রাম্য মেয়েটাকে। একদা যে শিউলিফুল কুড়িয়ে পাত্র বোঝাই করত। আর তারপরে জীবনের পাত্র বোঝাই করে তুলেছে পথের জঞ্জাল তুলে। কিন্তু না, বিশ্বাস সাহেবকে ও ভালবাসে, প্রচণ্ড ভালবাসে। তীব্র ঘৃণা মেশান সেই ভালবাসা ওকে কোনদিন অব্যাহতি দেবে না। ও বন্ধুত্ব চায়, সহানুভূতি চায়, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ চায়, প্রেমকে চাইবে না।

ওকে কি তবে বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে লড়াইয়ে জেতবার সাহায্যটাই করবে সুধীর? কিন্তু সুধীরের আজীবনের সঞ্চিত বিশ্বাস? সংস্কার? মূল্যবোধ? শুধু সুধীরের জীবনের নয়, তার পিতৃপিতামহের জীবনের! সে সঞ্চয় নষ্ট করবে সুধীর? শুধু একটু মমতায় পড়ে?

গাড়ী সেই করোগেটের টিনের গেটের সামনে দাঁড়াল।

দ্বারোয়ান গেট ঠেলে দিয়ে সেলাম করে সরে যেতে গিয়ে হঠাৎ সরে যেতে ভুলে গেল যেন। তারপর বড় করে সেলাম করে সরে দাঁড়াল।

'হঠাৎ কি এমন জরুরী অবস্থা ঘটল সুধীর?' কনকলতা বঙ্কিম হাসির সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'যার জন্যে মেমসাহেব স্বয়ং সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন? নাকি সাহেবের অনুপস্থিতিতে আশ্রমবাসীদের সুখ-দুঃখ দেখবার ডিউটি পালন করতে এলেন মেমসাহেব?'

মেমসাহেব!

ঊর্মিলা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। চেহারার ধারাটা ঠিক যেন এখানের মায়ের মত। তবে আরও রূপসী! বয়সটাও তো কাঁচা। তাছাড়া নাকি বাঁজা। বাঁজা মেয়েরা স্থির-যৌবনা হয়।

উর্মিলা শুনেছে সাহেবের ছেলেপুলে নেই। আহা, লোকটার এত টাকা কে খাবে তার ঠিক নেই!

'আশ্রম'সুদ্ধ মেয়েরাই উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। এখানে মেমসাহেবের পদার্পণ এই প্রথম! তা সে কথা মনে রেখেছেন মহিলাটি। প্রথম দর্শনের সুখ-স্মৃতি রাখতে ঝোড়া-ভর্তি করে সন্দেশ এনেছেন।

গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে রাখল দ্বারোয়ানটা।

সুধীর ততক্ষণে কনকলতার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বসেছেঃ 'কি করতে এসেছেন, উনিই জানেন, আর হয়তো আপনি জানেন। আমায় এনে পৌঁছে দেবার হুকুম হয়েছে, দিলাম।'

'বেশ! ভাল কথা!' কনক আর একবার মুচকি হাসেন, 'আসুন মেমসাহেব, ভেতরে আসুন! এ কী—এত সন্দেশ কিসের? ওঃ, ইতরজনের প্রাপ্য-পাওনা? ওরে, সবাই এসে দেখ্ দেখ্—মেমসাহেব তোদের মিষ্টি বিলোতে এসেছেন!'

কথা সাধারণ সহজ, ভঙ্গীটা তীব্র ব্যঙ্গের। উর্মিলা অবাক হয়। ভাবে, বাবাঃ, মায়ের যেন কাউকেই সমীহ নেই! মেমসাহেব এসেছেন, এই প্রথম এসেছেন, অথচ মা যেন—

কিন্তু কেউ কি কম যায়?

মেমসাহেবও ব্যঙ্গোক্তি করেন, 'তা এনে দেখছি বোকামিই করেছি। ভেবেছিলাম, আহা। গরীব দুঃখী দুঃস্থ আশ্রমবাসিনীরা সাত জন্মে ভাল-মন্দ কিছু খেতে পায় না, তবু দুটো ভাল ছানার সন্দেশ খেয়ে বাঁচবে। ওমা! এসে দেখছি মিষ্টিরই বাজার! ছানা চিনিরই ঢালাও কারবার! আহা, বেচারা সাহেব কোথায় গিয়ে পড়ে আছে। কে জানে কি ভোগ জুটছে আর না জুটছে! অথচ এদিকে এই মিষ্টির বাজার!'

'মেমসাহেবের কথাবার্তাগুলো তো বিশেষ সভ্য শহুরে নয়,' কনকলতা তীক্ষ্ণস্বরে বলেন, 'বড্ড গাঁইয়া গাঁইয়া! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বুঝি!'

যারা এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছিল তারা কনকলতার এই গায়ে-পড়া কোঁদলের নমুনা দেখে মনে মনে হাসে। ভাবে, হুঁ বাবা, যা সন্দেহ করি তা ঠিকই। যতই পূজোপাঠ কর আর থান পরে চুল কেটে অন্যের চোখ ভোলাও, আসল রহস্য ঠিকই বুঝি আমরা! নইলে মেমসাহেবকে দেখে হিংসায় ছটফটিয়ে ওঠ!

উর্মিলার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই উর্মিলা অবাক হয়। আর সুধীর একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দুই প্রতিপক্ষের বাক্‌যুদ্ধ উপভোগ করে। বাক্‌যুদ্ধই।

কুসুম বিশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন, 'ওমা, ঠিক ধরেছ তো?' রতনে রতন চিনেছে আর কি!

'এই সেরেছে, তোমাকে আবার 'তুমি' বলে মলাম! যাক্‌গে মরুকগে, যতই হোক তুমি আমার স্বামীর আশ্রিত, 'তুমি' বললে এত কিছু মান খোওয়া যাবে না। কি বল?'

কনক মৃদু হেসে বলেন, 'সে তো সত্যি! তা আসুন, ঘরে এসে বসুন। পায়ের ধূলো যখন পড়েছে, তখন সহজে ছাড়ছি না। গোপালের প্রসাদ খেয়ে যেতে হবে!'

'গোপালের প্রসাদ! গোপাল! হি-হি-হি গোপাল!' মেমসাহেব হঠাৎ হিষ্টিরিয়া রোগীর মত হাসতে শুরু করে দেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'হি-হি-হি, ভারী মজার কথা তো? বলি, কিসের গোপাল গো তোমার? পাথরের? না পেতলের? নাকি মাটির? বল না গো?'

কনকলতা গম্ভীরভাবে বলেন, 'ওর মধ্যে একটাও নয়।'

'তবে? তবে কিসের গো?' কুসুম বিশ্বাস যেন ডুকরে ওঠেন, 'রক্ত-মাংসের নয়ত? ভয় করছে যে!'

'না রক্ত-মাংসের নিয়ে কি হবে?' কনকলতা মেমসাহেবের প্রতি একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'সেটা বাঁচবে কি মরবে, রোগে

ভুগবে, বড় হয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবে। কত জ্বালা! আমার গোপাল হচ্ছে সোনার।'

কুসুম বিশ্বাস ঠোঁট ওল্টান। অবজ্ঞার সুরে বলেন, 'সোনার! ছিঃ! তাহলে আর হল কি? সোনার গোপাল খেলতে পারে? হাসতে পারে? 'মা' বলে ডাকতে পারে? পারে না, পারে না। তবু তাই নিয়ে ভুলে আছ? বোকা! তোমাদের সাহেব বুঝি ওই সোনার ঢিবিটা দিয়ে ভুলিয়েছে তোমায়?'

'কী পাগলামী করছেন?'

কনকলতা সহসা ধমকের সুর ধরেন। বলেন, 'থামুন। বাজে কথা রেখে খুলে বলুন কী উদ্দেশ্যে এসেছেন এখানে?'

'উদ্দেশ্য! উদ্দেশ্য!' মেমসাহেব কেমন যেন স্খলিত স্বরে বলেন, 'মনে পড়ছে না তো কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম কিনা! ইচ্ছে হল, চলে এলাম। সাহেবের ওই গুণের নিধি ড্রাইভারটি, সে তো আনতেই চায় না। বলে, সাহেবের হুকুম নেই। শেষে—'

'আপনাকে এবার সত্যি ধমকাতে হবে—' কনকলতা বেশ দৃঢ়স্বরে বলেন। আর সহসাই স্থির আর শান্ত হয়ে যান মেমসাহেব। শান্ত গলায় বলেন, 'তুমি বুঝি এমনি বকে বকেই সবাইকে শায়েস্তা করে রেখেছ? বেশ, চল তোমার সেই সোনার গোপালকেই দেখে আসি।'

কনকলতার সঙ্গে চলে যান কুসুম বিশ্বাস পূজার ঘরে। একতলা বাড়ীর একটিমাত্র দোতলার ঘর যেটি। ছাদের চিলেকোঠা।

যারা কাজ ফেলে এসে মজা দেখছিল, তারাও এদিক ওদিক চলে যায়, এবং সাহেবের 'মেম ভাগ্যের' শোচনীয় দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করতে বসে। শুধু উর্মিলাই থাকে সেখানে। উর্মিলার সঙ্গে বিশেষ মিশতে চায় না কেউ। প্রধান কারণ, উর্মিলার সরলতা। যাকে সবাই 'আদিখ্যেতা' বলে। দ্বিতীয় কারণ, উর্মিলা কনকলতার

একান্ত অনুরক্ত প্রজা। কনকলতার পায়ে পায়েই ঘোরে উর্মিলা। অতএব সে শত্রুপক্ষ। কে বলতে পারে চর কিনা। উর্মিলা তাই ওদের সঙ্গে যায় না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুধীর যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে সরে এসে চাপা হাসির মুখ নিয়ে বলে, 'আপনাদের মেমসাহেব তো দেখছি পুরো পাগল! কই, বলেননি তো কোনদিন?'

সুধীর হেসে বলে, 'মেমসাহেবকে নিয়ে গল্প করার কারণ তো কোনদিন ঘটেনি।'

'আহা, সেইটাই তো কারণ, মশাই'—উর্মিলা কৌতূকোচ্ছল মুখে বলে, 'এমন একটা মজার গল্প!'

ওর ওই সরল গ্রাম্য ধরনের মুখে এই সহজ কৌতুকের হাসিটা যেন বিশেষ একটি উপভোগ্যের মত লাগে। সুধীর কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'এটা বুঝি একটা মজার কথা হল? অমন একটা মানুষের গিন্নী পাগল, সেটা কম দুঃখের কথা?'

উর্মিলার সেই কৌতুকোজ্জ্বল মুখটায় অপ্রতিভতার ছায়া পড়ে। মাথা নীচু করে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, 'দোষ হয়েছে। হঠাৎ কেমন মজা লাগল, তাই!'

সুধীর এবার হেসে ফেলে। বলে, 'তুমি তো আচ্ছা মেয়ে! একটুতেই ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়। আরে বাবা, পাগল-টাগল কিছু নয়। একটু খামখেয়ালী, বড়লোকের গিন্নী তো! ওই রকম মজা করে কথা বলা সখ ওঁর। এরপর হয়ত দেখবে খুব স্বাভাবিক সহজ মানুষ।'

'ওমা! সত্যি বুঝি!' অপরাধের ভার মুক্ত হয়ে বাঁচে যেন উর্মিলা। তারপর বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলে, 'তা হতেই পারে। একে তো বড়মানুষের ঘরে হাতে পায়ে কোন কাজ নেই। তায় আবার একটা বাচ্চাকাচ্চাও নেই। শুধু বসে থেকে থেকে মাথাটা কেবল খেয়ালে বোঝাই হয়।'

সুধীর একটু চমৎকৃত না হয়ে পারে না।

মেয়েটাকে যত বোকা মনে হয়, তত বোকা তো নয়। সাধারণ বুদ্ধি একটা আছে। হেসে বলে, 'বাচ্চাকাচ্চা না থাকাটা খুব কষ্টের বুঝি ?'

তা এ কথার উত্তরটাতেও সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেয় উর্মিলা। তং সে া, 'সবাইয়ের কি আর ? যার যেমন মন মতি। ভগবান যদি ওনার মনের মধ্যে মায়ের স্নেহমমতা ভর্তি করে পাঠিয়ে থাকেন, তবে কষ্ট! জিনিসটা নিয়ে করবে কি ? সেই জ্বালা, সেই কষ্ট। আবার এমনও হয়—' অবোধ মেয়েটা অবলীলায় বলে বসে, 'শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না, অনেক মেয়েমানুষ নাকি ইচ্ছে করে এমন ডাক্তারী কাণ্ড করে বসে থাকে যে, জন্মে আর বাচ্চাকাচ্চা হয় না। বুঝুন তা হলে ? তাদের আবার হওয়াই কষ্ট!'

সুধীর কি এই সরল অথচ বুদ্ধিমতী মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলছে ? তাই সুধীরের মুখে অমন প্রসন্নতার ঔজ্জ্বল্য! এমন প্রসন্ন মুখ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় সুধীরের। হয়ত বহুদিনই দেখতে পাওয়া যায়নি। সুধীরের সেই প্রসন্নতার নীচে অবান্তর একটা ভাবনা হঠাৎ মাথা তুলে ওঠে। মনে হয় তার, আচ্ছা এই মেয়ে কি কোনদিন চাইবে তার বর অনেক বড়লোক হোক ? নীতি-দুর্নীতি না মেনে কেবল টাকা ঘরে আনুক ? না, এ মেয়ে তা বলবে না। এ হয়ত স্বামীর ঘরে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, রান্না করেও অম্লান হাস্যে বিচরণ করবে।

হঠাৎ ভারী হাসি পায় সুধীরের। এর স্বামী সংসারের কথা ভাবছে সুধীর ? সেই বস্তু কি জীবনে কখনও জুটবে এর ? পৃথিবীর সব মেয়েই কি স্বামী সংসার পায় ? যুগে যুগে কালে কালে মেয়েদের নিয়ে নির্মম এক জুয়াখেলা চলে আসছে। তাদের কখনও বাঁদী করে, কখনও বেগম করে, কখনও ধনী অন্তঃপুরিকাদের সখী করে, কখনও মন্দিরের দেবদাসী করে, আর সর্বোপরি কখনও স্পষ্টাক্ষরে কেবল

মাত্র 'ভোগ্যবস্তু' বলে ছাপ মেরে। কত মেয়েই অপচয়িত হচ্ছে সেই নিষ্ঠুর খেলায়! পৃথিবী কি কোনদিন হিসেব রাখে এই অপচয়ের? কোনদিন কি শঙ্কিত হয়? হয় না। নারকীয় উল্লাসে শুধু বাড়িয়েই চলে খেলার মাত্রা!

বিশ্বাস সাহেবের এই আশ্রমের মারফৎ নাকি এই অপচয়িত জীবনের পুনর্বাসন হয়। সুধীর কি বিশ্বাস করবে সে কথা? না সুধীর নিজেই তার সামর্থ্য দিয়ে সে কাজের সামান্যতম একটু অংশ সফল করে তুলবে?

হৈ-চৈ করে সন্দেশ খাচ্ছিল মেয়েগুলো। মেমসাহেব নিজে হাতে বিলোচ্ছেন।

গোপালের ঘর থেকে অনেকক্ষণ পরে নেমে এলেন। এখন বেশ একটি ধীর-স্থির আত্মস্থ মূর্তি দেখা যাচ্ছে তাঁর। হ্যাঁ, এখন সাহেবগিন্নী বললে মানায়!

অমায়িক মিষ্ট গলায় বলছেন, 'নিন, না আরো নিন, অনেক তো রয়েছে! আমি তো কোনদিন আসি না। একদিন এলাম, সন্দেশ খাইয়ে একটু সুখস্মৃতি রেখে যাই, কি বলেন?'

বলতেই হবে উর্মিলা আগের চেয়ে অনেক সভ্য হয়েছে, লোককে 'আপনি' বলতে শিখেছে! সুধীরকে আপনি বলছিল, মেমসাহেবকেও আপনি বলে। বলে ওঠে, 'শুধু সন্দেশ খেয়েই মনে থাকবে? কেন? আপনাকে মনে থাকবে না?'

কুসুম বিশ্বাস ঈষৎ হাস্যে এই বাক্যবাগীশ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমাকে মনে থাকবার কী আছে?'

'সবটাই! আপনার চেহারা কী সুন্দর, গয়না কাপড় কী সুন্দর! কথা কেমন মিষ্টি—'

'তুই থামত—' কনকলতা বকে ওঠেন, 'সব সময় তোর বাক্যি!

উর্মিলা অবশ্য একটু অপ্রতিভ হয়, কিন্তু দমে না। মুখ ভার করে বলে, 'ভগবান কি আর শুধু খাবার জন্যেই জিভটা দিয়েছেন, কথা বলবার জন্যে দেননি ?'

'দিয়েছে বলে সারাক্ষণ কথা বলবি ? ভগবান তো হাঁটবার জন্যে পা দিয়েছে, হেঁটে বেড়াও তবে রাত-দিন। এই এক আচ্ছা মেয়ে জুটেছে আমার ! গাঁইয়া ভূত !'

কুসুম বিশ্বাস একবার কনকলতার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসির সঙ্গে বলেন, 'তা গাঁইয়া ভূতটিকে নিয়ে আছ তো বেশ, ভালই মনে হচ্ছে।'

'ছাই আছি। ভাবছি ওটাকে একটা বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে হাড়ে বাতাস লাগাই !'

উর্মিলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: 'দায় পড়েছে আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে লোকের মুখনাড়া খেতে ! তোমার কাছ থেকে আমি নড়ছি না।'

হঠাৎ কুসুম বিশ্বাস বলে উঠেন, 'আর সাহেব যখন ধরে বেঁধে সদ্‌গতি করে দেবেন ?'

'সাহেব !' উর্মিলা অবজ্ঞায় মুখ বাঁকায়, 'সাহেবের ভারী সাধ্যি ! মা যদি 'না' করে ? মাকে সাহেব যমের মত ভয় করে না ?'

'তুই থাম্‌বি লক্ষ্মীছাড়ী মুখপুড়ী ?' কনকলতা এবার বোধকরি সত্যসত্যই রেগে ওঠেন, আর কুসুম বিশ্বাসের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা দেখায়। হয়ত কিছু একটা বলতেন তিনি। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে যায়। হ্যাঁ, অসম্ভব রকমের অপ্রত্যাশিত। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। দেখা যায় গেটের দিক থেকে বিশ্বাস সাহেব আসছেন। পরনে দামী স্যুট্, দৃপ্ত পদভঙ্গী। লোকটা যে প্রৌঢ় হয়ে গেছে, এখন অন্ততঃ তা ধরা পড়ছে না।

বাগানেই ছিল এরা। সেখানেই সন্দেশ বিলোচ্ছিলেন মেমসাহেব, কাজেই চোখে পড়ল সকলেরই। আর প্রায় সকলেরই বজ্রাঘাতে আড়ষ্ট জিভ থেকে একটি অস্ফুট স্বর বেরোল, 'সাহেব !'

সাহেব কলকাতায় নেই, একথা সবাই জানে। সাহেবের অনুপস্থিতিতেই যে মেমসাহেব লুকিয়ে এখানে এসেছেন, সেটাও সবাই বুঝে ফেলেছে। হঠাৎ এই মহা মুহূর্তে স্বয়ং যমরাজ।

বজ্রাহত কি বসন্ত বিশ্বাসও হলেন, এখানের দৃশ্যটি অবলোকন করেই? তাই দাঁড়িয়ে পড়লেন মিনিট খানেকের জন্য।

হয়ত তাই। তবে ওই মিনিটখানেকই। তারপর বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে বলে ওঠেন, 'বাঃ, চমৎকার! মতলবটি ভেঁজেছ মন্দ নয়। সন্দেশটা বোধকরি মুখ বন্ধ রাখার ঘুষ?' বলা বাহুল্য টার্গেটটা মেমসাহেব।

এতগুলি মেয়ের সামনে স্বামীর ওই ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের ভঙ্গী আর রক্ত-মূর্তি দেখে কুসুম বিশ্বাসের মুখটাও লাল টকটকে হয়ে ওঠে অপমানের দাহে। আর হুল ফোটাতে তিনিও ছাড়েন না। বলে ওঠেন, 'আহা, ঘুষ হতে যাবে কেন? বেগমদের নজরানা! পীঠস্থানটি একবার দেখতে বাসনা হল। তুমি তাই তো কখনো দেখাওনি, নিজেই তাই—তা দেখ, ভাগ্যিস এসেছিলাম তাই না দেব-দর্শন হয়ে গেল!'

বিশ্বাস সাহেবের মুখে যেন আগুনের তাপ। সেই আগুন-মুখে বিশ্বাস সাহেব এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, 'আনল কে? সেই হারামজাদা বদমাইসটা বোধহয়?'

এবার কনকলতা এগিয়ে আসেন। দৃঢ়স্বরে বলেন, 'আঃ, কী হচ্ছে? খামোকা মুখ খারাপ করছেন কেন? বাড়ী গিয়েছিলেন? না স্টেশন থেকে সোজা?'

'ওসব কথা পরে হবে—' বিশ্বাস সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'আগে তার ছালচামড়া তুলব আমি। কোথায় সে?'

'আছে ওই দিকে।' কনকলতা মৃদু গম্ভীরস্বরে বলেন, 'শাস্তিটা অন্য সময়ের জন্যে তুলে রাখলে হয় না? এতগুলো চোখের সামনে একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা নাই করলেন?'

'অসম্ভব! আমি এই মুহূর্তে ওর চামড়া তুলে নিতে চাই!' অস্থির

পদচারণা করতে থাকেন বিশ্বাস সাহেব। কনকের ইঙ্গিতে মেয়েগুলো সরে পড়ে। ঊর্মিলা তো কেন কে জানে সর্বাগ্রেই ছুটেছে।

উপস্থিত থাকেন কেবল কনকলতা, বিশ্বাস সাহেব, আর বিশ্বাস গিন্নী। একটি পাথরের পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একটা গাছের নীচে। শুধু বুকের ওঠা-পড়াটা দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে যেন।

কনকলতা স্থির। আশ্চর্য দুঃসাহস তার। তাই বিশ্বাস সাহেবের মুখের উপর বলে ওঠেন, 'তা চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে তো অস্তর-শস্তর চাই, শুধু হাত দিয়ে তো জ্যান্ত মানুষের কাঁচা চামড়া ছাড়ান যাবে না! সেই ব্যবস্থাই করুন তাহলে?'

'দেখ কনক, সহ্যেরও একটা সীমা আছে—'

'আমিও তো তাই বলি।'

'আমি জানতে চাই, কার হুকুমে সে ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছে?'

'আমার হুকুমে!' বিশ্বাস মেম এগিয়ে এসে বলেন, 'আমার হুকুমে। আগে রাজী হয়নি, আমি কড়া ধমক দিয়েছি। ছাল-চামড়া ছাড়াতে হলে আগে আমারই ছাড়াতে হয়।'

'হ্যাঁ, তোমারও বিচার হবে। তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'ইচ্ছে হয়েছিল। তুমি নেই, প্রাণ হু-হু করছিল, বাসনা হল তোমার লীলাক্ষেত্রটা একবার দেখে আসি, তাই—'

'থাম! চুপ কর। এই একটি শনি জুটেছিলে তুমি আমার জীবনে, ইহকালে আর মুক্তি হল না তার থেকে!'

'ইহকালে? হি-হি-হি।' বিশ্বাস মেমসাহেব আবার হঠাৎ সেই তখনকার মত হেসে ওঠেন, 'ইহকালেই মুক্তির সাধ? পরকালেও হবে না, বুঝলে? পরকালেও হবে না। একশো জন্ম ধরে মুক্তির আশায় ছটফট করবে, পাবে না!'

বসন্ত বিশ্বাস কি সহ্যের হিমাচল হয়ে গেছেন? এরপরও তো ফেটে পড়ছেন না? শুধু অস্থির পদচারণা করছেন এদিক থেকে ওদিক!

হঠাৎ ওদিকের দিকে থমকে দাঁড়ালেন। সুধীর আসছে। পিছন পিছন একটা শ্যামলা রং স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, কী যেন মিনতি করতে করতে আসছে। কে ওই মেয়েটা? ঊর্মিলা না?

ওঃ, বাবু তাহলে এখানে মধুর আস্বাদ পাচ্ছেন। তাই তো বলি। উঃ, কী ভুল হয়েছিল ওই উদ্ধত অবিনয়ী পাজী ছোকরাটাকে এখানের দরজা চিনিয়ে দেওয়া! মানুষ চিনতে ভুল করেছিলেন বিশ্বাস সাহেব!

ওটাকে চাবকে দেওয়া ছাড়া আর কোন কথা মনে আসছে না।

বিশ্বাস সাহেবের অনুমান মিথ্যা নয়, অনুনয় বিনয়ই করছিল ঊর্মিলা সুধীরকে। তাই করতেই চট করে এখান থেকে চলে গিয়েছিল।

বলতে গিয়েছিল, সাহেব এসেছেন, ভীষণ রেগে আছেন মেম-সাহেবের এখানে আসায়। নিশ্চয় সুধীরকে যাচ্ছেতাই করবেন, কিন্তু সুধীর যেন চোটপাট জবাব না করে।

'কেন? কেন শুনি?' ভুরু কুঁচকে বলেছিল সুধীর, 'যাচ্ছেতাই করলেও ঘাড় নীচু করে থাকতে হবে?'

'আহা, তা হলেই বা! মনিব, বয়সে বড়, রাগের মাথায় যদি বলেই থাকে দুটো কথা, চুপ করে শুনে নেওয়াই ভাল। রাগ পড়ে গেলেই ডেকে ভাল কথা বলবেন।'

'বলবেন, সে কথা বলে দিয়েছেন বুঝি তোমাকে?'

'ওমা সে কি! বলবেন কি? অমনিই হয়, তাই বলছি। মা আমায় কত বকে। আবার মুখ ভার করে বসে থাকলেই ডাকে—উর্মি আয়, শোন।'

'তার সঙ্গে তুলনা করো না। তোমার মা তোমায় কত ভালবাসে, জান সে কথা?'

'সাহেবও তোমায় ভালবাসে।'

'কে জানাল তোমায়, এমন সত্যি খবরটা?'

'কে জানাল?'

ঊর্মিলা তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'এসব কথা আবার জানাতে আসবে

কে? ভগবান ছ'ছটো চোখ দিয়ে পাঠায়নি মানুষকে? একটা মন? নিজে বোঝা যায় না? নিন, চলুন চলুন—ক্ষেপে আছে মানুষটা।'

এই সঙ্গীন মুহূর্তে একটা কথা বলে বসেছিল সুধীর। বলেছিল, 'আহা, ক্ষেপে আছে সে তো সবাই দেখেছে। আমায় যাচ্ছেতাই করবে তাও নিশ্চয়ই সবাই বুঝছে, তার মধ্যে একা তুমিই কেন আমায় সাবধান করতে এলে?'

'আমি, কেন?'

উর্মিলা অবাক হয়ে গিয়ে 'আপনি' বলতে ভুলে যায়। চকচকে চোখ ছুটো তুলে বলে, 'আমি কেন? শোন কথা! সবাইয়ের তুলনা?'

'বাঃ, তা নয় কেন? তুমিও আমায় যতদিন দেখেছ এরাও ততদিনই দেখেছে!

উর্মিলা বিরক্তিভরে বলে, 'পাগলের মত কথা বল না। শুধু দিন গুনলেই হবে? সে হিসেব করলে তো তোমাদের বাড়ীর ধারের পড়শীরা সবাই তোমার বেশী আপনার লোক, দিনে দশবার দেখেছে। চল, বাবু। ওদিকে তোমার নামে কাণ্ড চলছে। এদিকে তুমি এখন ছিষ্টিছাড়া কি সুরু করলে?'

'আমি লোকটাই ছিষ্টিছাড়া।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন যাবে কিনা।'

সুধীর এসে যায় এদিকে, পিছন পিছন উর্মিলাও আসে মিনতি করতে করতে, 'বুঝলে, মনে থাকে যেন, চোপা করবে না মুখের ওপর। মনে কর, তোমার বড় ভাই কি মামা বকছে।'

কিন্তু সুধীর কি এ মিনতির মান রেখেছিল?

না। রাখতে পারেনি। তাই সাহেব যখন কড়া গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর বিনা হুকুমে মেমসাহেবকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন, সুধীর—তখন সুধীর মৃদু ধারাল গলায় বলেছিল, 'মেমসাহেবের' হুকুম মানব না, এ হুকুমও তো করে যাননি আপনি আমাকে!

'চুপ! ইম্‌পার্টিনেন্ট অসভ্য ছেলে! তুমি জানতে না, এখানে কারো আসা আমি অ্যালাউ করি না?'

'যে কারুর সঙ্গে মেমসাহেবকেও সমান করতে হবে বুঝতে পারিনি।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি ঘুঘু নম্বর ওয়ান তুমি! তুমিও সেই চাল চালতে এসেছ! যা আমার আগের লোক করে গেছে। বিশ্বাসের আলতার কারখানার ভেতরের খবর পুলিসকে জানিয়েছ, কেমন? ভেবেছিলে এই সময় লোকটা দেশে নেই—'

হ্যাঁ, সেই খবর পেয়েই চলে এসেছেন বিশ্বাস্ সাহেব। একটা মেয়ের ব্যাপারে মুস্কিলে পড়ে চলে যেতে হয়েছিল লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ঝাঁসি, নানা জায়গায়। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ছিটকে এসে পড়েছিল বসন্ত বিশ্বাসের আশ্রমে। তাকে পাচার করতে গিয়েই কেঁচোর গর্ত থেকে সাপ বেরিয়েছিল। সে সব ঝামেলা কোন প্রকারে মিটিয়ে সবে হাঁফ ফেলেছেন, এমন সময় এখান থেকে খবর গেল—কোন একজন বিশ্বাসের আলতার ব্যবসায়টা পুলিসের নজরে এনে দিয়েছে।

খবরটা পাঠিয়েছিল অবশ্য পুলিসেরই ভিতরের একজন। এ যাবৎ সে বসন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বস্ততা করে এসেছে। তবে সে জানিয়েছে, 'আমি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি, নতুন যে আসছে এখানে, সে নাকি আবার দৈত্যকুলে পেল্লাদ, অনেস্ট ম্যান! অতএব তাড়াতাড়ি এসে—'

পত্রপাঠ চলে এসেছেন বিশ্বাস সাহেব।

রাত্রিতে এসেই দেখেন বাড়ি গৃহিণীশূন্য। কোথায় গেছেন? দাসী চাকর জানে না।

সকালবেলা গাড়ীতে বেরিয়ে গেছেন একা ড্রাইভারের সঙ্গে, এই পর্যন্ত জানা।

খবর শুনেই মাথার রক্ত চলকে উঠে জ্বলে উঠেছিল। স্থির সন্দেহ হয়েছিল—আর কোথাও নয়, এইখানেই এসেছে কুসুম।

কিন্তু পুলিশে খবরটা কে দিতে পারে? আর কে? ওই সুধীরটা ছাড়া? বোঝা যাচ্ছে, বসন্ত বিশ্বাস এখনও মানুষ চিনতে ভুল করছেন। এত দেখে আর এত ঠকেও।

এই মানসিক অবস্থায় ধুলোপায়ে এখানে এসে দেখলেন, সন্দেশের সমারোহ চলেছে। রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

কিন্তু রক্তে উত্তাপ কি একা বিশ্বাস সাহেবেরই আছে? তাঁর কর্মচারীর থাকতে পারে না? শুধু ডাল ভাত খেয়ে মানুষ হলেই কি রক্তের তাপমাত্রা নীচে নেমে পড়ে থাকে?

আর সকলের কি হয় কে জানে। সুধীরের অন্ততঃ তা হয়নি। তাই সুধীরের রক্তও ফুটে উঠল—সাহেবের সরাসরি অভিযোগে। তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'পুলিসকে জানিয়েছি! আমি? আপনি নেই এই সুযোগে? বেশ, জানিয়েছি এখন কী শাস্তি দিতে চান দিন! গুলি করবেন? করুন, পালাব না।'

বিশ্বাস সাহেব ওর মুখের দিকে তাকান, কি দেখেন কে জানে! ভুরু কুঁচকে বলেন, 'সেটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি! যাক্, এখন বাড়ি চল। হচ্ছে শাস্তির ব্যবস্থা। মেমসাহেবকে তৈরি হতে বলগে...'

কিন্তু মেমসাহেব শুনে অগ্রাহ্যভরে বললেন, 'আমি এখন যাব কেন? এখানে আমার প্রসাদের নেমন্তন্ন রয়েছে!'

'প্রসাদের নেমন্তন্নর আশায় বসে থাকবে তুমি এখানে?...কনক, এটা বোধকরি তোমার নতুন শিক্ষা?'

কনকলতা আকাশ থেকে পড়েন।

'আমি আবার কি শেখাতে গেলাম। জীবনে এই প্রথম মনিব গিন্নীর পায়ের ধুলো পড়লো, তাই সাহস করে বলে ফেলেছিলাম প্রসাদ খেয়ে যেতে। কেড়ে নিয়ে যেতে চান নিয়ে যাবেন।'

তা ঊর্মিলা যে বলেছিল সাহেব কনককে যমের মত ভয় করেন, সেটা বোধকরি মিথ্যা নয়। তাই সাহেব হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা প্রায় আস্ত অবস্থাতেই মাটিতে ফেলে জুতোয় ঘসতে ঘসতে বলেন,

'ঠিক আছে, নেমন্তন্ন খেয়েই যাবেন। তবে ব্যাপারটা একটু সংক্ষেপে সারলেই বোধকরি ভাল হয়। একটা মানুষ যে আজ ষোলদিন পরে বাড়ি ফিরলো, সেটা বোধকরি ভাবছই না!'

'আহা ভাবব না কেন? তবে মানুষটার যে বাড়ির গিন্নীকে কতটা দরকার, তাও ভাবছি কিনা!'

'হুঁ!'

বিশ্বাস সাহেব আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেন, 'অনেক সময় এক একটা আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে, বাড়ি পৌঁছে কুসুমকে না দেখে হঠাৎ এত বিশ্রী রকমের খারাপ লাগল!'

'আহা, তাই নাকি? শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে তো!'

'আনন্দ হচ্ছে?'

'হচ্ছে বৈকি!'

'সুখবর! যাক, বেশী দেরি করিয়ে দিও না।'

দু'খানা গাড়ীর অপরখানা বাইরে অপেক্ষা করছিল। দৃপ্ত পদক্ষেপে আবার গিয়ে ওঠেন সাহেব। গাড়ী গর্জে ওঠে।

এরা বেরোয় অনেকটা পরে।

মেমসাহেবের আর কনকলতার সঙ্গে কথা ফুরতে চায় না। শেষ অবধি বারবার তাড়া লাগাতে হয় সুধীরকেই।

'জানে'র বাড়ি তাহলে এখনো যাওয়া হল না!' কুসুম বিশ্বাস নিঃশ্বাস ফেলেন।

'গিয়ে কি হবে? আপনি তো কাউকেই বিশ্বাস করেন না।'

'তা বটে!' আর একটা নিঃশ্বাস ফেলেন কুসুম বিশ্বাস, 'কিন্তু তুমি বড্ড বেশী বিশ্বাসী, সুধীর! এই তো সাহেবের কাছে এত ধমক খেলে, তবু প্রতিহিংসার বশেও কি একটা অবিশ্বাসের কাজ করতে পারবে? পারবে না। যদি এখন আমি তোমায় অনুনয় করি—সুধীর

বাড়ি ফিরে না গিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে চল, শুনবে ?'

'আচ্ছা, আপনি সব সময় এমন বাজে কথা বলেন কেন বলুন তো ?'

'বাজে ? মোটেই না, সুধীর ! এটাই আসল কথা। তোমরাই শুধু ভাব বাজে। সত্যি, যেতে পার না ?' হঠাৎ ব্যগ্র কয়েকটা আঙুলে সুধীরের কাঁধটা চেপে ধরে বলে ওঠেন কুসুম বিশ্বাস, 'দূরে অন্য একটা জায়গায় ?'

সুধীর আস্তে কাঁধটা সরিয়ে নিয়ে বলে, 'ভাল হয়ে বসুন। পাগলামী করবেন না !'

বলে। কিন্তু সত্যিই যে কুসুম বিশ্বাসকে নিয়ে পালাতে হবে সুধীরকে, সেদিন তা কি ভেবেছিল ? অথচ পালাতে হল। কুসুম বিশ্বাস আর বিশ্বাস সাহেবের অনেক অনেক টাকা নিয়ে। কাঁচা টাকা, তাড়া তাড়া নোট ! বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট !

॥ ১৯ ॥

জি. টি. রোড।

গাড়ী নিয়ে উধাও হয়ে বেরিয়ে যাবার প্রধানতম পথ। গাড়ী নিয়ে, মাল আর মানুষ নিয়ে। বে-আইনীও থাকে বৈ কি। আইনী আর বে-আইনী তো একই পথে চলছে, একই রকম অবাধ উদ্দাম গতিতে। দুইয়েরই চেহারা এক।

বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই—কে কার মান-সম্মান রেখে কর্তব্য করতে ছুটছে। আর কে বিশ্বাসভঙ্গ করে পালাচ্ছে। বোঝা যায় না। গাড়ীর চেহারা নিরীহই থাকে। যেমন রয়েছে সুধীর ড্রাইভারের গাড়ীটা। যেটা নাকি বিশ্বাস সাহেবের গাড়ী।

ওটাকে দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, ওর মধ্যে অগুনতি টাকা

আছে। আছে গদির নীচে লুকানো খোপে, পিছনে নেহাত অবহেলিত বেডিঙের মধ্যে। সুধীরের মনিবের টাকা।

কিন্তু শুধুই কি টাকা?

মনিবের আরো একটা জিনিসও কি নেই? যে জিনিসটা টাকার মত নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে না, টাকার মত লুকিয়েও রাখা যায় না যাকে?

বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা আর অভিনব ওই বস্তুটাকে নিয়ে যখন গাড়ীতে উঠে বসেছিল, তখনও যেন অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারেনি সুধীর, বুঝতে পারল গাড়ী ছেড়ে দিয়ে।

গাড়ী ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে অসম্ভব একটা কাঁপুনি ধরলো, আর সেই কাঁপুনির জের এসে লাগল হাতের আঙুলে। গাড়ী তবে চালাবে কী করে সুধীর? উধাও উদ্দাম গতিতে?

'এত আস্তে চালাচ্ছ কেন?' প্রশ্ন করেন কুসুম বিশ্বাস, সুধীরের ঘাড়ের উপর প্রায় ঝুঁকে। বললেন, 'এই কি পালিয়ে যাবার স্পীড্?'

সুধীর আঙুলগুলোর উপর মনের জোর চাপাল, সর্বশক্তি নিয়োগ করল। বলল, 'বেশী স্পীড্ই কি খুব নিরাপদ? বরং সেটাই বিপদের কারণ হতে পারে।'

'তা বলে গরুর-গাড়ীর গতিতে চালাবে?...ওঃ, তোমার হাতটা কাঁপছে? খুব ভয় করছে বুঝি?'

সুধীর দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে, 'ভয় যদি করেই, সেটা কি অসঙ্গত?'

'বাঃ, নার্ভাস হয়ে পড়লে পালাবে কেমন করে? দেখ, আমি তো নার্ভাস হচ্ছি না!'

'অবোধরা কোনো সময়েই নার্ভাস হয় না—' সুধীর প্রভুপত্নীর মান-সম্মানের তোয়াক্কা করছে না। সুধীর তাই আবার বলছে, 'আপনি যা করেছেন, তা আপনার উপযুক্তই হয়েছে।'

'তুমি আমাকে এত চিনে ফেললে কি করে বলত, সুধীর?'

'আপনাকে চেনা খুব শক্ত নয়।'

'একেবারে জলের মত সোজা, কি বল?'

'খুব মিথ্যে নয়—' নড়ে চড়ে স্টিয়ারিংটা এবার একটু দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে সুধীর।...বুক কাঁপানো সেই অনুভূতিটা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে বুকের পাষাণভার। টাকাগুলোর চেহারাটা যেন মস্তিষ্কের কোষে কোষে তেমন করে মুহুর্মুহু ছায়া ফেলছে না।

হয়তো কথা কইতে কইতে ভিতরের চাপা বাতাসটা আস্তে আস্তে মুক্তি পাচ্ছে।...প্রায় শেষরাত্রে বেরিয়েছিল সুধীর গাড়ী নিয়ে, তখনও পুরো আকাশটায় আলো ফোটেনি, শুধু পুব দিকটা লালচে্ সোনালী হয়ে আসছিল। এখন আকাশ সাদা হয়ে উঠেছে। তবু বাতাসটা ভোরের স্নিগ্ধতা হারায়নি। সেই বাতাস মুখে চোখে এসে লাগছিল সুধীরের। আর সেটাই হয়ত টাকার দাবদাহটা জুড়িয়ে দিতে সাহায্য করছিল।

কুসুম বিশ্বাস ওর কথায় হেসে উঠে বলেন, 'আর তোমাদের বিশ্বাস সাহেব? তাঁকে বুঝতে পার?'

'না!' সংক্ষিপ্ত এই উত্তরটা দেয় সুধীর।

কুসুমলতা বলে ওঠেন, 'তবু যাক্ সত্যি কথাটা বললে। ওঁকে বোঝা সোজা কথা নয়। এই এতো বছরেও হদিস পাইনি ওঁর। আজই শুধু মনে হল—'

'কী মনে হল?'

'মনে হল ওঁকে যেন বুঝতে পারলাম!'

একটু মনমরা আর অন্যমনা লাগল কুসুমলতাকে।

সুধীর কিন্তু ক্রমশঃ সচেতন হচ্ছে, হচ্ছে ধাতস্থ। আর হয়ত বা সেটা হচ্ছে বলেই নিষ্ঠুরও হতে পারছে। তাই অবলীলায় বলে বসে সে, 'ওঁকে ফাঁসিয়ে তবে বুঝতে পারলেন ওঁকে?'

আশ্চর্য! সামান্য ওই ড্রাইভারটার এই ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা সহ্য করছেন কুসুমলতা। বিশ্বাস সাহেবের গিন্নী যিনি।

কিন্তু বিশ্বাস সাহেবের মহিমা আর কই? তার সমস্তই তো দীর্ণ বিদীর্ণ করে পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন মিসেস বিশ্বাস। বিদীর্ণ করে দিয়েছেন।

অতএব তাঁর ভৃত্যের স্পর্ধা ক্ষমা করতে পারছেন। রেগে না উঠে বলতে পারছেন, 'আমি ফাঁসিয়েছি, এমন সন্দেহ হঠাৎ হল কেন তোমার?'

'সন্দেহ কেন হবে? নিশ্চিত বিশ্বাস!'

হঠাৎ নিজস্ব ভঙ্গীতে হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠেন কুসুমলতা. 'ঠিক করেছি, বেশ করেছি! আলতার কারখানায় এতক্ষণে লালবাতি জ্বল্‌ল, কি বল সুধীর?'

'সে তো দেখেই এলাম। পুলিস ঘেরাও করেছে।'

'করেছে? বাঁচলাম তবে বড় আক্ষেপ হচ্ছে সুধীর, ফাঁকা কারখানাটা ঘেরাও করল। স্রেফ ড্রাম কয়েক আলতা ছাড়া আর কিছুই পাবে না বেচারারা। এত অভিযান, বেবাক শূন্যি! পুলিস সাহেবরা মহানুভব তো? আগে গেরস্থকে সাবধান হবার নোটিস দিয়ে তবে হানা দিতে আসেন! আহা! কী দয়া! কী হৃদয়বত্তা!'

সুধীর রাগ করে বলে, 'আপনার থেকে ভাল! আমি তো ভাবতেই পারছি না স্ত্রী হয়ে আপনি কি করে এ-কাজ করলেন? পুলিস যদি অপরাধ প্রমাণ করতে পারে, কত বছর জেল হয়ে যাবে ওঁর, সেটা ধারণা করতে পারেন?'

কুসুমলতা এবার ঈষৎ গম্ভীর হন। বলেন, 'যদি প্রমাণ করতে পারে—তাই না? কিন্তু বড়লোকদের অপরাধ কি প্রমাণ হয়, সুধীর?'

সুধীর আরো রাগ করে বলে ওঠে, 'আপনার কথার সুর শুনে মনে হচ্ছে, প্রমাণ হলেই যেন খুশি হন আপনি—'

'সত্যি কথা স্বীকার করলে বলতেই হয় সুধীর, খুশি হই। খুশিই যদি না হব, পুলিসের ঘরে খবরটা পৌঁছে দেব কেন?'

'আপনার মত সাঙ্ঘাতিক মেয়ে আমি দেখিনি!'

'দেখনি, না? তা বেশ তো, একটা নতুন বস্তু দেখলে! যাক্ এখন আমায় নিয়ে কোথায় গিয়ে উঠবে?'

সুধীর গম্ভীরভাবে বলে, 'ঠিক নেই!'

'ঠিক নেই? বল কি গো? একেবারে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি? বিশ্বাস সাহেবের কতো বছর জেল হল দেখতেও পাব না?'

'আপনি একটু চুপ করুন, এসব কথা ভাল লাগছে না এখন।'

কুসুমলতা হেসে ওঠেন, 'সাধে কি বলি সুধীর, তুমি একটা কিম্ভূত! তোমার সামনে ভগবান এমন একটা সুযোগ এনে দিলেন, তুমি সেটার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছ না? রাজার ঐশ্বর্য, সুন্দরী নারী, এসব কি ফেল্‌না? ইচ্ছে করলেই তুমি এখন নতুন করে জীবন সুরু করতে পার। এমন কি তোমার সেই মা বোন ভাইকে মোটা কিছু টাকা দিয়ে ফেলে কর্তব্য শেষ করতেও পার। একেবারে নিশ্চিন্ত জীবন!'

সুধীর সমস্ত কথাটা নীরবে শুনে, তারপর বলে, 'আপনি যদি এইভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যান, আমি গাড়ী থেকে নেমে চলে যাব। যা খুশি করবেন আপনি।'

কুসুমলতা হেসে উঠে বলেন, 'সে তুমি পারবেই না। তোমাদের বিশ্বাস সাহেবকে চিনতে সময় লাগে, তোমার জন্যে সময় লাগে না। তুমিও একেবারে জলের মত সোজা!'

সুধীর হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা আপনি লোক তো খারাপ নন্, তবে ওই সব খারাপ খারাপ কথা বলেন কেন?'

কুসুম বিশ্বাসের চোখে একটা কৌতুকের ঝিলিক ফুটে ওঠে। সুধীর অবশ্য দেখতে পায় না। কারণ কুসুমলতা তার পিছনে। দেখতে পায় না, সেই কৌতুকের ঝিলিক থেকে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির আলো ছড়িয়ে পড়ে মুখে। কুসুমলতা হেসে বলে ওঠেন, 'আমার স্বভাবটাই

অমনি সুধীর, ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম বেপরোয়া কথা বলতাম আমি, কিন্তু ভগবানের সইল না। ভাগ্যের মার খেয়ে গুম হয়ে গেলাম। তবু জানো তো 'স্বভাব যায় না মলে'! বিয়ে হয়ে পর্যন্ত পাথরের দুর্গে বন্দিনী, দুটো মজার কথা কই এমন লোকই জুটল না জীবনে। তোমার তো তবু এতটা পর্যন্ত শুনতে সাহস হচ্ছে, সকলের তাও হয় না। আমার ঠাট্টা শুনে অজ্ঞান হয়ে যায়, আমার প্রস্তাব শুনে চোঁ চোঁ দৌড় দেয়।'

'সেটাই স্বাভাবিক!' বলে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ী চালাতে থাকে সুধীর। তারপর হঠাৎ রূঢ় গলায় বলে ওঠে, 'আপনার প্রস্তাবটি আপনি ক'জনের কাছে পেশ করেছেন এযাবৎ?'

কুসুমলতা ভুরু কুঁচকে বলেন, 'তুমি এ প্রশ্ন করবার কে হে?'

'কেউ না। এমনিই করছি।'

'তুমি প্রশ্ন করলেই আমি উত্তর দেব, তার কোন মানে নেই।'

'না, তা নেই বটে।'

'তুমি একটা ছোটলোক, সুধীর!'

'সে তো জানিই। তা' নইলে ভদ্রলোকের দরজায় এসে আর দাঁড়াব কেন?'

'হুঁ।' কুসুমলতা একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'কিন্তু তুমি তোমার সাহেবকে এত ভালবেসে ফেলেছ কেন বলত? লোকটার মধ্যে ভালবাসবার মত কী আছে?

সুধীরের মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। আস্তে বলে, 'সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

'আহা, আমার কথা আলাদা। আমি হলাম জালে পড়া হরিণী। সেকালে তো শুনেছি লুঠ করা আনা বাঁদীরাও নবাব বাদশাদের ভালবাসত, কিন্তু তুমি? ওই দাম্ভিক কটুভাষী আর দুর্নীতিপরায়ণ লোকটাকে তোমার মত মানী আর নীতিবাগীশ ছেলের তো ভালবাসার কথা নয়?'

'ভালই যে বেসে ফেলেছি তাই বা বুঝছেন কি করে? প্রমাণ কি পেলেন?'

'প্রত্যক্ষর জন্যে প্রমাণের দরকার হয় না।...কিন্তু ভাবছি—'

'কি ভাবছেন? আপনি কথা বলতে থেমে যাচ্ছেন, আশ্চর্য তো! জগতে তো এমন কোন ভয়ানক কথা দেখি না, যা উচ্চারণ করতে আপনার বাধে।'

'না, বাধছে না। ভাবছি এতক্ষণে হয়ত বিশ্বাস সাহেবের দুঃস্থ অবলা আশ্রমেও পুলিস হানা দিয়েছে।'

সুধীর চমকে উঠে বলে, 'সে খবরও দেওয়া হয়ে গেছে নাকি?'

'তা হয়েছে বৈকি! রোগের জড় আর পাপের জড় রাখতে নেই। শাস্ত্রের নিষেধ!'

'ওঃ! শাস্ত্রবাক্যের বশেই চলেন বুঝি?' সুধীর ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'জানেন কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করে বসেছেন আপনি? আলতার কারখানার মাল যত তাড়াতাড়ি পাচার করা সম্ভব হয়েছে, ওখানে কি তা হবে?'

'কী মুস্কিল, হবে না, এই আশাতেই তো দিয়েছি। সাহেবের অনুপস্থিতিতেই দিলাম, তা কে যে কোথায় কলকাঠি নাড়ল, সাহেব এসেই হাজির!'

'কোন হিন্দুমেয়ে যে স্বামীর এতবড় সর্বনাশ করতে পারে, এ আমার ধারণার বাইরে ছিল!'

কুসুমলতা এক মিনিট চুপ করে থাকেন, তারপর স্বভাববহির্ভূত গাঢ় স্বরে বলেন, 'ভুল করছ সুধীর! লোকটা সর্বনাশের শেষ তলায় তলিয়ে যেতে বসেছিল, উদ্ধারের আশা চলে যাচ্ছিল, তাই মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিলাম টেনে তুলতে! অনেক ভাল বস্তু ছিল লোকটার মধ্যে, কিন্তু সব নষ্ট করতে বসেছে ওর ওই নেশা—টাকার নেশা! ওই নেশার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বসেছে ও, উদ্ধার হতে পারছে না। স্বামীকে পাপ থেকে উদ্ধার করাও তো হিন্দুমেয়েদের কর্তব্য গো! টাকা

টাকা, আরো টাকা, বে-হিসেবী টাকা! তার পরিণাম তো এই! নিজেই তো সাক্ষী! ছেঁড়া কাগজের মতো মুঠো মুঠো করে নিয়ে বিছানার বাণ্ডিলে পুরলে, গাড়ীর গদির নীচে পুরলে। তারপর প্রাণভয়ে মেঠো ইঁদুরের মত ছুটছো, পেছনে পুলিসের বিভীষিকা নিয়ে! এত টাকা দিয়ে কি লাভ হল বিশ্বাস সাহেবের?'

সুধীর তীব্রস্বরে বলে, 'আপনার বিশ্বাসঘাতকতাতেই হল! নচেৎ ঠিকই চলত!'

'তা বটে!' কুসুমলতা হেসে ওঠেন, 'তাঁর চোরাই মদ আর চোরাই মেয়েমানুষের ব্যবসাটা কলায় কলায় আরো ষোলকলা হয়ে উঠত! কিন্তু সুধীর, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না তুমি এতবড় নীতি-বাগীশ হয়ে এমন দুর্নীতির সমর্থক হলে কি করে? বিশ্বাস সাহেব অনেক লোভ দেখিয়েছিলেন বুঝি?'

'না, আমি বিশ্বাস সাহেবের সমর্থক নই, কিন্তু অনেক বেশী অসমর্থক আপনার। স্বামীকে পাপ থেকে রক্ষা করবার এর থেকে ভাল কোন পথ আবিষ্কার করা উচিত ছিল আপনার!'

'হত না সুধীর, হত না!' মিসেস বিশ্বাসের কথাটা হঠাৎ হাহাকারের মত শোনায়, 'আর কোন উপায় ছিল না! এই শেষ পথ, একমাত্র পথ! ওর যদি জেল হয়, তবেই ও বাঁচবে। ওর যাতে জেল হয় প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করতে হবে আমায়!'

গাড়ী চলতে থাকে···নিঃশব্দে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুধীর বলে, 'কিন্তু আশ্রমে পুলিস হানা দিলে, ওই আশ্রমবাসীদের কী বিপদটা হবে বুঝতে পারছেন? বিশ্বাস সাহেবের অর্থনেশা ওদের হয়ত আগুনের ধার দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলছিল, কিন্তু মহানুভব রক্ষাকর্তাদের অন্য নেশা ওদের স্রেফ জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডেই নিক্ষেপ করবে! মনে জানবেন আপনার দিদিও রেহাই পাবেন না তা থেকে?'

'কী? কী বললে?' কুসুমলতা তীব্র উত্তেজনায় বলে ওঠেন, 'আমার দিদি মানে? কে আমার দিদি?'

'কেন, আশ্রমের অধিকর্ত্রী? শ্রীমতী কনকলতা দেবী! তিনি তাঁর গোপাল ঠাকুরকে নিয়ে—'

আবেগের উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়ায় সুধীর।

কেবলমাত্র কি গোপাল ঠাকুর? সরলতা আর পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সেই গ্রাম্য মেয়েটা? বয়েস আর স্বাস্থ্যে যে টলটল করছে! এই মুহূর্তে সেখানে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে সুধীরের, উদ্ধার করে আনতে ইচ্ছে করছে বীর রাজপুত্রের মত, কিন্তু উপায় নেই, উপায় নেই! ধ্বংস হোক সমস্ত পৃথিবী, মুছে যাক্ ঊর্মিলা নামের সেই বিশ্বাসটুকু, চুলোয় যাক্ সুধীরের নিজের মা বোন পরিবার, সুধীরকে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে, পুলিসের আওতার বাইরে।···বিশ্বাস সাহেবের ন্যস্ত বিশ্বাস বহন করে!

॥ ২০ ॥

হ্যাঁ, বিশ্বাস সাহেবের।

গতকাল রাত্রে বাসায় ফিরতে দেননি বিশ্বাস সাহেব সুধীরকে! বলেছেন, 'শেষরাত্রে গাড়ী নিয়ে বেরোতে হবে।'

সমস্ত ঘটনাটা একটা দৃশ্যের মত চোখের উপর ভাসছে সুধীরের। সুধীর উত্তর দিয়েছিল, 'কিন্তু রাত্রিতে থাকার কি দরকার? কত ভোরে বেরুতে হবে বলুন না, এসে যাব!'

'না না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন সাহেব, 'সে খুব ভোরে বেরোতে হবে। তাছাড়া ওই সব আসাআসির ঝামেলায় বিপদের ঝুঁকি আছে। বুঝতেই পারছ বোধহয় কাজটা একটু গোপনীয়!'

'কিছুটা বুঝতে পারছি!'

'পারবে, পারবে জানি বলেই—ভোরবেলা গাড়ী বার করে মিসেস বিশ্বাসকে নিয়ে পালাতে হবে তোমায়—'

সুধীর চমকে উঠেছিল। সুধীর শিউরে উঠে বলেছিল—'কী বলছেন স্যার?'

'খুব ভুল কিছু বলিনি। সকাল ছ'টায় পুলিস এসে ঘেরাও করবে, তার আগে ওকে অন্তত কলকাতার বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।'

সুধীর শিথিল স্বরে বলেছিল—'আমাকে মাপ করুন, স্যার!'

'তোমাকে মাপ করব, স্যার?' বিশ্বাস সাহেব ব্যঙ্গ হাসি হেসে উঠেছিলেন, 'তোমাকে মাপ করব তো ভারটা কাকে দেব শুনি? মিসেস বিশ্বাসের নিরাপত্তার ভার? অনাদিবাবুকে?'

সুধীর শান্ত গলায় বলেছিল, 'তার সঙ্গে আমার আর পার্থক্য কোথায়, স্যার? সে গাড়ী ধোয়, আমি গাড়ী চালাই, এই পর্যন্ত। তেমনি সে আপনার পুরানো চাকর! আমি তো সেদিনের লোক। আমার ওপর এতটা বিশ্বাস রাখবেন কেন আপনি?'

'আরে, এ ছোকরা তো ভাল মুস্কিলে ফেললে! বিশ্বাস রাখব আমার খুশি। হল? যাও, ঘণ্টা-তিনেক ঘুমিয়ে নাওগে—তারপর—'

'কোথায় পৌঁছে দিতে হবে?'

'আরে সেকথা আমি কি করে বলি? আমার পরিচিত জায়গাগুলো তো সবই দেখবে পুলিশ—'

সুধীর ঝপ করে বলেছিল, 'সে তো লোক-দেখানো!'

'সর্বনাশ! মাননীয় পুলিশ বিভাগের উপর এত অবিশ্বাসের মনোভাব? তুমি তো সাঙ্ঘাতিক ছেলে হে! ওহে বাপু, লোক-দেখানো হলেও দেখাতে তো হবেই কিছুটা? তখন? অনর্থক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে জেরা ঝামেলা করতে বসবে তখন. বাধ্য হয়ে। উনিই আবার নাটের গুরু কিনা? তোমাদের মেমসাহেব।'

'কী? কী বললেন?'

'ওই তো বললাম। পুলিসের ঘরে খবর পৌঁছে দেবার মহৎ কর্মটি উনিই গ্রহণ করেছিলেন!'

'আপনি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন, স্যার?'

'তামাসা? তামাসা করছি আমি তোমার সঙ্গে? আচ্ছা ধৃষ্ট ছেলে তো তুমি হে! তুমি আমার তামাসার যুগ্যি? অত কথায় কাজ কি? আমি হুকুম করছি তুমি মিসেস বিশ্বাসকে নিয়ে আজ রাত্রিশেষে পলায়ন করবে। ব্যস, হুকুম পালন করবে তুমি!'

'কিন্তু আপনি বলছেন না কোথায় পৌঁছাতে হবে!'

'আহা, তাহলে তো পৌঁছানই বলতাম। পালানো বলতাম না!'

'আপনার এ হুকুম যদি আমি পালন করে উঠতে না পারি স্যার?'

'না পারি মানে?' বিশ্বাস সাহেব ভুরু কুঁচকে বলেন, 'না পারি মানে কি? পারতে হবে। হুকুম কথাটার মানে কি তাহলে? মনে রেখো, তুমি আমার চাকর!'

'যদি চাকরিটা ছেড়ে দিই?'

'দিই বললেই তো দেওয়া হয় না। দু'সপ্তাহের নোটিস দিতে হবে এই রকম একটা শর্ত আছে না?'

'কিন্তু কেবলমাত্র গাড়ী চালানোর কথাই ছিল আমার—'

'তা' গাড়ীই তো চালাতে বলছি তোমায়। তাছাড়া আর কিছু বলছি?'

'মিসেস বিশ্বাসকে নিয়ে যেতে বলছেন—'

'তা' বলবো না তো কি খালি গাড়ী নিয়ে তোমায় পালাতে বলবো? এ তো আচ্ছা বেয়াড়া ড্রাইভার! যাও আর বিরক্ত কোরো না আমায়। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও'গে। জাস্ট তিনটেয় উঠবে—'

'বাড়িতে ভাববে—'

'আরে বাপু, বাড়িতে যাতে না ভাবে তা করবো আমি। যাতে না অসুবিধেয় পড়ে তারা, তাও করব। এখন দয়া করে দূর হও

আমার চোখের সামনে থেকে। আর সহ্য করতে পারছি না তোমায়। পালাতে চেষ্টা কোরো না, গেটে চাবি পড়ে গেছে।'

নিজেই চলে গিয়েছিলেন সাহেব জুতো মসমসিয়ে। রাতটার মতন নিশ্চিন্ত। সকাল ছ'টার আগে পুলিস আসবে না। একটা চাকর এসে খেতে দিয়ে গেল, শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু খেতে কি পেরেছিল সুধীর? কোথা থেকে যেন মত্তবিজড়িত হাসি এসে শিথিল করে দিচ্ছিল না তাকে?···শুধু হাসি আর কথা!

'চলে যাব? চলে যাব মানে? তোমার বিচার দেখব না? জেল হওয়া দেখব না? এত কাঠখড় পুড়িয়ে তাহলে হল কি আমার?'

তারপর—আর একটা ভারী গলার সুর। 'দেখতে পারবে না! শেষকালে কোর্ট সুদ্ধ লোক হাসিয়ে কেঁদে ফেলবে, জজের পায়ে পড়তে যাবে, তা'র থেকে সরে পড়াই ভাল!'

'ড্রাইভারের সঙ্গে 'যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও' বলে ছেড়ে দেবে তুমি আমায়? ভয় করবে না? ও যদি আমায় নিয়ে পালায়? তাহলে কি হবে?

বিশ্বাস সাহেবের ভারী গলা পাতলা শোনাচ্ছে, 'পালালে তো বাঁচি আমি, রেহাই পাই, তা ওই গোভূতটা কি পারবে তা? পারবে বলে মনে হয় না।'

কোথায় রয়েছেন ওঁরা? কোন্ দিকের ঘরে? মিসেস বিশ্বাসের কান্নার আওয়াজটাও তো শোনা যাচ্ছে। মাতালের কান্না।

'আমায় কেউ নিয়ে পালালে বাঁচো তুমি? রেহাই পাও? তবে গুলি কর না আমায়? যমের হাতেই তুলে দাও আমায়!'

'সর্বনাশ! ফাঁসিতে তুলতে চাও আমায়? শুধু জেল খাটিয়ে শাস্তি হবে না? শুয়ে পড়গে, শুয়ে পড়গে! মনে রেখ তিনটের সময় উঠতে হবে।'

তিনটের সময় উঠেছিলেন মেমসাহেব। উঠেছিল সুধীরও। স্নায়ুর উপর ভয়ঙ্কর চাপ গেছে সারা রাত, ঘুম হয়নি।

মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ মনের মধ্যে ভয়ানক একটা উত্তেজনা।

বিশ্বাস সাহেব যা ধরেছেন, তা করবেনই, তবু শেষ চেষ্টা একবার করবে সুধীর। বলবে, 'ক্ষমা করুন স্যার—'

বলবে, 'শ্রীমতী বিশ্বাসকে নিয়ে পাচার করবার হুকুমটা তুলে নিন।'

কথা থাকেনি। বিশ্বাস সাহেব বলেছিলেন—'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

* * *

তবু অবোধ সুধীর কি জানতো শুধু বিশ্বাস সাহেবের মেমকেই নিয়ে পালাতে হবে না, সাহেবের টাকার বস্তাগুলোকেও নিয়ে পালাতে হবে? সুশুভ্র চেহারার কালো টাকা! যা এ পর্যন্ত সাহেবের ঘরের লুকোনো দেয়ালের খাঁজে স্তূপীকৃত হচ্ছিল। সেই টাকার স্তূপও তুলে দিলেন বিশ্বাস সাহেব গাড়ীর মধ্যে। গদির নীচে, বেডিঙের মধ্যে। বললেন, 'এগুলোও সরানো দরকার। আমিও জেলে যাব, এগুলো ভূতের পেটে যাবে, তা তো চলে না। তাছাড়া মেমসাহেবের জন্যে দরকার হবে। দেখবে—ওঁর যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয়। উনি যাতে কিছুমাত্র না অভাবে পড়েন। যে কোন জায়গায় চলে যাও, যত ভাল হোটেলে ইচ্ছে উঠতে পার। দরকার বোধ করো, স্বামী স্ত্রী পরিচয়েও উঠতে পার, শুধু ধরাটি পোড়ো না!'

সুধীরের বুক থর্‌থর্‌ করছিল। সেই কাঁচা-টাকার রাশি যেন তার রক্তস্রোতকে অবশ করে দিচ্ছিল, স্খলিতস্বরে বলেছিল সে, 'এই এত টাকা দিয়ে আপনি কেন বিশ্বাস করবেন আমায়?'

'কেন করবো, তার কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারবো না তোমায়, এত সময়ও নেই। বেরিয়ে যাও, দূর হয়ে যাও!'

'আর আমি যদি আপনাকে বিশ্বাস না করি?' সুধীর বিশ্বাস সাহেবের মুখের দিকে না তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি যদি ভাবি সমস্ত বিপদটা আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে ফ্রী হচ্ছেন! পুলিস

আপনার গাড়ীর নম্বর জানে, সে আমাকে পথের মাঝখানে ধরবে। তখন আপনি বলবেন—আমার অসৎ ড্রাইভার আমার স্ত্রী আর টাকা চুরি করে পালাচ্ছিল।'

বিশ্বাস সাহেব সহসা ওর পিঠে একটা আদরের থাবড়া মেরে বলে ওঠেন, 'এই, এই জন্যেই তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছি, বুঝলে? বুদ্ধি আছে। তবে একটু বোকামী করছ, তা হলেও তো এই টাকা-গুলোর উৎপত্তিস্থল দেখাতে হবে আমায়। গাড়ীর নম্বরটা আর আমার গাড়ীর নম্বর নেই, বুঝলে? ওটা পালটান হয়েছে। কিন্তু আর নয়। অনেকক্ষণ তোমার দুঃসাহস সহ্য করা গেছে। কেটে···পড়। কুসুম, তাহলে আপাততঃ তুমি সুধীরের হেফাজতে, অথবা সুধীরই তোমার কবলে। যা খুশি করবার স্বাধীনতা রইল। O. K.?'

কুসুমলতা গাড়ী থেকে ঝুঁকে পড়ে বিশ্বাস সাহেবের গায়ে একটা হাত ছুঁইয়ে বলেন, 'তার মানে সমস্ত স্বাধীনতাটি কেড়ে নিলে!'

'এই দেখ, উলটো বুঝছ! তা উলটো বোঝাই তো তোমার রোগ!···'

'কিন্তু হি হি—' ভোরবেলার সাদা চোখেও মেমসাহেব জড়িত অপ্রকৃতিস্থ হাসি হাসেন, 'হি হি হি, সব গুড়ে বালি, মৌচাকেও ধোঁয়া দিয়ে গেলাম।'

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল সুধীর। বিশ্বাস সাহেব কুসুমলতার হাতটা সরিয়ে গাড়ীর মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে, সকালের রোদ যখন সাদা হয়ে গেছে, সুধীর যখন কলকাতা ছাড়িয়ে অনেকটা বেরিয়ে গেছে, তখন ঠিক ওই গাড়ীর জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়ে যে একটা মেয়ে সুধীরের খোঁজ খবর নিচ্ছিল, সে খবর আর টের পেল না সুধীর।

অনাদি দাঁত বার করে হেসে তাকে বলেছিল, 'সুধীর ড্রাইভার? হি হি হি, সে তো ভেগেছে! সাহেবের মেমকে নিয়ে, আর সাহেবের টাকার বস্তাটি নিয়ে!'

মেয়েটা দাঁতে ঠোঁট চেপে বলেছিল, 'ভেগে যাবার সময় তোমায় জানিয়ে গিয়েছিল বুঝি ?'

হ্যাঁ, 'তুমি'ই বলেছিল, 'অনাদিবাবু' বলেনি, 'আপনি' বলেনি।

অনাদি তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়নি। অনাদি বরং আরো উৎফুল্ল হয়ে বলেছিল, 'এসব কি আর স্পষ্ট করে বলতে হয়, দিদিমণি? চোখ কান খোলা রাখলেই সব জানা যায়।'

'চুপ'! বলে চলে গিয়েছিল মেয়েটা দ্রুত পায়ে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখল একটা অদ্ভুত কাণ্ড! উমাশশী বসে আছেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো, একখানা মোটা খাম হাতে নিয়ে। অমিতা ঢুকতেই বলে উঠলেন, 'এই দেখ অমি, সর্বনেশে কাণ্ড! একটা অচেনা লোক এই খামটা দিয়ে গেল আর বলে গেল, 'সুধীর হঠাৎ বাইরে চলে গেছে, ভাবতে বারণ করে গেছে, আর এইটা দিয়ে গেছে।'··· ভাবলাম চিঠি বোধহয়। কিন্তু এত মোটা কী এমন চিঠি!···খুলে দেখি কুড়িখানা একশ' টাকার নোট। জানি না, কী সর্বনাশ ঘটিয়েছে সে!'···

* * * *

সুধীর ঠিক সেই সময় ভাবছিল, 'জানে'র কথা সত্যি হয় বৈকি! এখন যদি আমি ভুলে যাই জগতে নীতি বলে কোন বস্তু আছে, তাহলেই ওর হাতে ওর কথামত কেবল মাত্র পাঁচ হাজার কেন, আরো অনেক—অনেক বেশী টাকা তুলে দিয়ে আসতে পারি।··· ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতা ওর আছে বৈকি, টাকার গদির উপর বসে থাকা, গাড়ী চড়া 'আমি'কে দেখতে পেয়েছিল ও। ওইটুকুই ওর দর্শনের সীমানা!

॥ ২১ ॥

মিসেস বিশ্বাস ওর নীরব চিন্তায় ঢিল ফেললেন। বলে উঠলেন, 'আশ্রমের কনকলতা আমার দিদি?' কে বলেছে তোমায় এ কথা?'

সুধীরও অনাদির মত বলে, 'সব কথা কি স্পষ্ট করে বলতে হয় ? চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়।'

'তাহলে তো জানতে আর কিছু বাকী রাখনি ! আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় দিদিকে পুলিসে ধরতে পারবে ?'

সুধীর গম্ভীরভাবে বলে, 'উনি যদি আশ্রম অধিকর্ত্রীর কর্তব্য ত্যাগ করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চান, হয়ত পারবে না, নচেৎ পারবে।'

কুসুমলতা অবুঝের স্বরে বলেন, 'কিন্তু পুলিস ওদের ধরবে কেন ? ওরা তো কিছু দোষ করেনি ? বরং ছেড়েই দেবে ওদের। তোমাদের বিশ্বাস সাহেবের ব্যবসা লাটে উঠবে।'

'পৃথিবী এত সোজা হিসেবে চলে না।'

'এই দেখ, বেশ যাচ্ছিলাম, তুমি আমায় একটা চিন্তায় ফেললে গো ! গাড়ী ঘোরাও সুধীর, ওইখানে নিয়ে চল আমায়।'

'আমি পাগল নই।'

কুসুমলতা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'তা হলে কি হবে ?'

'আপনি যা চেয়েছিলেন, তাই হবে !'

'ওরা ধরা পড়ুক, ওরা বিপদে পড়ুক, তাই চেয়েছিলাম আমি ?' ক্রুদ্ধ প্রশ্ন করেন কুসুমলতা।

'তা' চাননি হয়ত। সাহেব ধরা পড়ুন, সাহেব বিপদে পড়ুন, এইটুকুই শুধু চেয়েছিলেন, কিন্তু একই জালে পড়া পাখীরা কেউ ধরা পড়ে, কেউ পড়ে না, এ কী হয় ?'

'সুধীর, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আমার কান্না পাচ্ছে—'

'কাঁদুন ! তবে চেঁচিয়ে কাঁদবেন না, দোহাই আপনার !'

'দিদি ছাড়া আমাকে ভালবাসবার আর কেউ নেই, সুধীর !'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যদিও আপনি তাঁকে ঈর্ষা না করে পারেন না !'

কুসুমলতা উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'বেশ করব ঈর্ষা করব ! কেন করব না ? ও আমার সর্বস্ব কেড়ে রেখে দেয়নি ? ও নিজেও

ভোগ করল না, আমার ভোগেও আসতে দিল না। সারাজীবনটা ও দিব্যি মহিমময়ীর মূর্তি নিয়ে আমার স্বামীর শ্রদ্ধা ভালবাসা আর আকর্ষণের সবটুকু লুটে নিয়ে বসে রইল, আর আমি ভিখিরী হলাম, পাগল হলাম—'

'বেশী উত্তেজিত হবেন না। ভাগ্য বলে একটা অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস করুন!'

'অদৃশ্য শক্তি! অদৃশ্য শক্তি! সেই কথা বিশ্বাস করব আমি? জান, ওই যে আশেপাশে ছোট্ট এক একটা ঘুমিয়ে থাকা গ্রাম দেখছ, ওই রকম একটা গ্রামের ছোট্ট একটা মেয়ে ছিলাম আমি। তোমাদের বিশ্বাস সাহেব—'

'জানি!'

'জান! সবই জান! তা হলে? তা হলে কেন আমি ভাগ্যকে মানব?'

'ওটাই সান্ত্বনার উপায়। বিশ্বাস সাহেবও কম যন্ত্রণা পেলেন না সারাজীবন! এরপর আবার ঘানি ঘোরাতে হলে—'

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়েন কুসুমলতা। বলেন, 'সত্যি সত্যিই ওঁর জেল হবে. সুধীর?'

'বিচার শব্দটার যদি একটুও অর্থ থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক।'

কুসুমলতা চুপ করে যান। অনেকক্ষণ পরে বলেন, 'হয়ত তুমিও বিপদে পড়বে।'

'সেটাও অসম্ভব নয়।'

'গরীবের ছেলে তুমি, বিধবা মায়ের অবলম্বন, তোমাকে আমরা নষ্ট করলাম, সুধীর!' কুসুমলতার কণ্ঠে অনুতাপ।

সুধীর মৃদু হেসে বলে, 'তাই কি, হয়? কেউ কি কাউকে নষ্ট করতে পারে? যদি চেষ্টা করতাম, নিশ্চয়ই সরে যেতে পারতাম বৈকি আমি?'

'তবে সরে গেলে না কেন?'

'হয়ত লোভ, হয়ত অজানা তীব্রতার প্রতি একটা আকর্ষণ-তাই হয়ত...'

॥ ২২ ॥

মৌচাকে ধোঁয়া লেগেছিল। মৌমাছিগুলো তীব্র চীৎকারের সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল, গাল পাড়ছিল অদৃশ্য কোন শত্রুকে, তার মধ্যেই নিজেদের জিনিসপত্র সামলাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলছিল এই নিরাপদ আশ্রয়টুকু ঘুচে যাবার ভয়ে।

আশ্চর্য! রাতদিন যে কারাগার থেকে পালাবার স্বপ্ন দেখত বন্দিনীরা, সেই নিরেট দেওয়ালই এখন পরম আশ্রয় বলে মনে হচ্ছে।

আবার হয়ত আশ্চর্য নয়ও!

অনিশ্চিতের ভয় মানুষের সেরা ভয়। বিশেষ করে মেয়েমানুষের। কে বলতে পারে যারা মুক্তিদাতার ছদ্মবেশে এসেছেন, তারা আরো ভয়ঙ্কর কি না!

আচ্ছা এখানে কি 'ভয়ঙ্কর' বলে কিছু ছিল? কই? সত্যিই দুঃস্থ আশ্রমের মতই তো ছিল! ওরা আপন আপন জায়গাটুকুতে থেকেছে, গল্প করেছে, মৌন থেকেছে, ভাব করেছে, ঝগড়া করেছে। আর বাড়াভাত খেয়েছে। নিশ্চিত অন্নবস্ত্র, নিশ্চিন্ত শয্যা।

তবে মাঝে মাঝেই এক একটা ব্যাচ চালান হয়ে গেছে, আবার নতুন মুখ এসেছে। যারা চালান হয়েছে, কোথায় হয়েছে, তা এরা জানে না। ফিরে এসে কেউ তো কোনদিন বলেনি কেমন ছিল তারা!

তবে মোটামুটি সবাই জানে, ভিন্ন প্রদেশের 'বাঙালীনী'-কামী পুরুষরা মোটা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায় তাদের বিয়ে করবার জন্য। সেই বিয়ের ঘটক অফিস আছে, তারা মোটা দাদন দিয়ে রাখে বিশ্বাস সাহেবকে।

বিয়ে কি সত্যই করে? সে খবর এখানে এসে পৌঁছায় না।

আশ্চর্য! এত ভাব-ভালবাসা, এত সখিত্ব হয় এক একজনের সঙ্গে এক একজনের, তারা তো কই একটা চিঠিও দেয় না? তারা যেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

তবু, তা সত্ত্বেও যতক্ষণ এই 'আশ্রমের' দেয়ালের মধ্যে, ততক্ষণ তো নিশ্চিন্ততা ছিল। অনন্তকালের মানুষও তো জানে না কোথায় তারা যাচ্ছে। কোন বিবাহের বর তাকে গ্রহণ করবে! গিয়ে কেউ কোনদিন কোন খবর দেয় না। আর সকলেই জানে না কি যেতেই হবে একদিন। তবু তারা সেই অনিশ্চিত ঠাঁইটুকুকেই প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে থাকতে চায়।

এরাও চাইছে। এরা কনকলতার কাছে আছড়ে এসে পড়ে বলছে, 'ওমা, পুলিসের হাতে তুলে দিও না মা, আমাদের!'

কনকলতা তাঁর সোনায়গড়া গোপাল-ঠাকুরটিকে বুকে নিয়ে বসেছিলেন কাঠ হয়ে, আর উর্মিলা বসেছিল তাঁর গা-ঘেঁষে ঠাকুরেরই আসবাবপত্র সাজ-সরঞ্জামের বাক্সটা হাতে ধরে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মাঠে।

আর কিছু নেয়নি ওরা। কনকলতা বলেছেন, 'সব থাক্' উর্মি!'

মেয়েরা এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কনকলতা গম্ভীরভাবে বলেন, 'পুলিসের হাতে আমি তোমাদের তুলে দেব এমন অদ্ভুত কথা ভাবছ কেন? পুলিস এসে বাড়ি ঘিরেছে দেখতেই তো পাচ্ছ?'

'আমরা তো কোন দোষে দোষী নই মা, পুলিস কেন—'

কনকলতা হেসে বলেন, 'তোমরা কেন দোষী হতে যাবে? দোষী তোমাদের মালিক। বিশ্বাস সাহেবের ওপর পুলিসের নজর পড়েছে।'

মেয়েগুলো সকলে একসঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমরা সবাই সাক্ষী দেব। বলব উনি কোন দোষে দোষী নয়। উনি আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। আমাদের খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন। যখন যা দরকার জোগান দিচ্ছেন—'

কনকলতা হেসে উঠে বলেন, ‘তবু তোমাদের সাক্ষ্য-টাক্ষ্য মারা যাবে, বাপু! পুলিস যখন জিগ্যেস করবে, “তা তো করছেন, কিন্তু শেষে কি করছেন?” তখন কি বলবে?’

‘বলব—সে কথা আমরা কি জানি?’

‘সেই তো! পুলিস বলবে—সে জানে। খুব জানা কোন লোক জানিয়ে দিয়েছে কিনা।’

‘হায় হায়! কে এমন শত্রু ছিল গো সাহেবের? আমরা তো বলাবলি করি ‘দেবতা’!’

‘দেবতা!’ আবারও হেসে ওঠেন কনকলতা।

তারপর সহসাই গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘তা তোমরা হয়ত ঠিকই বলেছ। তবে দেবতাদের লীলাখেলা মানুষের বোঝা অসাধ্য এই যা! মিছিমিছি হৈ-চৈ করে কোন লাভ নেই, চুপচাপ বসে থাক। দেখ নিয়তি কোথায় নিয়ে যায়। এই তো, আমি কি চেঁচাচ্ছি?’

ফণিনীরা এতক্ষণ মাথা কুটছিল, সহসা এই কথায় ফণা ধরে ওঠে—‘তুমি কেন চেঁচাবে? তোমার বুকে বল আছে। ঘুষ-ঘাষ দিয়ে সাহেব ঠিক বেরিয়ে যাবে, তোমাকেও নিয়ে যাবে। মরতে আমরাই মরব!’

মুহূর্ত পূর্বে যে সাহেবকে দেবতার মর্যাদা দিচ্ছিল, তারা, সেকথা আর মনে রাখে না।

কিন্তু স্পষ্টভাষিণী ঊর্মিলা মনে পড়িয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, ‘কেন, এক্ষুনি তো সাহেবকে ‘দেবতা’ বলছিলে, আবার এসব কথা কেন?’

‘তুই থাম্ তো পুঁচ্‌কে ছুঁড়ি! সব সময় কটকটানি!’ একটা আধাবয়সী বিধবা তীব্র গলায় বলে, ‘বলছি কি সাধে? দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে সাহেবের গাড়ী আসবে, তোর সেই ভালবাসার ড্রাইভার আসবে। আর দু’জনে টুপ করে গাড়ীতে উঠে বসে হাওয়া হবি!’

‘দেখ, ভাল হবে না বলছি—’

ভাব দেখে মনে হয় মারামারি করতে হলেও পিছপা হবে না। কিন্তু কনকলতা থামালেন। কড়া-গলায় বললেন, 'ঝগড়া কোঁদল করবার সময় এটা নয় উর্মিলা, চুপ করে বসে থাক্, কেলেঙ্কারী বাড়াসনে।'

'ওরা অমন অসভ্য কথা বলবে কেন?' উর্মিলা ফুঁসতে থাকে।

আর উর্মিলার থেকে সামান্য বড় একটা আধুনিকা মেয়ে এই 'শিয়রে শমন' নিয়েও হিহি করে হেসে উঠে বলে, 'বললেই অসভ্য! বুঝতে আর কে না পারে? ড্রাইভারটিও তো তোমায় দেখতে দেখতে—'

'মা, আমি কিন্তু মারবো ওদের—'

উর্মিলা হাতের বাক্সটা নামায়। আর কনকলতা তাকে এবং সকলকেই স্তম্ভিত করে দিয়ে বলে ওঠেন, 'সত্যি কথা শুনলে তুই অমন রেগে উঠিস কেন, উর্মি? এই তোর একটা মস্ত দোষ! সুধীর ড্রাইভার তোকে দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে যায় এ আর কে না দেখেছে?'

'তুমি? তুমিও এই কথা বলছো?'

উর্মিলা বাক্স ফেলে রেখে দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কনকলতা নরম গলায় বললেন, 'দেখ মেয়ের কাণ্ড! ভালকথায় কান্না কেন? কেউ যদি তোকে ভালবাসে, সে তো আহ্লাদের কথা, গৌরবের কথা! ভালবাসা ভগবানের কাছ থেকে আসে।'

সেই আধাবয়সী বিধবাটা এবার রূঢ়গলায় বলে, 'সেই কথাই তো বলছি, তোমাদের ভগবান আছে, ভালবাসার মানুষ আছে, তাই বুকের বল আছে। আমাদের কী আছে?'

কনকলতা এ প্রশ্নের কী জবাব দিতেন কে জানে, ওদের কী আছে, তা কিভাবে বোঝাতেন কে জানে, কিন্তু কথা বলা হল না। একটি পুলিস কর্মচারী এসে দাঁড়াল সামনে।

নম্র চেহারা, অল্প বয়স। শান্তগলায় বলল, 'আপনাদের জিনিস ...ত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হ'ন, একবার থানায় যেতে হবে?'

কনকলতা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন, 'এখুনি যেতে হবে!'

'সেই রকমই অর্ডার আছে!'

উর্মিলা কান্না মুছে ফস করে বলে ওঠে, 'এক্ষুনি বললেই এক্ষুনি? ওই যে অতগুলো মানুষের ভাত রাঁধা হয়েছে, সেগুলো ফেলা যাবে, আর মানুষগুলোকে উপোসী থেকে তোমাদের থানায় গিয়ে বসে থাকতে হবে? কেন, ভাত ক'টা খেয়ে গেলে হত না?'

পুলিস কর্মচারীটি মৃদু হেসে বলে, 'থানার অর্ডারে ভাত খাওয়ার কথা থাকে না।'

'তা অর্ডার যাই থাক্—' উর্মিলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'আপনার একটা মনুষ্যত্ব আছে তো? মানুষগুলোর মুখের ভাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে প্রাণে লাগবে না? এক ঘণ্টা পরে নিয়ে গেলে কি কেউ আপনাকে ফাঁসি দেবে?'

কনকলতা হতাশ গলায় বলেন, 'তুই একটু চুপ কর, উর্মি!'

'চুপ করব? চুপ করে বসে থাকলে জগতের কেউ কিছু দেয় কাউকে? তা যদি হত তা'হলে পুলিসের আইন এমন সৃষ্টিছাড়া হত না!'

'তোর নিজের খুব খিদে পেয়েছে বুঝি, উর্মিলা?'

'আমার? আমা খিদের জন্যে বলছি?'

'উর্মিলা'—আর একবার ডাকেন কনকলতা।

সে ছেলেটাও ধরা পড়েছে নির্ঘাৎ! গাড়ীটাই তো আগে আটক করবে পুলিস। যত কুকাজের সাক্ষী তো গাড়ী আর তার চালক।

ঘণ্টা দুই পরে 'মৌচাক' খালি হয়ে যায়। লম্বা পুলিস ভ্যানে চড়ে বেরিয়ে যায় মৌমাছিরা অনিশ্চিতের পথে।

কনকলতা আর তাঁর সোনার গোপাল?

উর্মিলা আর তার বাক্স?

তা' শেষ পর্যন্ত অভিযোগকারিণীদের কথাই প্রায় সত্যি হয়ে দাঁড়াল। ওঁদের আলাদা একটা গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হল,

অন্যত্র। 'দেব বিগ্রহকে' পবিত্র স্থানে রেখে আসতে পারবার অনুমতি জুটেছে কনকলতার। অতএব সাকরেদটিরও।

যারা জালে ঢাকা লম্বা গাড়ীতে উঠল, তারা বলতে বলতে আর গাল দিতে দিতে গেল—'দেখলি তো? বলিনি? সাহেবের সোহাগিনীকে ঠিক ঘুষ দিয়ে বার করে নেবে সাহেব!...গোপাল ঠাকুর রাখতে যাবেন! ছুতো ছুতো! বুঝি না আমরা কিছু?'

নিতান্ত কমবয়সী মেয়ে ক'টা উর্মিলার উপর রাগে ফুঁসছিল আর বলাবলি করছিল, 'দেখিস. ও ঠিক ওই ড্রাইভারটার সঙ্গে ভাগবে। ষড়যন্ত্র করা আছে তলেতলে। গিন্নীর আঁচলটি ধরে বসে আছে! চালাক কম?'

ওদের নিজেদের কী হবে, এ চিন্তার থেকে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা হচ্ছে, সকলের মধ্যে থেকে একজনের হয়ত ভাল কিছু হবে!

আমার যদি খারাপ হয়, অন্যের কেন না খারাপ হবে! অন্যের খারাপ হয়ে আমার ভাল হওয়াটা ছিল উত্তম, সেটা যখন হচ্ছে না, এটাই হোক।

কিন্তু ওদের ইচ্ছেয় কিছু হচ্ছে না। শুধু অনেক জায়গা থেকে এসে পড়া অনেক বয়সের, অনেক চেহারার, অনেক প্রকৃতির, অনেক-গুলো মেয়ে অন্ধকার একটা ভবিষ্যতের দিকে এগোতে থাকে অন্ধকার একটা গাড়ী চড়ে।

নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতের আছাড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া এই রঙ্‌চটা বিকৃত-মূর্তি পুতুলগুলো এর চাইতে উচ্চতর চিন্তা করবেই বা কোন্ সম্বল নিয়ে?

'আমরা কোথায় যাচ্ছি মা?' জিগ্যেস করে উর্মিলা।

কনকলতা বললেন, 'কদমতলার গোবিন্দবাড়ি!'

'সেখানে তোমার ঠাকুর রাখবে? তারপর গোবিন্দবাড়ি থেকে কোথায় যাব?'

'খুব সম্ভব হাজতে।'

'হাজতে?'

ঊর্মিলা উত্তেজিতভাবে বলে, 'সেখানে ওদের সঙ্গে দেখা হবে? সুষমা, অনিমা, মায়া, নন্দরাণী, ওদের সঙ্গে?'

'তা হবে বোধহয়!'

ঊর্মিলা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'হলেই ভাল।'

'ওমা কেন রে?'

'কেন জান? ওরা মনে করছে আমরা বুঝি পুলিসের হাত এড়িয়ে দিব্যি পলায়ন দিয়েছি, ওখানে দেখলে বুঝবে আমরা এত অসভ্য নই যে, সবাইকে বিপদের মুখে ফেলে নিজেরা চম্পট দেব।'

ঊর্মিলা ওই ব্যবহারটাকে অসভ্যতা ভাবে।

কিন্তু উমাশশী তাঁর সভ্য ছেলের ব্যবহার সম্পর্কেও ওই 'অসভ্যতা' অপরাধটি আরোপ করেন। বলেন, 'আমাদের এই বিপদের মুখে ফেলে রেখে নিজে দিব্যি চম্পট দিয়ে বসে রইল! ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি, কখন পুলিস আসে, কখন পুলিস আসে! ঈশ্বর জানেন, কোথায় কি কাজ করে ফেরার হয়েছে!...টাকা পাঠিয়ে মুখ বন্ধ করছে আমার, কিন্তু আমি তোকে বলছি অমি, ওই টাকাই আমার মৃত্যুবাণ হবে!'

অমিতা বিরক্ত গলায় বলে, 'হলে একা তোমারই হবে না মা, সকলেরই হবে।'

'তা কেন?' উমাশশী বলেন, 'বেরোবে তো আমারই বাক্স থেকে!'

'বেশ তো, আমার বাক্সেই রাখ তা হলে।'

উমাশশী একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে বলেন, 'আর কি! ডাইনীর কোলে পো সমর্পণ! বরং পোস্ট অফিসে জমা দিলে—'

'সেটাও সন্দেহের।'

'তাও ভেবেছি! ওই তো হয়েছে জ্বালা! চোরাই টাকা নিয়ে আমার একেবারে ভয়ে—'

অমিতা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'না খবর নিয়ে হঠাৎ চোরাই বলছ কি বলে, মা? দাদা কি তোমার সেই রকম ছেলে?'

'ছিল না! হয়েছে!' উমাশশী সতেজে বলেন, 'মতি-গতি ওর বিগড়েছে আজকাল!'

অমিতা একথার প্রতিবাদ করবে, এমন দলিল অমিতার হাতে নেই, তবু অমিতার মন কিছুতেই মায়ের কথায় সায় দিতে পারে না। হঠাৎ কী হতে পারে সুধীরের, এই কথা ভাবতে ভাবতে একশ' রকম গল্প রচনা করে মনে মনে, আর তলে তলে খোঁজ করে বেড়ায়। কিন্তু কতটুকুই বা সন্ধান মিলেছে?

আলতার কারখানায় পুলিস হানা দিয়ে কারখানা 'লক্' করে দিয়ে গেছে, একথা তো সেদিনই জেনেছিল অমিতা। জেনেছিল বিশ্বাস সাহেবকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

নতুনের মধ্যে শুনল একদিন, মেমসাহেব এই মওকায় হাওয়া হয়ে গেছেন! কোথায়?

যেখানে প্রাণ চেয়েছে!

কার সঙ্গে?

যাকে প্রাণ চেয়েছে!

অনাদিই এসব খবরের খবর-দাতা।

আশ্চর্য, অনাদি ধরা পড়েনি! অনাদি হয়ত বা গুপ্তচরের মহিমময় পোস্টে অবস্থান করছে! অথবা অনাদি গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আওতায় পড়েনি!

অনাদিকে বিশ্বাস সাহেবের বাড়ি আগলে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ওর ভঙ্গীটা বিশ্রী, অসম্মানজনক। তবু প্রাণের দায়ে ছুটে ছুটে গিয়েছে অমিতা।

আর ওই খবরটুকু সংগ্রহ করেছে।

তবে কি অমিতা তার মায়ের ধারণারই সমর্থক হবে? ভাববে—দাদার মতিগতি বিগড়েছে? দাদা এতদিন তলে তলে বুড়ো সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নীর সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছিল, এখন মওকার মাথায় তাকে নিয়ে ভেগেছে!

ভাবতে কষ্ট হবে? কিন্তু তাছাড়া ভাল আর কিছু ভাববার জন্য দিচ্ছে কে অমিতাকে? রেস্তু? সে তো মেমসাহেবই জোগাতে পারবেন। একশ' টাকার নোটের 'চার' ফেলছিলেন যিনি বঁড়শির আগায় অনেকদিন ধরে।

ক্রমশঃই দাদার উপর একটা আক্রোশ জমতে থাকে অমিতার কোন খবর না পেয়ে, আর সেই আক্রোশই আস্তে করে বিশ্বাসের মূল শিথিল করছে।

কী কুগ্রহ হয়ে এসেছিল বিশ্বাস সাহেবের এই চাকরীটা!

অমিতারা গরীব ছিল, কিন্তু তাদের জীবন এমন জটিল ছিল না। অমিতার মায়ের অসন্তোষ আর অর্থ-লালসাই কি এইখানে আছড়ে এনে ফেলল তাদের সংসারকে? নাকি গ্রহ, ভাগ্য, নিয়তি, এদের মানতে হবে?

জামিনে খালাস হয়ে বাড়ি ফিরলেন বিশ্বাস সাহেব, ফোন করলেন মিস্টার ঘোষকে। যিনি সেদিন মৌচাকের মৌমাছি উড়িয়ে জালবদ্ধ করে ধরে নিয়ে যাবার কর্তা ছিলেন। বললেন, 'শুনুন, সেই মহিলাটি আর বালিকাটির কী করলেন?'

ওদিক থেকে উত্তর এল, 'যা কথা ছিল তাই করা হয়েছে। কদমতলার ওই মন্দিরের সেবাইতের বাসাতেই রয়েছেন।'

'দেখুন, ওঁদের যেন কোনমতেই কোন হ্যারাস করা না হয়।'

'আজ্ঞে না!'

'আমার বোধহয় এ যাত্রা আর উদ্ধার হল না। যাক্‌গে উদ্ধার হবার ইচ্ছেও খুব নেই।...বড় টায়ার্ড হয়ে পড়া গেছে। দু'দিন নিশ্চিন্তের অন্ন খেলেও মন্দ হয় না। সে যাক্‌...আপনার কাছে যে টাকা দেওয়া আছে, তার থেকে এক হাজার আপনি ওনাকে দিয়ে দেবেন, বুঝলেন?...হ্যাঁ, দিয়ে দেবেন। আপনাদের পুলিসের লোকদের বিশ্বাস নেই মশাই!'...

টেলিফোন ছেড়ে রেখে নিজ মনে হঠাৎ নিতান্ত অশালীন স্বরে বলে ওঠেন, 'শালা হারামজাদা!'

তারপর ঘুরে ঘুরে সারা বাড়িটা দেখে বেড়ান। এ বাড়ির সর্বত্র কি কখনও বিশ্বাস সাহেবের পায়ের ধুলো পড়েছে? দু'তিনটে ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা, এইটুকুতেই চলাফেরা ছিল।

ভাবলেন, আচ্ছা কুসুমও কি শুধু ওই প্রয়োজনের সীমাটুকুর মধ্যেই ঘোরাঘুরি করত? নাকি সব ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াত? ঘুরে বেড়াত ছাদ, দালান, উপর সিঁড়িতে?

ভারী একটা কৌতূহল অনুভব করলেন বিশ্বাস সাহেব। ঘুরে দেখতে লাগলেন কুসুমের হাতের অথবা পায়ের ছাপ সর্বত্র আছে কিনা।

সব ঘুরে এসে দাঁড়ালেন গ্যারেজের উপরকার ছোট্ট ঘরটায়। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে পাশ দিয়ে দুটো ধাপ উঠে গিয়ে যেখানে পৌঁছান যায়। দরজায় তালা লাগান।

অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তালা সব ঘরেই লাগান ছিল, পুলিস লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বাড়ি সার্চ করার শেষে। বিশ্বাস সাহেব আবার সে তালা খোলবার অনুমতি পেয়েছেন।

প্যান্টের পকেট থেকে রিংটা বার করলেন, একশ'টা চাবি লাগিয়ে লাগিয়ে খুলতে পারলেন না। ফিরে এলেন ঘরে।

তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন কুসুমের নিজস্ব জায়গাগুলো। টেবিলের ড্রয়ার, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার।

এক সময় সাধনার সিদ্ধি হল। পেয়ে গেলেন ছোট্ট একটি রিঙে ছোট্ট একটি চাবি। কুসুমের চুল বাঁধার সরঞ্জামের সঙ্গে ছিল।

সরঞ্জাম তো কম নয়! কত কাঁটা কত ক্লিপ, কত ফিতে আর 'নাইলন-চুলের' গুছি, ইয়ত্তা নেই তার।

চাবিটা হাতে ধরেই মনটা একবার দুলে উঠল বিশ্বাস সাহেবের। কাজটা কি বেশ উচিত হচ্ছে?

পরের চিঠি, পরের বাক্স, পরের ঘর মালিকের অজ্ঞাতসারে খোলা! কিন্তু সে চিন্তাকে সরালেন মন থেকে।

স্ত্রীকে শাস্ত্রমতে বলে অর্ধাঙ্গিনী, অতএব 'পর' বলা যায় না! অতএব দৃঢ় পায়ে আবার অগ্রসর হলেন সেই ছোট্ট ঘরটার দিকে।

কী আছে? কী আছে?

কই, কোনদিন তো কুসুমকে এদিকে দেখেননি বিশ্বাস সাহেব! কোন্ সঞ্চয়ে ভরিয়ে রেখেছে এ ঘর? অথবা কোন্ সাজে সাজিয়ে?

তালায় চাবিটা লাগালেন।

মনে মনে হাসলেন. গ্রামের সেই মেয়েটা তো! হয়ত 'ঠাকুরঘর' বানিয়ে রেখেছে এক [illegible]!

তাই সম্ভব।

ওর দিদি তো ঠাকুরের বিকার নিয়েই—

সাড়ে চারশ' টাকা দিয়ে 'গোপাল' গড়িয়ে দিয়েছিলেন সেবার বসন্ত বিশ্বাস স্ত্রীর দিদিকে।

কুসুম ওসব কিছু চায়নি কোনদিন। অবশ্য কুসুমের চাইবার প্রয়োজনই বা কী ছিল? টাকার গদি পেতে বসিয়ে রেখেছিলেন বিশ্বাস সাহেব তাঁর তরুণী ভার্যাকে। যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কোনদিন কোন কৈফিয়ৎ চাননি। তবু—

হ্যাঁ, তবু কুসুম অহরহ অভিযোগ করেছে, অসন্তোষ প্রকাশ করেছে,

ধিক্কার দিয়েছে স্বামীকে, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে। দামী দামী শাড়িগুলি দু'দিন পরে দাসীদের বিলিয়ে দিয়েছে, আর বিকৃত হাসি হেসে বলেছে, 'দেখ, অসাবধানে যেন আবার 'আমি' ভেবে ভুল করে বোস না ওদের।'

বলেছে, 'বাসায় গিয়ে বলবে নিশ্চয়, সাহেব বক্‌শিস্ করেছেন, কি বল ?'

বিকৃত হাসি। বিকৃত পরিহাস। এই ছিল কুসুমের হাতিয়ার!

হয়ত গণ্ডারের চামড়াটা কিছুতেই বিদ্ধ করতে পারত না বলেই প্রতিক্ষণ অস্ত্রে শান দিত।...

কিন্তু এসব কি কোনদিনই ও সুস্থ অবস্থায় বলত ?... বোধহয় না।

সুস্থ অবস্থাটা ক্রমশঃই তো সংক্ষিপ্ত করে আনছিল।

কতদিন বলেছেন বিশ্বাস সাহেব, 'একটু কমালে ভাল হয় না ? জান তো এর পরিণাম ?'

কুসুম বিজড়িত গলায় বলত, 'জানি বলেই তো আরো চালিয়ে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত যখন ডাক্তারের হাতে পড়তে হবে, নিশ্চয় শহরের সেরা ডাক্তারের হাতেই পড়তে হবে, তারা দেখবে বিশ্বাস সাহেবের মেম বেপরোয়া মদ খেয়ে খেয়ে লিভার পচে মরতে বসেছে।...হি-হি-হি, কী মজা!'

কুসুমের সেই মত্ত-বিজড়িত স্বরটাই কানে বাজে। স্বাভাবিক সুরে কবে কথা বলত মনে পড়ে না যেন। এই ঘরটা খুললেই কি হঠাৎ সেই সুরে হেসে উঠবে কুসুম অদৃশ্য কোনখান থেকে ?

দেখা যাক।

তালাটা খুললেন। ধাক্কা দিলেন দরজায়। আর কপাট দুটো খুলে পড়তেই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

একী! এত রকম ভাবছিলেন, এটা তো ভাবেননি।

॥ ২৩ ॥

না, এটা ভাবেননি বিশ্বাস সাহেব। এটা তাঁর ধারণার বাইরের বস্তু।

পুরো একখানা ঘর বোঝাই করে মিসেস বিশ্বাস যে শুধু খোকা পুতুল জমিয়ে রেখেছেন, ভাববেনই বা কি করে? কখন সংগ্রহ করেছেন তিনি এত অজস্র পুতুল? বোঝা যাচ্ছে নিতান্তই সংগোপনে। আর দীর্ঘদিন ধরেই করেছেন তাতে আর সন্দেহ কি?

অথচ টের পাননি বিশ্বাস সাহেব। তাঁরই নিজের বাড়ির মধ্যে একটি কোণকে আশ্রয় করে যে এতগুলি শিশু প্রতিপালিত হচ্ছে, তা কোনদিন জানতে পারেননি।

খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে পুতুলগুলোকে তাও নয়, শুধু যেন কিনে এনে এনে জমা করা হয়েছে মাত্র। সেই জমার অঙ্ক ক্রমশ পাহাড় হয়ে উঠেছে। সেল্‌ফে, দেয়াল-আলমারীতে, চৌকির উপর, ঘরের মেঝেয় ডাঁই করা আছে—সেলুলয়েডের খোকা, প্লাস্টিকের খোকা। নাইলনের খোকা, ন্যাকড়ার, কাগজের, মাটির অজস্র খোকা। নানা মাপের নানা ছাঁদের। কিছ্ ধুলোয় বিবর্ণ, কিছু বা উজ্জ্বল মসৃণ।

তার মানে যখন যেখানে যেমনই হোক দেখেছে আর কিনেছে, তারপর এনে জমা করেছে এইখানে। কনকের গোপাল পূজোর সঙ্গে কি মিল আছে কনকের বোনের এই পাগলামির?

বিশ্বাস সাহেব একটা গভীর বিস্ময়ের অনুভূতিতে যেন তলিয়ে গেলেন। সবাইয়ের কি এমন হয়? ছেলেমেয়ে না হলেই এই রকম পাগলামি করে মেয়েরা?

বিশ্বাস সাহেব নিজেও তো নিঃসন্তান, কই এমন অদ্ভুত কোন শূন্যতা তো অনুভব করেন না কখনও? চিন্তার মধ্যে আসেই না।

অথচ এরা দুই বোন শুধু ওই অভাবটার জ্বালায় সম্পূর্ণ একটা পাগলের ভূমিকা নিয়ে বসে আছে।

কনক তো তবু কিছুটা সাধারণ, অনেক বন্ধ্যা আর বাল-বিধবারা 'গোপাল' নিয়ে মাতামাতি করে, কিন্তু কুসুমের মত এমন ঘরভর্তি পুতুল লুকিয়ে রাখে কি কেউ ?

কুসুম কি নিঃশব্দে সকলের অগোচরে এই ঘরটায় এসে বসে ? এই পুতুলগুলোকে কোলে করে, আদর করে ? এদের সঙ্গে হাসে, কাঁদে ? এগুলোকে ফেলে চলে যেতে কি প্রাণটা হাহাকার করেছে তার ? কনকলতা তাঁর গোপালের জন্য সুবিধা পেলেন, ছাড়া পেলেন, গোপাল নিয়ে সুখেই আছেন খুব সম্ভব। পুতুলকে প্রতিমা করে তুলতে পারলেই হয়ত সুখ মেলে, শান্তি মেলে।

কুসুম তার পুতুলে দেবত্ব আরোপ করতে পারেনি, তাই কুসুম যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তবু এই পুতুলগুলোর জন্যই কি ব্যাকুল নিশ্বাস ফেলবে কুসুম ? না কি ভুলে যাবে ওদের কথা ? পুতুলের সাধ্য নেই মনের জায়গা জুড়ে থাকবার ?

বিশ্বাস সাহেবের ঠোঁটের কোণায় ক্ষুব্ধ একটু হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসির অর্থ,একেবারেই পারে না কি করে বলা যায় ? বিশ্বাস সাহেবের কেন বিষণ্ণ নিশ্বাস পড়ছে তাঁর ঘরের সাজান পুতুলটির জন্য ?

ঘুরে ঘুরে পুতুলগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন বিশ্বাস সাহেব, কোনোগুলিকে জামা সেলাই করে পরিয়েছে, কোনোগুলি এমনিই বসে আছে দুই হাত বাড়িয়ে কোলে ওঠবার ভঙ্গীতে।

ওঁর এখনও বিশ্বাস—'মা হবার ক্ষমতা ওঁর মধ্যে আছে, ত্রুটি অন্যত্র !' ভাবলেন বিশ্বাস সাহেব।

এই ভেবে পাগল হয়ে যেতে বসেছে ও। এই ভাবনায় বাঘিনীর মতো গজরায় ও, সাপিনীর মত ফোঁসে, আমাকে বিষে জর্জরিত করে। আর তার বেশী জর্জরিত নিজে হয়, আর কাঁদে।

আমি তো আর নীতিবাগীশ নই। আমি ভাবি না, স্ত্রী-পুরুষের

মিলনটা ভয়ানক একটা কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা। একটু জোরাল আমোদ এ ছাড়া আর কি—এই আমার মত, তাই আমি আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে অবাধ অনুমতি দিয়ে রেখেছি ওর নিজের ক্ষমতাকে পরীক্ষা করবার জন্য।

কিন্তু ও সে সুযোগ নিতে পারল না।

জানি কোনদিনই পারবে না।

ওদের রক্তের মধ্যে বহু যুগের পবিত্রতার সংস্কার, সেই সংস্কার ওদের দুটো বোনকেই চিরবঞ্চিত করে রাখল।

হ্যাঁ, বঞ্চিত বৈকি। বিশ্বাস সাহেব আর একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেললেন। যদিও ওদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি দেখলে লোকে কথাটাকে হাস্যকর ছাড়া আর কিছু বলবে না, তবু বিশ্বাস সাহেব তো জানেন। জানেন, বাল-বিধবা কনক নিজের নীতিতে বিশ্বাস করেছিল তার সেই বাল্যবিবাহটা একটা প্রহসন মাত্র, সেটাকে অস্বীকার করায় পাপ নেই। বিশ্বাস করেছিল 'বসন্ত বিশ্বাস' নামের মানুষটাই তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী, সেই বিশ্বাসে ঘরের চৌকাঠ ত্যাগ করেছিল সে। কিন্তু বসন্ত বিশ্বাস নামের সেই মানুষটার জীবনের নীতি ছিল আলাদা। জীবনকে সে কখনও ভয়ানক একটা 'সিরিয়াস্' বলে ধরত না।

অতএব তার জীবনের নীতিও কোনদিন সিরিয়াস্ নয়। তাই প্রিয়ার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে মিনিট গুনতে গুনতেও সে আর একটা মেয়েকে নিয়ে মজা করতে বসতে পারে।

সেই মজাই সাজা হল তার জীবনে।

আপন মনে একটু দার্শনিকের হাসি হাসলেন বসন্ত বিশ্বাস।

কনকের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে জীবনটা বরবাদ দিল হতভাগা। তবু কনকের প্রভাব মুক্ত হতে পারল না। পারল না কনককে অবহেলা করতে, অগ্রাহ্য করতে, ত্যাগ করতে। কনকের ইচ্ছার খাজনা জুগিয়ে চলেছে সে জীবনভোর। কনকের সেই বহুযুগ

সঞ্চিত সংস্কারকে মেনে নিয়ে 'সোনার গোপাল' গড়িয়ে দিচ্ছে তার জন্য। আর মুহূর্তের খেলার পুতুলটাকে 'জীবনের সম্বলের' রূপ দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্য আরো অসংখ্য মেয়েকে নিয়ে খেলাকরাকে হয়ত ক্ষমা করে নিতে পারত কনক। ক্ষমা করতে পারল না তার নিজের একান্ত স্নেহের বস্তুটার ক্ষেত্রে। ও সেটাকে ভয়ঙ্কর একটা পাপ বলে গণ্য করল, তাই ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি ধার্য করল। বিশ্বাস সাহেবের জীবন বিশ্বাসকে বুঝতে পারল না।

তবু কনক আত্মস্থ। তার ছোট বোনের মতো উদ্‌ভ্রান্ত নয়।

জানেন বিশ্বাস সাহেব সে কথা। কারণটাও জানেন বৈকি।

কনক জানে, সে সব পেয়েছে, তার সব আছে, নিজেই সে যতটুকু ইচ্ছে রেখেছে, যতটুকু ইচ্ছে ফেলেছে। আর কুসুম জানে, কিছুই পায়নি সে, তার জমার ঘরে শূন্য। 'পাওয়া'র মত দেখতে মস্ত একটা ফাঁকি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে জীবনভোর।

কতকগুলো পুতুল হাত দিয়ে ঠেলে রেখে চৌকিটার উপর বসে পড়লেন বিশ্বাস সাহেব। আর অনুভূতির একেবারে তলায় তলিয়ে গিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। ফাঁকিটা কি আজও ফাঁকি হয়েই আছে? ধীরে ধীরে কি কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি তার? নিজের মধ্যে এমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে কেন তবে বিশ্বাস সাহেব নামের বাঘা লোকটার? কেন মনের মধ্যে খুব নরম একটা জায়গায় ক্ষতের জ্বালার মতো একটা জ্বালা বোধ করছেন তিনি এখন?

উঠে পড়লেন, বেরিয়ে এলেন, চাবিটা লাগিয়ে নিজের ঘরে এসে বসলেন।

কিভাবে কি করল সুধীরটা, কে জানে!

ওই আর একটা লোক, যার দ্বারা কিছুতেই নীচ কাজ সম্ভব নয়। কুসুমের সমগোত্র ও। ওপরে ভাব দেখাবে যেন বেপরোয়া, অথচ প্রতি পদক্ষেপেই পরোয়া করে চলেছে। পরোয়া করে চলেছে

বিবেকের, হৃদয়নীতির, সমাজনীতির। খুব জব্দ করা গেছে ছোকরাকে! সামান্য একটু কৌতুকের হাসি হাসলেন বিশ্বাস সাহেব, ভাবলেন—রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় দেববিগ্রহ নিয়ে পালিয়ে-বেড়ানো মন্দিরের পূজারীর অবস্থা ঘটেছে ওর। মনিব গিন্নীকে মাথায় করে বয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রাণ যাচ্ছে।

অনেকগুলি টাকা আছে সঙ্গে।

কে জানে ওইগুলিই ওর বিপদ ঘটাবে কিনা, অথচ দ্বিতীয় আর কোন উপায় ছিল না তখন। তাছাড়া দু'হাতে টাকা ছড়াতে ছড়াতে যেতে না পারলে পালিয়ে বেড়ানোর পথই বা মসৃণ হবে কিসের জোরে?

চালাক আছে ছোকরা, সাহসীও আছে, এই যা ভরসা! ওর ওই সাহসের জন্যই প্রথম দিন থেকে ওকে পছন্দ করেছিলাম আমি। বিনীতভাবের অন্তরালে আগুনকে চেপে রাখত। সেই আগুন ওকে রক্ষা করবে।

তবে বোকা কুসুমটা বড় অকস্মাৎ এমন একটা বোকামী করে বসল! কুসুমের কাছ থেকে এতখানি করিৎকর্মা-ভাবের কাজ আশা করেননি বিশ্বাস সাহেব। তবু ওর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারছেন না বিশ্বাস সাহেব, কারণ কুসুমকে উনি বোঝেন।

তারপর নিজের কথা ভাবলেন।

দু'এক বছর ঘানি ঘুরিয়ে আসতে পারলে মন্দ হত না। হয়ত খুব গভীর একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হত সেই সময়টুকুর মধ্যে। কিন্তু হলে তো দু'এক বছর হবে না। হয়ত পাঁচ-সাতটি বছরের মতো দেবে ঠেলে।

সেই অন্ধকূপ হত্যা হতে তেমন রাজী নয় বিশ্বাস সাহেব। অতদিন ধরে সমাজ মানুষের সঙ্গে সংস্রবচ্যুত হয়ে থাকার পর নিজেরই হয়ত মন বদলে যাবে। এ সমাজে আর ঠাঁই নিতে ইচ্ছে হবে না।

শেষ পর্যন্ত গেরুয়া ধরে হিমালয় যাত্রা করছেন বিশ্বাস সাহেব, এ দৃশ্য না সবাইয়ের দেখতে হয়।

যেতে অবশ্য এখনও পারেন, এই মুহূর্তেই পারেন, তার জন্য হয়ত ওই পাঁচ-সাত বছরের বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন হয়ও না। নিজের মধ্যে সেই বন্ধন-বিচ্ছিন্নতা আছে। সে কথা জানেন আলতার কারবারী বসন্ত বিশ্বাস। তবে সে ইচ্ছে আপাতত নেই।

দু'একবছর জেল খেটে এসে সেই পটভূমিকায় সমাজকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখা যাক্ মেয়াদটা সেই স্কেলে নামান যায় কিনা।

কুসুম যদি তাঁকে বলে-কয়ে করত, যদি রাগের অসতর্কতায় কোন সময় ব্যক্ত করে ফেলত তার বাসনা, অর্থাৎ তার স্বামীর মুখোস খুলে দেবার বাসনা, তাহলে কতকটা গুছিয়ে নিতে পারতেন বিশ্বাস সাহেব। আর কুসুমকেও এমন করে কলার ভেলায় চাপিয়ে সাগরে ছেড়ে দিতে হত না। বড় আচমকা সিদ্ধান্ত করেছে কুসুম, আর সে সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করেছে।

তারপর, সব পরে ভাবলেন, সুধীরের বাসার একবার খবর নেওয়া দরকার। আরও কিছু টাকাকড়ি দেওয়াও দরকার। 'মা বোন' বলে মরে যায় ছোকরা!

নিজে যাবেন?

গেলেই তো আবার ওর বাসাটাকেও পুলিসের চোখে ভাল করে ধরিয়ে দেওয়া। যদিও গাড়ির ড্রাইভারের সন্ধানই আগে করবে পুলিস।

পুলিসের ঝাঁকের ভেতর মাঝে মাঝে এক-আধটা ধর্ম অবতার এসে ঢুকে পড়ে অকারণ কতকগুলো ঝামেলার সৃষ্টি করে। তাতে নিজেও অসুবিধায় পড়ে, অন্যকেও অসুবিধায় ফেলে। সম্প্রতি তেমনি এক ধর্ম অবতার কিছুটা ঝামেলা ঘটিয়েছে। ভাবতে ভাবতে নিজের অতীত কীর্তিগুলি উদ্‌ঘাটন করতে বসলেন বিশ্বাস সাহেব।

এ যাবৎ শুধু পুলিসকেই কত টাকা দিয়েছেন তাই ভেবে হাসি পেল। এরা সমাজে পতিত হয় না। পতিত হননি বিশ্বাস সাহেব

চোরাই মদ আর চোরাই মেয়ের ব্যবসা করে। পতিত হবেন তখন, যখন দাগী হয়ে আসবেন, মার্কামারা হয়ে আসবেন। তা এ নিয়ম অবশ্য সর্বত্রই।

ঘরে বসে যতই না তুমি পাণ্ডিত্য অর্জন করো, পণ্ডিত বলে স্বীকার করবে না কেউ, যতক্ষণ না ডিগ্রীর ছাপ পড়ছে তোমার নামের গায়ে। ছাপ পড়া পর্যন্ত লোকে অপেক্ষা করবে। সব বিষয়েই!

সুধীরের বাড়িতে একটা খবর দেব, কোথাও এসে দেখা করতে? ছোট ভাই তো আছে দুটো শুনেছি। তার হাতেই কোন রকমে কিছু টাকা দিতে পারলে কিছুটা শান্তি পাওয়া যেত।

আশ্রমের মেয়েগুলি অবিশ্যি পাচার হয়ে গেছে আর এক আশ্রমে। পুলিসেই ব্যবস্থা করে ফেলেছে। নামকা ওয়াস্তে দু' চারটাকে নিয়ে গিয়ে সামনে ধরে দিয়েছে শুনেছি। সেই ক'টাকে নিয়েই কেস! আমার নিজের দিক থেকে বলব আমি, কিছু খারাপ করছিলাম না, খুব একটা অনিষ্টও করছিলাম না তাদের। ওইভাবে হরণ হয়ে তো অজস্র মেয়ে আসছে রাতদিন, চিরদিনই এসেছে। তাদের কোন মহৎ গতি হয়?

এতে তবু বিয়ের জন্য বেচে দেওয়া হচ্ছে। হোক্ অবাঙালী, কিংবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের! তবু মানুষ তো? পুরুষ তো? ইচ্ছুক পুরুষ! বিয়ের জন্য আর বেশী কি দরকার?

ড্রাইভার সুধীর তার মনিবানীর আক্ষেপের উত্তরে বলেছিল, 'কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না।' বলেছিল—স্বেচ্ছায় এপথে এসেছে সে, হয়ত লোভে, হয়ত অজানা জগতের তীব্র আকর্ষণে। অথচ সুধীর ড্রাইভার তার মনিবের অজস্র টাকা আর সুন্দরী স্ত্রীটিকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় পেয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। এমন কি মনিবের নির্দেশ মানার ছুতোতেও তো চলে যেতে পারত

ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায়। উঠতে পারত দামী হোটেলে, করে নিতে পারত যথেষ্ট বাবুয়ানি।

কিন্তু তা করছে না। সুধীর যেন ভুলে গেছে তার মুঠোর মধ্যে কি আছে? 'জানে'র কথা যে খেটে যাচ্ছে, ইচ্ছে করলেই যে সে এই অগুন্তি টাকা থেকে মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে আসতে পারত সেই ভবিষ্যৎ বক্তাকে, এ কথা যেন মনেই নেই সুধীরের। তাই কলকাতার অদূরেই বাংলা দেশের এক নিতান্ত গণ্ডগ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সে। ছেলেটার বুদ্ধিটা যে এখনও নেহাত কাঁচা এটাই বোধকরি তার প্রমাণ।

তা কুসুমলতা বোধকরি এতটা কাঁচামির খবর জানতেন না, তাই চলতে চলতে চমকে ওঠেন। রুদ্ধশ্বাসে বলেন, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, গাড়ী?'

সুধীর কাঁচা রাস্তার উঁচু-নীচুর দিকে সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপণ করতে করতে বলে, 'যে দিকে দু'চক্ষু যাচ্ছে!'

'সুধীর, আমি তোমার মনিবের স্ত্রী, সেটা কি ভুলে যাচ্ছ? না ইচ্ছে করে ভুলতে চাইছ?'

'ভুলতে চাইব কেন?'

'তবে এরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলছ যে? এদিকে আসছ মানে কি? এসব কি একটা রাস্তা? এ রাস্তার কিছু চেন তুমি?'

তীব্র একটা আর্তনাদের মত শোনায় কুসুমলতার প্রশ্ন।

কিন্তু সুধীর তাতে ভয় পায় না। বলে, 'সব কিছু কি আর চেনা থাকে? চিনে নিতে হয়।'

'কী চিনে নেবে তুমি? কোথায় নিয়ে যেতে চাও আমায়?' কুসুমলতা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চুপি চুপি এই হুকুমই বুঝি দিয়েছেন তোমার সাহেব? আমি যাবো না। আমি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ব। গাড়ী ফেরাও তুমি, সুধীর!'

সুধীর চাপা ধমকের সুরে বলে ওঠে, 'বারবার বলছি, আর যা

করেন করুন, দয়া করে চেঁচাবেন না, শুনছেন না কেন সে কথা? বিপদ বাধিয়ে বাধিয়ে বুঝি সাধ মিটছে না?'

কুসুমলতা মিইয়ে যান। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, 'তুমি আমায় ধমক দিচ্ছ? হাতে পেয়ে এত সাহস হচ্ছে তোমার?'

'উপায় কি? পুলিসের ধমকও এমন কিছু ভাল জিনিস নয়!'

'পুলিস এলে তোমায় ধরবে, আমায় না।'

সুধীর বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'কেন, আপনাকে নয় কেন?'

'আমি বলব তুমি তোমার মনিবের টাকা আর স্ত্রীকে চুরি করে পালাচ্ছ।'

'পুলিস জিজ্ঞেস করবে সেটা বোধকরি ষাট মাইল চলে এসে তবে খেয়াল হল আপনার?'

'তুমি একটি শয়তান, সুধীর! গাড়ী ঘুরিয়ে আর যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও তুমি আমায়, শুধু এদিকে নয়। আমি অনেক টাকা বকশিশ দেব তোমায়, তোমার মনিবের কথা শুনো না।'

'সাহেব বলেননি!'

'সাহেব বলেননি?' কুসুমলতা ঝল্‌সে ওঠেন, 'ছেলেমানুষ পেয়েছ আমায়? যা তা বোঝাচ্ছ? তুমি এদিকের রাস্তাঘাট চেন? ওই শিবমন্দিরটার পাশ দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় জান?'

ভারী উত্তেজিত শোনায় কুসুমলতার স্বর। উত্তেজিত, তবে চাপা। পুলিস সম্পর্কে ভয় ঢুকেছে বোধহয়। সুধীর মৃদু হেসে বলে, 'জানি।'

'জান? এদিকে এসেছ কখন? বল। বল শীগ্‌গির।'

সুধীর শান্ত গলায় বলে, 'এসেছি।'

'এসেছ!' কুসুমলতা তীব্র স্বরে বলেন, 'কেন? কাকে নিয়ে? কার জন্যে এখানে আসতে হয়েছে তোমায়?'

সুধীর তেমনিভাবেই বলে, 'আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন।'

'পারছি!' কুসুমলতা স্তিমিত হয়ে যান। বলেন, 'পারছি। আমার ভাগ্যের রাহু চিরদিন আগেভাগে আমার সব কিছু গ্রাস করে জিতে

গেল। সব দিকে জিতে গেল ও। আমি কেউ নই, আমি কিছু নই। সুধীর, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি আর কোথাও নিয়ে চল আমায়, শুধু ওখানে নয়। যেখানে শ্রীমতী কনকলতা দেবী জায়গা দখল করে রেখেছেন, সেখানে যাব না আমি, ভিখিরীর মতন বেচারীর মতন!'

হঠাৎ কেঁদে ভেঙে পড়েন বসন্ত বিশ্বাসের মেমসাহেব কুসুম বিশ্বাস।

গাড়ীর গতি মন্থর করে দিয়ে মিনিট দুই-তিন স্তব্ধ হয়ে ভাবল সুধীর, তারপর অস্ফুটে 'আচ্ছা' বলে কাঁচা রাস্তা ছেড়ে ঘুরে আবার পাকা রাস্তা ধরল। আবার অন্য রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে, পথচারীকে প্রশ্ন করে করে।

সুধীরকে কে চেনে?

কেউ না।

কুসুম বিশ্বাসকেও কেউ চিনে রাখেনি। গাড়ী? সেটার তো নম্বর আর রং পাল্টেই রেখেছেন বিশ্বাস সাহেব। অতএব কোন একজায়গায় থেমে, কোন একটা হোটেলে আশ্রয় নেওয়া যায় বৈ কি। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে উঠতে হবে, এই যা।

তাতেও নতুনত্ব নেই কিছু। কত সিনেমা, কত থিয়েটার, কত গল্প ওই কৌতুককে কেন্দ্র করে ঝলক দিচ্ছে। দেখে দেখে পুরনো।

ভাবনার যা, তা হচ্ছে ওই বস্তা বস্তা টাকা, কাঁচা টাকা! গাড়ীর পিছনে গাড়ীর গদির নীচে, যা ঠেসে দেওয়া হয়েছে পাগলের মত। এগুলো কি করবে সুধীর?

বিছানার বাণ্ডিলের মতো যেটা গাড়ীর পিছনে ঠাসা আছে হোল্ডঅলে, সেটা মাথায় তুললে কুলি বুঝতে পারবে না? যদি টের পেয়ে যায়? যদি সন্দেহ করে?

যা থাকে কপালে! তবু গাড়ী নিয়ে শুধু পথে পথে ঘোরা যায় না? অথচ কুসুমলতা যদি আপত্তি না করত, ওই নোটের বাণ্ডিলকে

বেডিংয়ের মতো একখানা ভাঙা চৌকির নীচে চালান করে দিয়ে সেই ভাঙা বাড়িখানার নিভৃত কোটরে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যেত সুধীর, সে বাড়ির একদার এক হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া প্রাণ পুতুলকে !

কিন্তু কুসুমলতা আপত্তি করেছে, কুসুমলতা গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছে, কুসুমলতা কেঁদে ভাসিয়েছে।

সুধীর ড্রাইভারকে তাই বীরভূমের একটা আধা শহরের পথে পথে হোটেল খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে।

তা খুঁজতে হবে বৈকি। হোটেল থাকলেই তো হয় না, ভদ্রলোকের থাকবার মতো হোটেল হওয়া চাই তো ?

এই গাড়ীর সঙ্গে, গাড়ীর আরোহিণীর সঙ্গে, থাকার জায়গাটা বেমানান হলে তো চলবে না ? তা' হলেই সন্দেহ সৃষ্টি হবে, কৌতূহল সৃষ্টি হবে, লোকে ফিস্‌ফিস্ করবে।

খুঁজে খুঁজে মোটামুটি মিললো একটা।

নামটা ভাল হোটেলের, বেশ কবি-কবি ভাব আছে।

'মনে হচ্ছে প্রোপ্রাইটার ব্যক্তিটি সভ্য ভব্য' কুসুমলতা বলেন, 'যে-সে লোক হোটেলের নাম রাখবে না 'ছায়া সুনিবিড় !'

সুধীর তখন জিনিসপত্র নামাচ্ছিল, সুধীরের কপালে ঘাম ছুটছিল। সুধীর ওই কবিত্বপূর্ণ নামের সৌন্দর্য লক্ষ্য করল না। তবে বিপদ কিছু হল না সুধীরের।

হোটেলের ছোকরা চাকরটা সব মালপত্র দোতলার ঘরে তুলে দিল। দেখল না কিসে কি আছে। চৌকিতে বিছানা পেতে দিয়ে সব গুছিয়ে সাজিয়ে বকশিশ নিয়ে চলে গেল—আকর্ণ মধুর হাস্যে মুখ গোল করে।

কুসুমলতা দুটো চৌকির একটা চৌকির উপর বসে পড়লেন।

চারিদিক তাকিয়ে বললেন, 'ঘরটা মন্দ নয়, কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি? ওই চৌকিটায় তুমি থাকতে চাও নাকি?'

সুধীর সহসা স্থির শান্ত দৃষ্টিতে বেশ গভীরভাবে তার মনিব গিন্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, 'এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটছে, তার কিছুই আমি চাইনি, সেটা বোধহয় আপনার খেয়াল নেই?'

কুসুমলতা অনুতপ্ত স্বরে বলে ওঠেন, 'তুমি বড় অল্পে রেগে যাও, সুধীর! ওই তোমার এক দোষ। কে বলবে যে তুমি জমিদার বাড়ির ছেলে নয়, গরীবের ঘরের ছেলে!'

'রাগ দুঃখতে বুঝি গরীবের অধিকার নেই?' সুধীর প্রশ্ন করে।

কুসুমলতা হেসে ওঠেন। বলেন, 'রাগ আর দুঃখ দুটো এক জাতের নাকি? আচ্ছা বোকা তো তুমি! দুঃখে খুব অধিকার আছে গরীবের, বুঝলে? দুঃখ আর চোখের জল, এসব তো গরীবেরই জন্যে। তবে রাগ কদাপি নয়। ওটা বড়লোকের একচেটে।'

'বুঝলাম!'

কুসুমলতা উঠে পড়ে ঘরের বাইরের বারান্দা, করিডোর, বাথরুম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এসে বলেন, 'তা তুমি এখন অমন সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসতে কে বারণ করেছে?'

'বসবার দরকার দেখছি না।'

'তুমি দেখছ না, কিন্তু আমি দেখছি। কারণ, দশঘণ্টা ধরে গাড়ী চালাচ্ছ—'

'অভ্যেস আছে।'

কুসুমলতা ঝলসে ওঠেন। 'অভ্যেস আছে মানে? মেমসাহেবদের নিয়ে পালানোটা তা' হলে নতুন নয়?'

'কেন, কাউকে নিয়ে পালানো ছাড়া গাড়ীর আর কাজ নেই? সাহেব মেমসাহেব কি দশ-বিশ মাইল বেড়াতে যেতে পারেন না?'

কুসুমলতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান। গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে

বলেন, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর সুধীর, বড় আঁতে ঘা দিয়ে কথা বল! ওটা যে হয়, সেটা আমি জানি না বলেই তুমি অমন কড়া করে বললে, এই তো?'

সুধীর অবাক হয়। সুধীর বিষণ্ণ হয়। সুধীর শান্ত গলায় বলে, 'আপনি কি জানেন, না জানেন, আমি সেটা জানবো কি করে বলুন তো? ক'দিন দেখছি আমি আপনাকে?'

ক'দিন বা দেখছে, সেটা সত্য। সুধীরের এখানে ক'দিনেরই বা চাকরী! তবু দেখা জিনিসটা কি শুধু সময়ের দৈর্ঘের উপরই নির্ভরশীল?

সুধীরকেই বা ক'দিন দেখেছেন আলতা কোম্পানীর বসন্ত বিশ্বাস? তবু তো তার হাতে যথাসর্বস্ব ছেড়ে দিতে দ্বিধা করলেন না! সে কি শুধু নিরুপায় হয়ে?

'আপনাদের খাবার কি ঘরে দিয়ে যাব, না নীচতলায় নামবেন?' ছোকরা চাকরটা এসে জিগ্যেস করে।

ভাত খাওয়া হয়নি আজ, কিন্তু ভাত খাওয়ার সময় এটা নয়, কুসুমলতা ভুরু কুঁচকে বলেন, 'কী খাওয়াবে শুনি?'

ছেলেটা মহোৎসাহে বলে, 'চা তৈরি, টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, মিষ্টি— যা বলেন!'

কুসুমলতা সুধীরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওহে কাঠের পুতুল, তুমি কি বল?'

'আপনিই বলুন।'

'কেন? আমিই বা সব বলব কেন?' কুসুমলতা ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন, 'তোমার সাহেব তোমার উপর সব ভার দেননি আমার?'

হঠাৎ সুধীরের চমক ভাঙে, বিচলিত বোধ করে। একটা ঘরে উঠেছে তারা, এরা স্বভাবতই ধরে নিয়েছে স্বামী-স্ত্রী! অথচ কথাগুলো বিজাতীয় হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বলে, 'সব সময় রাগ আর জুলুম! আশ্চর্য!...ওহে বাপু, যা তোমাদের ভাঁড়ারে আছে সব দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। মিল্ চার্জ, টিফিন চার্জ, সব আলাদা তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, হিসেব করে বিল্ দিও। আর আমাদের খাবারগুলো ঘরেই দিয়ে যাও।'

ছোকরা চলে যেতে সুধীর নীচু গলায় বলে, 'আপনি কী চান, বলুন তো? যাতে অন্যের সন্দেহভাজন হতে হবে এমন কথা বলছেন কেন? সাহেবের নাম উচ্চারণ করবেন না।'

'করব না?' কুসুমলতা আবার ভেঙে পড়েন। 'তোমার সাহেব হাজতের ঘরে পড়ে মশার কামড় খাবে, আর আমি দোতলায় বসে চা টোস্ট খাব, আর তার নামও করব না? সুধীর, তুমি তো বাঙালীর ছেলে, গেরস্থর ছেলে, লেখাপড়া জানা ছেলে, তুমি এমন নিষ্ঠুর হচ্ছো কেন?'

সুধীর এই ভাববিলাসে বিচলিত হয় না। সে দৃঢ়স্বরে বলে, 'আপনি চোখ মুছবেন? শক্ত হয়ে বসবেন?'

'বসছি বসছি।'

'হ্যাঁ, বসুন। এসব কান্নাকাটি টের পেলে এরা এক্ষুনি তাড়িয়ে দেবে, তা জানেন? সঙ্গে এক পাহাড় বিপদ, ভয় নেই আপনার?'

'হ্যাঁ, তাই বটে, সুধীর। এক পাহাড় বিপদ!'

তা টাকাও বিপদ বৈকি! লক্ষ্মী যখন দেউড়ি দিয়ে ঢোকেন, তখন তিনি সম্পদ, আর যখন চোরা দরজা দিয়ে ঢুকে আসেন, তখন বিপদ! সুধীর সেই এক পাহাড় বিপদ আর এই এক পৃথিবী বিপদ [illegible] করে পাড়ি দিয়েছে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

দিনের আলো যত আবছা হয়ে আসছে, পৃথিবী যত অন্ধকার হয়ে আসছে, সুধীরও ততই সামনে অন্ধকার দেখছে।

বেশ তো কাটল কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু এখন? এরপর? রাতের খাওয়ার পর?

ধারে পাশে আর একটা ঘরের জন্য আবেদন করেছিল, পায়নি। ধারে পাশে খালি ঘর নেই, তবে নীচের তলায় একটা ছোট্ট ঘর আছে। যদি চায় সুধীর—

কিন্তু সুধীর কি করে চাইবে?

বিশ্বাস সাহেবের সেই অগুন্তি কাঁচা টাকা, আর এই কাঁচাবুদ্ধি স্ত্রীটিকে কার দায়িত্বে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে নীচতলায় ঘুমোতে যাবে সুধীর?

হবে না। নীচে যাওয়া হবে না সুধীরের।

'ধারে পাশে যদি একটা ঘর থাকত—'

'ধারে পাশে যদি ঘর থাকত?' কুসুমলতা ঠিকরে ওঠেন, 'তাহলেই তুমি আমায় একা ফেলে চলে যেতে?'

সুধীর রূঢ়স্বরে বলে, 'তবে কি রাত্রেও আপনাকে আগলাতে হবে নাকি?'

কুসুমলতা এ রূঢ়তায় ভয় পান না, আরো ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'হবেই তো। না আগলালে তো ভয়ে মরেই যাব আমি!'

'আমার অসুবিধে হবে।'

'অসুবিধে মানে?' কুসুমলতা বেশ রুষ্ট গলায় বলেন, 'আমাকে আগলাতে তোমার অসুবিধে হবে?'

সুধীর স্থির গলায় বলে, 'হওয়াটা কি অস্বাভাবিক?'

কুসুমলতাও এবার আত্মস্থ হন। ওর মতই গম্ভীর গলায় বলেন, 'হয়ত অস্বাভাবিক নয়, তবে অপ্রয়োজনীয়। ঠিক আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছে সুবিধে করে শোওগে। আমি তোমার সাহেবের ওই পাপের বস্তা মাথার নীচে নিয়ে খুন হই হবো!'

'আপনি যদি এমন তারস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন—ঘরে কিসের বস্তা লুকোনো আছে, খুন হওয়াটা আশ্চর্য নয় !' সুধীর বিরক্তি গলায় বলে, 'তবে একা আপনাকেই খুন হতে হবে না, আমাকেও হতে হবে সেটা মনে রাখবেন, এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়াটাও মনে রাখবেন। কাগজে কাগজে ঘটনার বর্ণনা বেরোবে, ছবি বেরোবে, পরিচয় বেরোবে—'

কুসুমলতা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'তুমি আমার দুর্বলতা বুঝে নিয়েছ, তাই তুমি আমায় ভয় দেখাতে সাহস পাচ্ছ, কিন্তু জেনো তোমাকে আমি ভয় করি না। আমি মনে করি, ওই চৌকিটার ওপর তুমি শোওয়াও যা, একটা খরগোশ শোওয়াও তা।'

সুধীরের কান লাল হয়ে ওঠে। সুধীরের মুখের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। সুধীর রূঢ় রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'মিসেস বিশ্বাস, হতে পারি আমি গরীব, আমি ড্রাইভার, আমি আপনাদের চাকর, তবু আমিও রক্ত মাংসের মানুষ !'

মিসেস বিশ্বাস কিন্তু এই ক্ষুব্ধ আর্তনাদেও না হন লজ্জিত, না হন অনুতপ্ত। উল্টে দরাজ খোলা গলায় হেসে ওঠেন। আর হাসি থামলে বলেন, 'রক্ত মাংসের মানুষ, না হাতি ! কচুপোড়া ! রক্ত মাংসের মানুষ হলে আর বিশ্বাস সাহেব নিজের যথাসর্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়ে 'যা খুশি করগে যাও' বলে ছেড়ে দিতেন না।'

সুধীর মিনিট দুই পায়চারি করে তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'মানুষ যে কখন কি চেহারা নেয় বলতে পারেন আপনি ? না মানুষ নিজেই সেটা জানে ?'

কুসুমলতা সহসা উঠে দাঁড়ান। সুধীরের খুব কাছে সরে আসেন। নিজস্ব বাচাল ভঙ্গী ত্যাগ করে খুব নরম স্নিগ্ধ গলায় বলে ওঠেন, 'যখন তখন যা তা চেহারা নেয় জানোয়ারেরা, বুঝলে ? মানুষে নয়। 'মানুষ' নিজেকে জানে। 'মানুষ' একই চেহারায় স্থির থাকে।'

সুধীর কেঁপে ওঠে।

সুধীর বিহ্বল দৃষ্টিতে ওই মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে, যে মুখটা অনেক অনেকগুলো ঘণ্টা সময় তার অভ্যস্ত প্রসাধন থেকে মুক্ত।

সুদীর্ঘ সময় গাড়ীর দুরন্ত বেগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া উড়ন্ত চুলগুলো রুক্ষ ধুসর লালচে এলোমেলো, মুখের চামড়া শুকনো, ঠোঁট দুটো ফাটা-ফাটা খড়ি-ওঠা। শুধু চোখ দুটো কোমল স্নিগ্ধ ছায়াময়।

সেই ছায়াময় চোখ দুটো সুধীরের ওই বিহ্বল দৃষ্টির উপর স্থির হয়, আর সেই ফাটা-ফাটা ঠোঁট দুটো বিশ্বের সমস্ত বিশ্বাস আর সান্ত্বনার সুর নিয়ে বলে, 'তোমার বোনকে নিয়ে যদি হঠাৎ কোথাও রাত কাটাতে হত তোমায় সুধীর, তুমি কি ঘর ছেড়ে মাঠে শুতে যেতে?'

সুধীর চোখ নামায়। সুধীর আর কাঁপে না।

কুসুমলতা আস্তে ওর কাঁধে একটা হাত রাখেন। তারপর আস্তে বলেন, 'বাচালতা করে অনেক সময় অনেক যা-তা কথা বলেছি, হয়তো নেশার ঘোরেও কত কি বলে থাকবো, কিন্তু সে কথা সেই হরিশপুরের কুমির কথা নয় সুধীর! কুমির একটাও ভাই ছিল না, তাই হয়তো কুমি দিশেহারা হয়ে যা তা' করেছে। হয়তো ভাই থাকলে তাকে শাসন করতো। সেই শাসনের ভারটা নিয়েছ তুমি, দেখো এবার মিসেস বিশ্বাস আবার কুমি হয়ে যেতে পারে কিনা!'

শহর নিত্য পরিবর্তনশীল, গ্রাম প্রায় অনড়। শহর বহুরূপী, গ্রামের রূপ এক, চিরন্তন।

আরণ্যক মানুষ যখন প্রথম ভূমিকর্ষণ করতে শিখেছিল, শিখেছিল 'চাক' বানিয়ে মৃৎপাত্র গড়তে, আর ঢেঁকি বানিয়ে ধান কুটতে, তখন কোনো আরণ্যক শিল্পীর খেয়াল হয়নি সেই প্রথম প্রচেষ্টার ছবি এঁকে রাখতে। কিন্তু গ্রাম তার বিপ্লবচিন্তাহীন অনাহত কর্মধারার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই ছবিকে।

অন্ততঃ সনাতন ভারতবর্ষের গ্রামগুলি যেন অনাদ্যন্ত বিশ্ব প্রকৃতিরই একটি অংশ। এখানের গ্রাম-বাসুকী নাকি এক যুগে একবার পাশ ফেরে, আর সে যুগ ব্রহ্মার যুগ।

সুধীর ভাবছিল একথা।

হরিশপুরের কাছাকাছি এসেই কথাটা মনে হয়েছিল সুধীরের। আর তারপর কৌতুকের সঙ্গে মনে হয়েছিল, শুধু 'রেল লাইন' নামক 'ময়াল-সাপের' অনুপ্রবেশেই সেই বাসুকীর ঘুম ভাঙে। যে গ্রামে রেল লাইন নেই, সে এখনো চিরকালের চেহারা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত হয়ে।

কিন্তু কুসুম বিশ্বাসের চিন্তার ধারেকাছে এসব তত্ত্বকথা উঁকি মারছিল না। কুসুম বিশ্বাসের চোখদুটোই শুধু ক্রমশঃ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। কী আশ্চর্য্য! কী অদ্ভুত! কোনোখানে কিছু বদলায়নি!

সব ঠিক আছে, অবিকল আছে! মাঠ, পুকুর, 'বুড়োবটতলা', 'ষষ্ঠীবট', এমন কি ভাঙা শিবমন্দিরের ভাঙাত্বটুকু পর্যন্ত। ষষ্ঠীবটের ডানদিকের মোড়ে 'হুলু কামারের' দোকানটাও তো তার নিজস্ব চেহারা বদলায়নি। ওই তো কে যেন ঠাঁই ঠাঁই করে লোহায় লোহায় শব্দ তুলছে। চলন্ত গাড়ী থেকে বোঝা গেল না, লোকটা হুলু কামারই, না আর কেউ। হয়তো বুড়ো হুলু, হয়তো তার ছেলে। বংশপরম্পরায় ওরা এমনি করে আরণ্যকধারা বজায় রেখে চলেছে, কে জানে আরো কতদিন চলবে!

শুধু যারা ছিটকে চলে গিয়ে শহরে পড়বে, তারাই একেবারে চেহারা পাল্টাবে। তারা 'কুমি' থেকে মিসেস বিশ্বাস হয়ে যাবে।

রাস্তা প্রায় নেই। পুকুরের পাড় ঘেঁসে, আগাছার জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে গাড়ী যত ধীরে চলতে থাকে, কুসুমলতার শ্বাস-প্রশ্বাসের

গতি ততো দ্রুত হতে থাকে।···ওঃ ওঃ, ওই সেই ভৌমিকদের নোনাধরা পাঁচিলটা, আর ওই সেই শিউলি গাছটা!

গাছটা আছে, এখনো আছে, হয়তো এখনো ফুল ফোটে, আর পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা—

কুসুমলতা সিটে ঠেস দিয়ে চোখ বোজেন, শিথিল অভিমানাহত ভঙ্গীতে। গাছটার উপরই কি অভিমান কুসুমলতার?

আশ্চর্য্যই বটে!

কাঁচা মাটির গাঁথুনি মান্ধাতার আমলের পুরনো একতলা বাড়ি-খানার চেহারাটাও প্রায় একই আছে। চেহারাটা তো কুসুমলতার মুখস্থ।

কিংবা 'মুখস্থ' বলাটাও কিছুই নয়, মজ্জার ভিতরে যে অস্তিত্ব, চেতনার গভীরে যে সত্তা, সেটাই ওই বাড়িটা।···যে বাড়িটার উঠানে পা দিতে হয় একটা বেড়ার দরজা ঠেলে। মেটে উঠান! উঠানটা ঝাঁটিয়ে সাফ করার আগে—তা'তে পুরু করে গোবর গুলে ছিটানো হয়।

হয়। এখনও হয়। কোমরভাঙা হেঁটমুণ্ড এক বুড়ি এখনো সেই চিরাচরিত প্রথাটা পালন করে মরে ভোর রাত্তিরে উঠে।

উঠানটার তিনদিক ঘিরে উঁচু দাওয়া, দাওয়ার তিনদিকে ঘর। তু'দিকে শোবার ঘর, একদিকে রান্নাঘর। কিন্তু অবিকল তেমনি আছে কোন্ নিয়মে বাড়ির মানুষগুলোর উপর বয়সের যে ছাপ পড়েছে, বাড়ির উপরও তা পড়বে, এটাই তো স্বাভাবিক।

তার মানে, বাড়িটাকে চুন-বালি-সিমেণ্টের প্রলেপে প্রলেপে জীর্ণতার কবল থেকে কিছুটা রক্ষা করা হয়েছে। কে করেছে রক্ষা? পুরুষ-অভিভাবকহীন, রোজগারী মানুষহীন, শুধু তু'টো বিধবা বুড়ির সম্পত্তির সংস্কার করবার গরজ কার পড়েছে?

কুসুমলতা অবশ্য এত কথা ভাবলেন না। কুসুমলতা শুধু বেড়ার দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন বাড়িটার দিকে। যে বাড়িটা তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা। তাঁর সমস্ত পবিত্রতা আর শুভ্রতার আশ্রয়!

এই বেড়ার দরজার ওপিঠের ওই ভূমিটুকুতে কুসুমকলিকা আলোর পানে চেয়ে জেগেছিল, হেসেছিল, সৌরভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর ভাল করে ফোটবার আগেই কে যেন নখে করে ছিঁড়ে নিয়ে গেল···মালা গাঁথল না, শুধু জড় করে ফেলে রাখল।

গাড়ীকে অনেক দূরে রাখতে হয়েছে, আর কাছে আনার উপায় হয়নি। গলি পথটা ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে দু' পাশের ঝোপ ঝাড়ে। ড্রাইভার নেমে এসেছিল আরোহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। আস্তে বলল, 'ডাকব কাউকে ?'

আরোহিনী মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন।

ও একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর দরজাটা ঠেলে খুলল। মৃদু একটু শব্দ উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে একটা বার্ধক্যে কর্কশ গলার শব্দ উঠল, 'কে র‍্যা ?'

কুমি সাবধানে ভয়ে ভয়ে বেড়ার দরজা ঠেলে ভিতরের উঠানে পা ফেলল, যেমন ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে পা ফেলতো শেষরাত্রে শিউলি ফুল কুড়িয়ে এসে!

সেই তেমনি করেই দেখল তাকিয়ে ধারেকাছে কেউ রয়েছে কিনা ? তখন সেই সেকালের কুমি এইটুকু দেখে নিয়েই টুক্ করে উঠে পড়ত দাওয়ায়। ফুলের চুপড়িটা সাবধানে নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে পড়তো।

আজও দেখল। দেখল ধারেকাছে কেউ নেই, তবু দাওয়ায় উঠে পড়ল না। দাঁড়িয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকল। যেন সম্মোহিত হয়েছে কুমি! যেন কথা বলবার শক্তি হারিয়েছে!

বেড়ার বাইরে সুধীর, উঠানে কুমি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ি। কোমরভাঙা সাদা কদমছাঁট চুলে ঢাকা মাথা।···কোমরে হাত দিয়ে সোজা হবার ব্যর্থ চেষ্টায় বলল, 'কে বাছা! কাকে চাও ? বাড়ি ভুল করনি তো ?

বাড়ি ভুল করেছে? কুমি?

কুমি মুখ তুলে চাইল। স্খলিত বিহ্বল গলায় বলল, 'ঠাকুমা!'

'ঠাকুমা! কে? কে? ঠাকুমা বলছো কাকে? কে তুমি কুমি?'

কুমি এগিয়ে এল।

বুড়ি নেমে এল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল, 'ঠাকুমা কি এখনো অমর বর নিয়ে বেঁচে বসে আছে কুমি? আমি যে তোদের পিসি! কুমি তুই এলি! অ বৌ, কোথায় তুমি? দেখ কে এসেছে!'

বৌ বেরিয়ে এলেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু পিসি যে স্তব্ধতা ভাঙলেন, হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, 'সঙের মতন দাঁড়িয়ে থেকোনা বৌ। হাত ধরে ঘরে তোলো মেয়েকে। আয় কুমি।'

অতএব কুমি আশ্রয় পেল!

কিন্তু আশ্রয় কি শুধু ওই বার্ধক্যে অমসৃণ কর্কশ কণ্ঠস্বর? যে কণ্ঠস্বর কুমির পিসিমার!

কুমির মা?

কুমির মা কি কুমিকে গ্রহণ করলো?

বল্‌লো কি, 'কুমি তোর জন্যে এই এতকাল ধরে আমার বুক খাঁ খাঁ করছে।'

না, এত কথা কি… বলেনি কুমির মা। শুধু তার শীর্ণ ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

শুধু একটা তীব্র আবেগে শীর্ণ বুকটার মধ্যে উথাল-পাথাল করে উঠে চোখ দিয়ে ক'ফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

আশ্চর্য্য!

কনকলতাকে দেখে তো কখনো ওই কোটরগত চোখজোড়া থেকে জল গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়নি? কনকলতা বড়লোক বলে?

কিন্তু কুমিই কি দুঃখী? কুমির বরের পয়সা নেই? কুমির সঙ্গে নেই বস্তা বস্তা টাকা? তবে?

তবেটা যে কী, সে কথা কুমির মা নিজেই বুঝতে পারেনি। তাই ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছে 'কুমি !···আর দু' দিন পরে এলেই পারতিস, একেবারে আমার মরণের পর ?'

কুমির পিসিমা বলল, 'এখনো কি তুই মুড়ি খেতে ভালবাসিস কুমি ?'

কুমি মুড়ি খেতে ভালবাসতো ! সেই অদ্ভুত খবরটা মনে করে রেখেছে কুমির শৈশব ভূমি। এত সুখ রাখবে কোথায় কুমি ? এত আনন্দে চোখের জল না ফেলে থাকবে কি করে ?

দীর্ঘদিন ধরে শুধু হেসেছে কুমি, কারণে অকারণে, সহজে বিকৃতিতে। সেই হাসি কুমিকে শুধু দাহ দিয়েছে, তাকে মিসেস বিশ্বাস করে তুলেছে। এইবার হয়তো সত্যিই মিসেস বিশ্বাসকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই চেহারাটার মধ্যে যে ঠাঁই নেবে, সে কুমি !

কুমি বাঁচলো, কুমি জুড়লো !

কুমি সেই জুড়নো গলায় ডাক দিতে পারছে, 'কই সুধীর আসছো না ? পিসিমা যে আমাদের ভাত নিয়ে বসে আছেন !'

পাশাপাশি দুখানা পিঁড়িতে খেতে বসে কুমি, আর তার ড্রাইভার। কুমি সেই তার জুড়নো গলায় বলে, 'তোমার মাকে চিঠি দিয়েছ সুধীর ?'

সুধীর মৃদু গলায় বলে, 'না।'

'কী আশ্চয্যি ! কাল যে বললাম অত করে ?'

'বললেই যে শুনতে হবে তার কী মানে আছে ?'

'সুধীর লক্ষ্মীটি, তুমি তোমার মার প্রাণটার কথা বুঝছো না ?'

সুধীর হাসে, 'তার চাইতে বেশী বুঝেছি নিজের প্রাণটার কথা ! খবর চালাচালি করতে হলে প্রাণের মায়াটা ত্যাগ করতে হয়।'

নরম গলা আরও নরম হয়, 'কিন্তু তোমার সাহেবের খবর ?'

এই, এই এক জ্বালা কুমির ! কুমির সমস্ত শান্তির উপর কে যেন মস্ত একটা নখের ছুরি বসিয়ে রেখেছে।

কুমি ডাঁসা পেয়ারা খেতে যায়, কুমি তেল ঝাল মেখে মুড়ি খেতে যায়, কুমি ফুল কুড়তে যায়, কুমি গামছা ছাঁকা দিয়ে মাছ ধরতে যায়, কিন্তু কুমির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফেরে ওই সাহেব !

সত্যিকার সুখী কি হবে না কোনদিন কুমি ?

নাঃ হবে না।

কুমির গ্রহ নক্ষত্র বড় কুটিল।

তাই হঠাৎ একদিন কুমির চিরদিনের শনি এসে হাজির হয় কুমির এই নিভৃত শান্তির মাঝখানে। বলে, 'কুমি, তোর সাহেবের এবার আর ছাড়ান ছোড়ান নেই, নির্ঘাৎ জেল !'

শনির সঙ্গে এসেছে আর এক শনি। না কি রাহু ? যে না কি গোলগাল শ্যামলা একটা মেয়ের ছদ্মবেশে এসে দেখা দিয়েছে কুমির ভাইটাকে গ্রাস করবে বলে।

নির্ঘাৎ নির্ঘাৎ !

ওর চোখে মুখে সেই সর্বগ্রাসী ছাপ, কুমির ভাইয়ের চোখে মুখে তার প্রতিফলন। সেই রাহুও বলছে, 'রদ হবে না। রদ করবার চেষ্টাই বা কে করছে ? সাহেব তো কাঠ কবুল, উকিল ব্যারিস্টার দেবে না ! তার নাকি ভারি সখ হয়েছে জেলের ভাতটা কেমন খেতে, তাই দেখতে !···হবেই তো, টের তো পেয়েছে কে তাকে জেলখানার পথে ঠেলে দিয়েছে !'

কুমি এই ধৃষ্টতার উপর চোখ রাঙায় না।

কুমি এসে ওর হাত ধরে, 'উর্মিলা, ঠিক বলছ ? ছাড়ান পাবার চেষ্টা করছেন না তোমাদের সাহেব ? সত্যি ?'

'ও মা, সত্যি না তো কি বানিয়ে বলছি আমি ? ওই নিয়ে বলে মায়ের কত কথা !'

'তা' হলে কী হবে উর্মিলা ?'

'কী আবার হবে ? জেল হবে। যা তুমি চেয়েছ !'

যা তুমি চেয়েছ !

সত্যিই তো, তাই তো চেয়েছিল কুমি। ভেবেছিল পাপের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে ও, টেনে তুলতে হবে ওকে।

তবে? তবে কেন কুমি আর্তনাদ করে উঠছে, 'জেল হবে? সত্যি জেল হবে? ও দিদি, দিদি গো, তোমরা বাঁচাবে না ওকে?'

'জেল হয়ে যাবে?'

'তা' যাবে বৈকি!' মায়ের শিহরিত প্রশ্নের উত্তরে অমিতা দুঃখের গলায় বলল, 'অন্ততঃ সেই চাকরটা তো তাই বলল। বলল—পাঁচ সাত বছরের কম নয়।'

উমাশশী এবার প্রথম চমকের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে অবিশ্বাসের গলা বার করেন, 'বকিস কেন! বড়লোকের আবার জেল হয়? ওই একবার হৈ চৈ ওঠে। একবার খবরের কাগজে ধোঁয়া হয়ে খবরটা বেরোয়, তারপরেই ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যায়। কতই দেখলাম!'

'এক্ষেত্রে তা হবে না বলেই মনে হয়—' অমিতা বলে, 'সাহেব নাকি নিজের সমর্থনে উকিল ব্যারিস্টার লাগায়নি। নাকি ওর চেলা চামুণ্ডদের বলে গেছে—'জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, কিছুদিন মুখ বদলাতে বাসনা হচ্ছে। জেলের ভাত খেয়ে এলে আবার বাড়ির রান্নাবান্নায় রুচি আসবে।'

'ও সব ঢঙের কথা!'

'জানি না, যা বলল, তাই বলছি।'

'বলি চাকরটাকে পুলিসে ধরেনি? সবাই যখন এক কাজের কাজী?'

উমাশশীর কণ্ঠ থেকে বিদ্বেষ আর তিক্ততা ঝরে পড়ে।

অমিতা ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'আমার মনে হচ্ছে ওই চাকরটাই

পুলিসের স্পাই হয়েছে। কে আসছে না আসছে খোঁজ দিচ্ছে, অথচ চিরকালের পুরনো চাকর, কেউ সন্দেহ করবে না।'

'মরুক চুলোয় যাক—' উমাশশী ঝেঁজে ওঠেন, 'তোর দাদার খবর কি তাই শুনি।'

'দাদার আর নতুন খবর কি! যা শুনেছ তাই আছে।'

'আমি তোকে বলে দিচ্ছি অমি, ও আর ফিরছে না। ওই মেমসাহেবকে নিয়ে ভাগলো। তার ওপর আবার সাহেব—'

'মা!' অমিতা তীব্রস্বরে বলে, 'তুমি আর দাদার কথা জিজ্ঞেস ক'রো না মা! তোমার মন্তব্যগুলো অসহ্য!'

উমাশশী দমেন না।

উমাশশী বেজার মুখে বলেন, 'সত্যি কথা চিরকালই অসহ্য। সাহেব নিজে তার পরিবারকে গাড়ীর ড্রাইভারের সঙ্গে ছেড়ে দিল, এই কথা মানুষ বিশ্বাস করবে?'

'সাহেব নিজেই তোমাকে টাকা দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে, সে কথা ভুলো না মা!'

'মান সম্মান বজায় রাখতে লোকে কত কি করে!'

'ঠিক আছে, তাই ভেবে রাখো তাহলে।' অমিতা তীব্র হয়, 'ভেবে রাখো, তোমার বড় ছেলেকে তুমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছ। সে খারাপ, সে আর ফিরবে না।'

উমাশশীও তীব্র হন। 'দাদাকে এক কথা বললেই অমনি মেয়ে ফোঁস করে ওঠেন। বলি আরও তো দুটো ভাই আছে, কই তাদের জন্যে তো একতিল মায়া-মমতা দেখি না!'

'দরকার হয় না মা, তাদের জন্যে তোমার অফুরন্ত মাতৃস্নেহই যথেষ্ট।'

এবার অতঃপর উমাশশীর কেঁদে ফেলার পালা! 'ওই দুটো হয়েছে তোদের দু' চক্ষের বিষ, ওরা যেন তোদের বংশের ছেলে নয়, আমি যেন ওদের পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছি!'

অমিতা শান্তগলায় বলে, 'ওদের যে তুমি পথ থেকে কুড়িয়ে আনোনি, এটা যেন তুমিই ভুলে যাও মা, তাই ওদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এত চেষ্টা তোমার। অথচ দাদা যেন তোমার সতীনের ছেলে—'

উমাশশী সহসা কান্না থামান, সহসা চুপ করে যান। তারপর বলেন, 'ঠিক বলেছিস, তাই। ও আমার পেটেই জন্মেছে, আমার ছেলে নয়, সতীনেরই ছেলে। ওকে আমি বুঝতে পারি না, ওকে আমি চিনতে পারি না, ওর আমি নাগাল পাই না! নাগালের বাইরের ছেলেকে 'আমার' বলতে জোর কোথায়? সে আমার সুখদুঃখ বুঝবে, আমার সংসারকে 'আমাদের সংসার' ভাববে, এ বিশ্বাস কোথায়? এই যে শুনছি সাহেবের লাখ লাখ টাকা নাকি সঙ্গে আছে তার, সে টাকা থেকে একটা টাকা নিজের বলে সরাবে? সরাবে না, সরাতে পারবে না—'

অমিতার মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। অমিতা বলে, 'পারলে তুমি খুশি হতে?'

উমাশশী বলেন, 'হতাম! তাই হতাম! অন্ততঃ স্বস্তি পেতাম! বুঝতাম সাধারণ মানুষ সে! অসাধারণের মা হয়ে কোনো সুখ নেই অমি, কোনো সুখ নেই। ও কোনোদিন বিয়ে করবে, সংসার করবে, ওর বৌকে এনে আমি একটু ছুটি নেব, এ সব সাধ মেটাবে সুধীর আমার?'

অমিতা ক্লান্ত গলায় বলে, 'আমাকে নিয়েও তো তোমার কোনো সাধ মিটছে না মা, মেয়ের বিয়ের সানাই বাজাতে পাওনি, জামাই আদর করতে পাওনি, মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পাওনি, কই তার জন্যে তো তোমার আক্ষেপ দেখি না? কই ইচ্ছে হয় না তো আমার মেয়েটা সাধারণ হোক?'

উমাশশী বলে ওঠেন, 'কী করে ইচ্ছে হবে? কখন ইচ্ছে হবে? তুমিও যে মা চিরকালের অসাধারণ! মেয়েলি মেয়ে তো নও তুমি!'

অমিতা কি কেঁপে ওঠে?

অমিতা কি বলে উঠবে, 'কে বলল আমি অসাধারণ? সেই চিরন্তন মেয়েলি ইচ্ছেতেই তো ভরা আমি। আমিও সংসার করতে চাই, ভালবাসতে চাই, ভালবাসা পেতে চাই, কিন্তু আমি জানি আমার সেই চাওয়ার অধিকার নেই। তাই আমি অসাধারণ সেজে থাকি।...হয়তো তোমার বড় ছেলেও তাই। অধিকার না থেকেও যারা পাওয়ার দিকে হাত বাড়ায়, তাদের মত নির্বোধ নই আমরা, শুধু এই পর্যন্ত'।

কিন্তু অমিতা কিছু বলে ওঠার আগেই বাইরে কার যেন গলা বেজে উঠল, 'বাড়িতে কে আছেন?'

নিরীহ একটু প্রশ্ন, তবু অকারণেই বুক কেঁপে উঠল দুটো অসহায় মেয়েমানুষের।

কারণ? কারণ এই গলাই যেন ডেকে বলছে, এ গলা বন্ধুর গলা নয়। না, বন্ধুর গলা নয়, আত্মীয়ের গলা নয়, পড়শীর গলা নয়, এ গলা পেয়াদার গলা।

সুধীর ড্রাইভারের খোঁজে এসেছে পুলিসের পেয়াদা! পাতালে লুকোলেও যারা খুঁজে বার করে, আকাশে উড়ে গেলেও যারা টেনে নামিয়ে আনে।

না, 'জেল' থেকে রক্ষা করতে পারা গেল না ড্রাইভার সুধীরকেও। নিজেনিজেই যে উল্টোপাল্টা কথা বলে বসেছে সে! সাহেবের চোরাই কারবারের সঙ্গে নাকি যুক্ত সে, সাহেব তাকে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখেনি!

না, গলাটা নাকি একটুও কেঁপে ওঠেনি ওর, স্থির গলায় বলেছিল, বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখেনি, সাহেবের মেমসাহেবকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল।

তাই যদি, তো এখানে কেন? এই হরিশপুরে?

এখানে কেন ?

মেমসাহেবের চেঁচামেচিতে ভয় খেয়ে এইখানে এনে নামিয়ে দিয়েছে। মেমসাহেবের এই বাপের বাড়িতে।

কিন্তু এরকম কেন করল সুধীর ?

এতে কি তার সাহেবকে বাঁচানো গেল ?

না, তা যায়নি বটে। আর সে দুরাশা করেওনি সুধীর।

সুধীর শুধু কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারেনি—সাহেব তাকে এক বস্তা টাকা আর সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে ঠেলে গাড়ীতে তুলে দিয়ে 'যা খুশি করতে পারো' বলে অনুমতি দিয়েছিল।

বলতে পারেনি—রাতারাতি গাড়ীর নম্বর পালটেছিল সাহেব, পালটেছিল গাড়ীর রং !

সুধীর ভেবেছিল—কনকলতার হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া যায়। নিশ্চিন্তে বছর তিনেক সরকারি আতিথ্যে বিশ্রাম নেওয়া যায়।

বসন্ত বিশ্বাস জেলে পচবেন, সুধীর তার মাঝখানে বিয়ে করে সংসারী হবে ? সুধীর সেটা ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি অমিতার সিঁথি সাদাই থেকে যাবে, অমিতা কোনোদিন সে সিঁথিতে সিঁথিমৌর পরবে না, সুধীর তার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে সিঁদুর সিঁথিমৌরে ঐশ্বর্যবতী এক মেয়েকে !

সুধীর ভেবেছিল বিয়ে করবার অধিকার তার এখনো হয়নি। অথচ

অথচ উর্মিলা সরল বিশ্বাসে ওর দিকে সমর্পণের চোখ তুলে তাকাচ্ছে। উর্মিলার চোখে মুখে যে লাবণ্য উছলে উঠছে, সে লাবণ্য যে সুধীরকেই কেন্দ্র করে, তা বুঝতে ভুল হচ্ছে না সুধীরের। সুধীর তাই পালাবে। আপাততঃ একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঠাঁই নেবে।

নইলে ঠিক টের পাচ্ছে—ওই কাগজের বাণ্ডিল থেকে রাশি রাশি কাগজ বার করে ওড়াতে চাইবে কুমি, সুধীরের বিয়েকে উপলক্ষ করে। বলবে, 'সুধীর, এর দু' একটা তাড়া নিয়ে গেলেই তুমি সুখে

সংসার করতে পাবে। অতএব সেই তাড়া ছুটো উর্মিলাকে উপহার দিচ্ছি আমি! না, তোমায় নয়, তোমায় শুধু তাড়া! ফি হাত তাড়া!'

সুধীর অতএব ভয়ে পালাচ্ছে।

কনকলতা বলেছিলেন, 'উর্মিকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি যে মরবো ঠিক করেছিলাম সুধীর, এটা তোমার কী হল?'

সুধীর হেসে বলেছিল, 'আপনাকে মরতে দেওয়া হল না, ভয়ঙ্কর একটা লোকসান বাঁচানো হল!'

'তার মানে তুমি ওকে বিয়ে করবে না?'

'আমাকেই যে সুপাত্র ঠাউরে বসে আছেন, তা' তো জানতাম না, তাই ভেবে দেখিনি এর আগে। যদি আদেশ করেন মাথা পেতে নেব সেই আদেশ, শুধু সে অধিকার এলে, সে অবস্থা এলে!'

'অবস্থা? অবস্থার কি কোনো মাত্রা আছে সুধীর? তোমাদের সাহেব তো এখনো অবস্থা ফেরানোর ভাবনা ভাবছিলেন। উর্মিলা রাজার ঘরের মেয়ে নয়!'

'কিন্তু রাণীর মতো রাখতে সাধ হয় যে!'

'তার মানে তোমার সেই রাজকীয় অবস্থা আসার আশায় ওই মেয়ে গলায় গেঁথে বসে থাকতে হবে আমায়? বিশ্বাস সাহেবের টাকা আমারও টাকা, এ কথাটা বলেই ফেললাম তোমায় সুধীর! ওই টাকা থেকে আমি যদি তোমার অবস্থা ফিরিয়ে দিই?'

সুধীর হেসে ফেলে। বলে, 'এ প্রস্তাবে কোনো ভদ্রলোক রাজী হতে পারে, এমন ধারণা সত্যিই আছে আপনার?'

'বল কি সুধীর? যে কেউ হলে লুফে নিত যে! বরং নিজেই অগ্রণী হয়ে মেমসাহেবকে ভার মুক্ত করে ফেলতো!'

সুধীর হেসে ওঠে, 'এটা হচ্ছে আপনার রাগের কথা!'

'রাগের কথা মোটেই না। তবে হ্যাঁ রাগ হচ্ছে! আচ্ছা, জেল-ফেরৎ জামাই যদি আমি না করি?'

সুধীর হেসে উঠেছিল, 'তাহলে বুঝতে হবে আপনার জামাই হবার মত দুরূহ সৌভাগ্য আমার নেই। অথবা নেই আমার মত সুপাত্রের গলায় মালা দেবার সৌভাগ্য আপনার মেয়ের।'

হ্যাঁ, এ রকম সহজ সুরে, সহজ হয়ে কথা বলে বৈ কি আজকাল সুধীর। সহজ মেলামেশার মধ্যে কখন যে কেটে গেছে দূরত্ব, লেগেছে এসে অন্তরঙ্গতার সুর!

কনকলতা বললেন, 'সবাই মিলে আমাকেই জব্দ করছো দেখছি! ওই তোমার পাগলা মেমসাহেবকে কে সামলাবে শুনি? সাহেব কি আমাকে ওর ভার দিয়ে গেছে?'

'আপনাকে ভার দিতে আসবে কে? আপনি দেবার অপেক্ষায় বসে থাকবেন?'

'এই কথার রেস্ত ভাঙিয়েই খাচ্ছ তুমি! আশ্চর্য, বলা নেই, কওয়া নেই, জিগ্যেস নেই, পরামর্শ নেই, খামোকা গেলে পুলিসে ধরা দিতে! এখন সব দোষ ঢেকে ফেলতে চাও কথার জাল বুনে! ভাবছ বুঝি তোমার এই মহত্ত্বে সাহেব তোমায় বাহবা দেবে?'

'বাহবা চাই, একথা কে বললে আপনাকে?'

'কেউ না, কেউ না! ওই তো হয়েছে মুস্কিল, কিচ্ছু চাইবে না তুমি! তোমার মাকে খুব জ্বালাও নিশ্চয় তুমি?'

'ঠিক ধরেছেন!'

'কিন্তু তুমি জেলে গেলে, তোমার মার, তোমার পরিবারের কী হবে সুধীর?'

সুধীর মৃদু হেসে বলে, 'সেই কথাটাই বলব ভাবছিলাম। দয়া করে যদি মাসে মাসে আমার মাইনেটা ওখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন!'

'তোমার মাইনে?'

'হ্যাঁ! যদিও কাজ করবো না, তবু এখনো যখন চাকরীতে বাহাল আছি, ও দাবি করতে পারি।'